ame ra[illegible]d office.	Pay and allowances.	Authority.	Rate.			Arrea[illegible] last y[illegible]	
	Rs.		Rs.	A.	P.	Rs.	A.

	Assessments.			Realisations.			Balances.			Assessments.			Realisations.			Balances.		
P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.

S. I. E

Assessments.			Realisations.			Balances.			Assessments.			Realisations.			Balar
Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.

নব-কথা

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
২২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩১৮

মূল্য ১॥০—বাঁধাই ১৸০

সাথী প্রেস
২১।১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা
শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

দুই বৎসরে অধিককাল হইতে প্রথম সংস্করণ "নব-কথা" নিঃশেষিত ;—অদ্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই বিলম্বের জন্য, আগ্রহান্বিত পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই সংস্করণে "কাজির বিচার", "কাটামুণ্ড", "শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি", "শাহজাদা ও ফকীর কন্যার প্রণয়-কাহিনী" এবং "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর" —এই পাঁচটি গল্প অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইল। "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর" ঠিক গল্প নহে—সত্য ঘটনা বলিয়া শোনা যায়। "বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার" গল্পটিও জনশ্রুতিমূলক। তাই এই দুইটিকে কাল্পনিক গল্পের সহিত এক পংক্তিতে না বসাইয়া, পরিশিষ্টের অন্তর্গত করিয়াছি।

"শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি" আমার সর্ব্বপ্রথম গল্প রচনা। "ভূত না চোর", "কাটামুণ্ড" এবং "শাহাজাদা ও ফকীরকন্যার প্রণয়-কাহিনী" এই তিনটি গল্প ভাষান্তর হইতে গৃহীত; অনুবাদ নহে—স্বেচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছি।

"দেবী" গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন—এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই, এখন করিলাম।

গয়া
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচী

পরিশিষ্ট

নব-কথা

অঙ্গহীনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কন্যাদায়

চোরবাগানের শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে লোকে বলে "বোম্‌-ভোলানাথ।" নিজে তিনি নিতান্ত ভালমানুষ; পৃথিবীসুদ্ধ লোককেও ঠিক সেইরূপ ভালমানুষ মনে করেন। সকলকে অত্যন্ত অধিক বিশ্বাস করা যেন তাঁহার একটা মানসিক রোগ। জিনিষ কিনিয়া কখনও টাকার ফেরত পয়সা গনিয়া লন নাই। কেহ বিপদে পড়িলেই শ্যামাচরণ বাবু তাহার উপকার করেন; তিনি নিজে বিপদে পড়িলে সে যে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া তাঁহার উপকার করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

শ্যামাচরণ বাবু বেঁটে খাটো রকমের মানুষটি। চোখ দুটি ভাসা ভাসা হাসি হাসি। গৌরবর্ণ প্রৌঢ় পুরুষ; মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কহেন। সওদাগরি আফিসের চাকরি;—বেতন অল্প, ষাট টাকা মাত্র। একটি প্রাইভেট্ ট্যুষণ্‌ও আছে।

এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতা সহরে সপরিবারে বাস করা কম দুঃসাহসের কায নহে। একটি ঠিকা ঝি আছে সে কতক কাযকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায়। বাকী কর্ম্ম নিজেদের করিয়া লইতে হয়। কষ্ট হয় বটে কিন্তু উপায় ত নাই।

শ্যামাচরণ বাবুর একটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স সতেরো আঠারো বৎসর; বি-এ, ক্লাসে পড়ে। বড় মেয়ের নাম সুলোচনা, হরিপুরে বিবাহ হইয়াছে। তাহার ছোট শৈলবালা, তাহার ছোট ক্ষান্তমণি। শৈলবালার আজিও বিবাহ হয় নাই, দিলেই হয়। ক্ষান্তমণি ছোট।

শ্যামাচরণ বাবুর হাতে পৈত্রিক আমলের কিছু টাকা ছিল, তাহা বড় মেয়েটির বিবাহে সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ত অবস্থা;—রাখিয়া ঢাকিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করিতে হয়! কিন্তু বোম্-ভোলানাথকে তখন সে কথা বুঝায় কাহার সাধ্য? তখন শৈল ছোট ছিল;—এখন সে বারো তেরো বছরের হইয়াছে—এখন শ্যামাচরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন। কন্যাদায় এমনি জিনিষ, বোম্ ভোলানাথ শ্যামাচরণকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দুর্ভাবনায় এই দরিদ্র-দম্পতির মুখ ক্লিষ্ট, মন বিষাদভারাক্রান্ত। গৃহিণী বলিলেন—"আমার গায়ের যা কিছু গহনা আছে, সব বিক্রয় কর। হাজার টাকার উপর পাওয়া যাইবে। তাহাতেই এ যাত্রা জাতি রক্ষা হউক।"

শ্যামাচরণ ঠেকিয়া শিখিয়াছেন; বলিলেন—"তাহার পর? ক্ষেন্তির বেলায় কি উপায় হইবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"আশু ততদিন যদি নারায়ণের ইচ্ছায় মানুষ হয় তাহা হইলে আর ভাবনা কি?"

ক্ষান্তমণি শৈলবালার চেয়ে দুই তিন বৎসরের মাত্র ছোট। আজি কালিকার বাজারে বি, এ, ক্লাসের ছাত্র আশুতোষ যে দুই তিন বৎসরে

মানুষ হইতে পারিবে সে আশা অপর কেহ হইলে সাহস করিয়া মনে স্থান দিতে পারিত না, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবু দিলেন। গহনা বিক্রয়ের পরামর্শই স্থির হইল।

কিন্তু আবার মনের মত পাত্রও ত চাই। গৃহিণী বলিলেন—"যখন আমি গা খালি করিয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, মেয়ের বিবাহ দিতেছি, তখন যে সে-একটাকে ধরিয়া দিলে চলিবে না। জামাই দেখিতে সুশ্রী হইবে, দুইটা কি একটা পাস করা হইবে, খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে,—এইরূপ চাই।"

শ্রীমান্ আশুতোষের একজন সহপাঠী বন্ধু ছিল, তাহার নাম মোহিনীমোহন। সে জমিদারের ছেলে; কলিকাতায় মেসের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত। মাঝে মাঝে আশুর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিত। অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে খাওয়ান হইয়াছে। যে লক্ষণগুলি গৃহিণী জামাতায় চাহিয়াছেন, এই মোহিনীমোহনে তাহার সকলগুলিই বিদ্যমান। সুতরাং স্বভাবতঃ তাহারই কথা সকলের মনে হইল।

যেমন কর্ত্তা, তেমনি গৃহিণী, তেমনি ছেলেটি। জমিদারের ছেলে; বি, এ, পড়িতেছে; গহনা বেচিয়া হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই তাহাকে ক্রয় করিবেন! সত্যযুগ আর কি! শ্যামাচরণ বাবু বামন, প্রাংশুলভ্যফল মোহিনীমোহনকে জামাতা করিবার জন্য বাহু বাড়াইলেন। ইহার প্রতিফলস্বরূপ "উপহাস" নহে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে পরের কথা পরে বলিব।

আশু বলিল,—মোহিনীর বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারা কাহার সন্তান, কয় পুরুষে, নৈকুষ্য অথবা ভঙ্গকুলীন, এ সব আশু কিছুই বলিতে পারিল না।

পরদিন কলেজে কথায় কথায় কৌশল করিয়া বন্ধুর নিকট হইতে আশু সমস্ত সংবাদ আদায় করিয়া লইল। সমস্তই মিলিয়াছে। বড় সুখের কথা। আশু একে ত শ্যামাচরণ বাবুর পুত্র, তাহাতে অল্পবয়স্ক, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছুই নাই,—সে মনে করিল যেন বিবাহ হইয়াই গিয়াছে। প্রথম হইতেই মোহিনীর সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এখন মনে মনে তাহাকে ভাবী ভগ্নীপতি স্থির করিয়া সেই বন্ধুত্ব প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিল। ইহার ফলস্বরূপ আশুদের বাড়ীতে মোহিনীর যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। শনিবার কলেজের ছুটীর পর সে প্রায়ই আসিয়া আশুদের বাড়ীতে সন্ধ্যাযাপন করিত। রবিবারে এবং অন্য ছুটীর দিনে মাঝে মাঝে আশুর মা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ইঁহাদের গোপন অভিপ্রায় জানিতে মোহিনীমোহনের অধিক দিন বিলম্ব হইল না।

বিবাহের কথাবার্ত্তা হইবার পূর্ব্বে শৈলবালা মোহিনীর সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিত না বটে, কিন্তু তাহার সম্মুখে বাহির হইত এবং প্রতিদিনই দুই একবার পরস্পরে চোখোচোখি হইয়া যাইত। আশু ও মোহিনী আহারে বসিলে আশুর মা পরিবেশন করিতেন, প্রয়োজন হইলেই শৈল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিত। কিন্তু যে দিন শৈলবালা এই বিবাহের কথা শুনিল, সে দিন হইতে মোহিনীর সাক্ষাতে আর সে প্রাণান্তেও বাহির হইত না। মোহিনী আসিলেই ক্ষান্তমণি সুর করিয়া বলিতে থাকিত, "দিদির বর এসেছে গো।" মোহিনী বাহির হইতে এই গান শুনিয়া মনে মনে হাসিত—ভাবিত কোথায় কি তাহার ঠিক নাই, বিবাহ! কিন্তু শ্যামাচরণের কন্যা শৈলবালার ত সে বুদ্ধি ছিল না। সে যখন মোহিনীমোহনকে দেখিত, তখন তাহাকে স্বীয় ভাবী পতিস্বরূপ দেখিত। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের যে কোনও অংশের কল্পনা করিত

সেই অংশেই দেখিতে পাইত, মোহিনীমোহন সুন্দর শান্ত সমুজ্জল চক্ষু দুটিতে স্নেহ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু ক্রমে মোহিনীমোহনেরও বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিল। তাহার সমস্ত তর্কযুক্তি শীঘ্রই তাহাকে কল্পনার কমনীয় হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলে মোহিনী ভাবিত, যদি শৈলবালার সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়, তবে কেমন হয়? মনে হইত, বেশ হয়। বেশ নামটিও কিন্তু। শৈলবালার লজ্জাটা বড় বেশী—কখনও ভাবিত তা বেশ ত, লজ্জাই ত স্ত্রীলোকের ভূষণ। আবার কখনও বা ভাবিত, এই ভূষণবাহুল্যে আমার নব প্রণয়ের কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইবে না ত? লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। এখন ত দেখিলেই পলাইয়া যায়; ফুলশয্যার রাত্রে কথা কহাইতে অনেক সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হইবে। কল্পনায় সেই ফুলশয্যা-রাত্রিটির অভিনয় করিত। শৈলবালা যেন খস্‌খসে কাপড় পরিয়া, সাটিনের বডিস্ পরিয়া, কপালে একটি খয়েরের টিপ কাটিয়া, চুলে সুগন্ধি মাখিয়া, জড়সড় হইয়া, মুখখানি ঢাকিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে। শয্যায় প্রবেশ করিয়া সে শৈলকে কি বলিয়া ডাকিবে? নাম করিয়াই ডাকিবে। শৈল কি আর উত্তর দিবে? সে ফিরিবেও না, চাহিবেও না, কথাও কহিবে না। অনেক চেষ্টাতে যেন কথা কহিল। কিন্তু সে যেন শৈলর নিজ কণ্ঠস্বর নহে। সেই পিতৃগৃহের সুপরিচিত শাণিত দ্রুত কোমল কণ্ঠস্বর কি এই? এ যে ভাঙ্গা, জড়ান, সঙ্কুচিত, বাধাপ্রাপ্ত স্বর, কিন্তু নিরতিশয় মধুর।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রজনীশেষে নিদ্রাকর্ষণ হইত। স্বপ্ন দেখিত—সে স্বপ্নও যেন শৈলবালার স্মৃতিপরিমলে আমোদিত। যে রাত্রিতে পূর্ণিমার চন্দ্র পৃথিবীর উপর বেশী করিয়া উন্মাদনা বর্ষণ করিত, সে রাত্রিতে হয় ত

কল্পনা করিত, যেন এক সমুদ্রবেষ্টিত জনহীন দ্বীপের প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা শৈলবালার সাক্ষাৎ পাইল। তখন নূতন নূতন বিবাহ হইয়াছে। শৈল, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?—কেমন করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত শৈল জানে না। বাড়ীতে বিছানায় মার কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, জাগিয়া দেখিল এই বনে আসিয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় আরব্যোপন্যাসের জিনি-দৈত্য অথবা পরীদের রাজা উড়াইয়া আনিয়া থাকিবে। সমুদ্রগর্জ্জন শুনিয়া ভয় পাইয়া শৈলবালা কাঁদিতেছিল। এখন আর ভয় করিতেছে না। মোহিনী যেন বলিল, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার জন্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনি? শৈল বলিল, না আমি একলা থাকিতে পারিব না, আমার ভয় করিবে যে। তবে চল দুই জনেই যাই। কিন্তু শৈল কি সেই কঙ্করাকীর্ণ পথে চলিতে পারে? চল তোমায় কোলে করিয়া লইয়া যাইব।—ফল যদি না পাওয়া যায়? ফল যদি থাকে, আর জল যদি না থাকে? কি হইবে?—বিধাতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বলিয়া গেলেন—তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের মুখে চুম্বনের অমৃত সঞ্চিত রাখিয়াছি, ফল ও জলের প্রয়োজন হইবে না।—আরও কত সমস্ত অসম্ভব কল্পনা। সে আর বলিয়া কায নাই। শুনিলে বিজ্ঞ লোকে বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। নাটক নভেল মোহিনীর বিস্তর পড়া ছিল। সে যে ভালবাসার পথে পদার্পণ করিল, তাহা বেশ জানিয়া শুনিয়াই করিল। সে পথ বড় পিচ্ছিল। প্রণয়ের সে বাপীতে নামিতে নামিতেই জল একগলা হইল। দেখিতে দেখিতে অগাধ জলে গিয়া পড়িল। কি স্নিগ্ধতা সর্ব্বশরীরকে আলিঙ্গন করিল! চারিদিকে পদ্মবিকাশ। ডুবিয়া মরিতেও সুখ আছে।

এখন অবধি আর আশু ডাকিলে মোহিনী সহজে তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহিত না। মনে ষোল আনা ইচ্ছা যাইবার;—কিন্তু বোধ

হইত, যেন সকলে তাহার এ ভাবপরিবর্ত্তন ধরিয়া ফেলিয়াছে। যেন কত অপ্রতিভ হইয়া থাকিত।

একদিন শ্যামাচরণ বাবু মোহিনীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাপু আমার অনেক দিনের সাধ, শৈলর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই। তাহাকে তুমি ত দেখিয়াছ? তোমার যদি সম্মতি থাকে ত বল, তোমার পিতাঠাকুরের নিকট আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।"

মোহিনী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল। মাটির পানে চাহিয়া কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। শ্যাম বাবু ভাব বুঝিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?" মোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা বেশ ত।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ

গৃহিণী মাঝে মাঝে তাগাদা করেন, "মোহিনীর বাপকে যে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিলে তাহার কি হইল?" শ্যামাচরণ বাবুর আঠারো মাসে বৎসর;—তিনি বলেন, এই লিখ্‌ব এবার। গৃহিণী বলেন—মেয়ে যে এ দিকে বল্‌তে নেই বড় সড় হয়ে উঠ্‌ল। আর আইবুড় রাখা কি ভাল হয়? এর পরে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে যে! শ্যামাচরণ বাবু বলেন,—এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে,—পরীক্ষাটা হয়ে যাক্ তার পরে প্রস্তাব করব।

"এখন পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে"—কথা শুনিলে হাসি পায়। যেন বিবাহের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন শুধু শ্যামাচরণ বাবুর প্রস্তাব করাটা। সাধে লোকে তাঁহাকে বলিত "বোম্ ভোলানাথ!"

পরীক্ষা শেষ হইল। মোহিনী বাড়ী গেল। আরও দুই তিন মাস কাটিল। আজ লিখি কাল লিখি করিয়া এখনও শ্যামাচরণ বাবু পত্র লেখেন নাই। বোধ হয় বিশ্বাস ছিল, বৈশাখের পূর্ব্বে ত বিবাহের দিন নাই;—এখন অবধি অনর্থক পত্র লিখিয়া কি হইবে।

বৈশাখ মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আশু মোহিনী উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশু এই শুভসংবাদ মোহিনীকে টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানাইল। বাড়ীতে আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল।

এইবার শ্যামাচরণ বাবু চিঠি লিখিলেন। মোহিনী ও আশুতোষের পরস্পরের সৌহৃদ্য বর্ণনা করিয়া, মোহিনীর পরীক্ষা-ফলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, অতিশয় বিনয়সহকারে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

সপ্তাহখানেক পরে পত্রের উত্তর আসিল। মোহিনীর পিতা বল্লভপুরের জমিদার হরেকৃষ্ণ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, মোহিনীর সহিত আশুতোষের বন্ধুত্বের কথা পূর্ব্ব হইতেই তিনি অবগত আছেন এবং শ্যামাচরণ বাবুর গুণের কথাও তিনি মোহিনীর নিকট সর্ব্বদাই শুনিতে পান। তাঁহার সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয় ইহা অতি সুখের কথা। তবে দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটা কথা কহা যে এখন রীতি হইয়াছে, সেটা চুকিয়া গেলেই সমস্ত ঠিকঠাক করা যাইতে পারে। সেটা পত্রের দ্বারায় না হইয়া বাচনিক হইলেই উভয়পক্ষের সুবিধা ও সময়সংক্ষেপ হইবে। অতএব এই অভিপ্রায়ে একবার যদি শ্যামাচরণ বাবু অনুগ্রহ করিয়া দীনের কুটীরে পদধূলি দেন, তবে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইবেন।

এই পত্র পড়িয়া শ্যামাচরণ বাবু যারপরনাই সন্তোষলাভ করিলেন। গৃহিণীকে বলিলেন,—"আহা দেখেছ! যেমন ছেলেটি, তেমন বাপটি। আজকালকার দিনে এমন কুটুম্ব পাওয়া অতি সৌভাগ্যের কথা।"—স্থির হইল আগামী শনিবারে আফিসের পর যাত্রা করিবেন।

পরদিবস এক সময় নিরিবিলি পাইয়া শৈলবালা লুকাইয়া উপরোক্ত পত্রখানি পাঠ করিতেছিল,—তাহার দিদি সুলোচনা আসিয়া এই চৌর্য্যকার্য্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধরা পড়িয়া শৈলর মুখ চোখ কাণ রাঙা হইয়া উঠিল। দিদি পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"শৈলি, তোর যে আর দেরী সইচে না! বাবাকে বলব এখন, যেন এই মাসেই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে আসেন।"

বাস্তবিকই পিতার যাত্রাকালে সুলোচনা তাঁহাকে বলিয়া দিল—"বাবা, যদি সব ঠিক হয়, তবে এই মাসেই নয়ত জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তেই বিবাহের দিন স্থির করে এস। সামনের জামাইষষ্ঠীতে যেন আমরা আমোদ আহ্লাদ করতে পাই।"

শ্যামাচরণ বাবু যথাসময়ে বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ রায় আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। মোহিনীদের বাড়ীঘর, লোকজন, সোর সরাবৎ দেখিয়া, সেই প্রথম শ্যামাচরণ বাবু ভাবিলেন, —এমন লোকের ছেলেকে মেয়ে দেওয়া তাঁহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ।—তবে নাকি মোহিনীর পিতার পত্রে যথেষ্ট অভয় পাইয়াছিলেন, তাই অনেকটা ভরসা করিলেন।

বেলা নয়টার সময় তিনি মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিয়াছিলেন। স্নানাহার করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রায় মহাশয় বলিলেন,—পথশ্রমে আপনার ক্লেশ হইয়াছে। এ বেলা বিশ্রাম করুন। ও বেলা তখন সে সমস্ত কথাবার্ত্তা কহা যাইবে।

অপরাহ্নে রায় মহাশয়দের বহির্ব্বাটীতে কতকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইল। অনতিবৃহৎ কক্ষটির মধ্যস্থলে দুইখানি চৌকী যোড়া করিয়া পাতা। তাহার উপর আগ্রার একখানি শতরঞ্জ। তাহার উপর রজকালয় হইতে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি চাদর বিছান। কয়েকটি তাকিয়াও স্থানে স্থানে সজ্জিত। রায় মহাশয় জমিদারগর্ব্বে মধ্যস্থলে সুখাসীন। শ্যামাচরণ বাবুকে তিনি সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সকলেই বলিলেন,—"শ্যামাচরণ বাবুর মত মহাশয় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার চেয়ে আর কি সুখ আছে?"

রায় মহাশয় এ কালের লোক ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া সভাকার্য্যের সূচনা করিলেন। বিবাহে টাকা লওয়া যে একটা রীতি হইয়াছে, তাহার প্রতিই নিন্দার বেশী ঝোঁকটা পড়িল। বলিলেন—"আমাদের সে সব দিন কাল এক আলাহিদা রকমের গিয়াছে। আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন মনে আছে, একশত-এক টাকা পণ, একটি সোণার আংটি, আর একটি চেলির যোড় মাত্র পাইয়াছিলাম। আর বুঝি ভরি দশ পনেরো সোণা আর ভরি পঞ্চাশ ষাট রূপা। ইহাতেই একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব কতই লজ্জিত। বলেন—'বৈবাহিক মহাশয়, আমি ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়াছি বই ত ছেলে বিক্রয় করিতে আসি নাই।'—আর এখন?—এখন মহাশয়, সে দিন আমার বড় সম্বন্ধীটির মেয়ের বিবাহ হইল; পঞ্চাশ ভরি সোণা, দুই শত ভরি রূপা, হাজার-এক টাকা নগদ, তাহার উপর দানসামগ্রী আছে, খাট বিছানা আছে, বরাভরণ আছে। বরাভরণ কি যা তা মহাশয়? এই ধরুন ঘড়ি—সোণার ঘড়ি, সোণার গার্ডচেন, হীরার আঙ্গটি, চেলীর যোড়, তা ছাড়া আবার রূপার টী-সেট্। জামাই বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়াইবেন, তাই রূপার টী-সেট চাই।

এই নূতন বরাভরণ সাহেব-বাড়ী হইতে আনাইতে প্রায় দুই শত টাকা লাগিয়া গেল। জামাইয়ের গুণের মধ্যে কি?—না, এল, এ, পাস করিয়া বি, এ, পড়িতেছেন। বাপ জজকোর্টের সেরেস্তাদার। বিষয় আশয় কিছুই নাই, চাকরি ভরসা। চাকরি ত তালপত্রের ছায়া। আজ যদি চাকরি যায় তবে কাল কি খাইবেন তাহার ঠিকানা নাই। আরে ছি-ছি—একালে কেবল অর্থ, কেবল অর্থ, কেবল অর্থ। অর্থ ছাড়া আর কথাটি নাই।"

সভাস্থ সকলেই একবাক্যে রায় মহাশয়ের এ মত সমর্থন করিলেন। শ্যামাচরণ বাবু মনে মনে বলিলেন, যে যথার্থ ভদ্রলোক হয়, সে সর্ব্ব-দোষাবহ একালেও আপনার ভদ্রতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"তাহা হইলে এইবার উপস্থিত বিবাহের একটা কথাবার্ত্তা হইয়া যাক্।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তবে আমি একবার বাড়ীর ভিতর ওঁয়াদের জিজ্ঞাসা করে' আসি।"

বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব হইল না। তিনি বালির কাগজে লেখা এক সুদীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ছেলেপিলেকে দিয়া নিজেদের মনের মত এই ফর্দ্দ লেখাইয়া রাখিয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন—"বাড়ীর ওঁয়ারা অলঙ্কার এই চাহেন। তাহার পর আর আর যাহা কিছু আছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন কথা কহিবেন না বলিয়াছেন—আমারই উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। আমার এক্তারের মধ্যে যাহা রাখিয়াছেন, তাহাতে অবশ্যই যথাসম্ভব সুলভে আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নিষ্কৃতি দিব, কিন্তু মেয়েদের এই ফর্দ্দ হইতে অধিক কমান আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না।"

ফর্দ্দ পড়া হইল। তাহার বিস্তারিত বিবরণে পাঠককে ক্লিষ্ট করিব না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শ্যামাচরণ বাবুর মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। পৃথিবী যেন পদতল হইতে সরিয়া সরিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

গহনার যাহা ফর্দ্দ বাহির হইয়াছে, তাহা খুব টানাটানি কসাকসি করিয়া দিলে দুই হাজার টাকার একটি পয়সা কমে হইবে না।

তাহার পর গণ আছে, পণ আছে, ফুলশয্যা আছে, নমস্কারী আছে, নিজেদের খরচ আছে। ফল কথা মোহিনীমোহনকে জামাতা করিতে হইলে অন্যূন তিন হাজার টাকার প্রয়োজন।

সম্বল মাত্র গৃহিণীর অলঙ্কারগুলি। বিক্রয় করিয়া বড়জোর দেড় হাজার টাকা হইতে পারে।

এত দিন ধরিয়া এত সাধে দরিদ্র ব্রাহ্মণ আকাশে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অনুনয় বিনয় করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলে হয়ত কিছু কমিতে পারে। কিন্তু সে আর কত কমিবে? নিজের সাধ্যের মধ্যে আসিবে না। ভূমিকায় ত রায় মহাশয় বলিয়াই দিয়াছেন যে, গহনার তালিকা হইতে বিশেষ কিছু কমান তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। "কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে তৃণে, যদি আর কিছু না পায় সম্মুখে"—সুতরাং শ্যামাচরণ মনে করিলেন, কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কি আর অলঙ্কারের তালিকাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারেন না? স্ত্রীলোকের কথাই কথা থাকিয়া যাইবে, এও কখন হয়? নিজের স্ত্রীর কথা স্মরণ করিলেন। তিনি যদি স্ত্রীকে বলেন—ইহা করিতে হইবে, তাহাতে স্ত্রী দ্বিরুক্তি করিবেন? কখনই না। তাই শ্যামাচরণ বাবু সহসা হাত দুইটি যোড় করিয়া, রায় মহাশয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মহাশয়,

আমি কন্যাদায় হইতে যাহাতে উদ্ধার হই, তাহা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।”

রায় মহাশয় অমনি—“হাঁ হাঁ করেন কি?—আমার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া আমাকে অপরাধী করেন কেন? আপনি মহাশয় ব্যক্তি” —ইত্যাদি প্রকার উক্তি করিয়া সবলে শ্যামাচরণ বাবুর দুই হাত ছাড়াইয়া দিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—“আমি মহাশয় ব্যক্তি নহি। মহাশয় ব্যক্তি আপনি। আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লোক। আমাকে কৃপা করিয়া এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।”

সভার একজন বলিলেন—“অত টাকা ব্যয় করা যদি আপনার সাধ্যাতীত হয়, তবে কত ব্যয় আপনি করিতে পারেন, তাহাই বলুন না।”

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—“মহাশয়গণ, আমার সমস্ত অবস্থা আমি অকপটে নিবেদন করিতেছি, সমস্ত শুনিয়া আমার প্রতি যাহা বিচার হয় করিবেন।—আমি ষাটটি টাকা মাহিনা পাই। একটি ছেলে তিনটি মেয়ে, এই কাচ্ছাবাচ্ছাগুলি লইয়া ঘর করি। হাতে কিঞ্চিৎ পিতৃদত্ত অর্থ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছি। সে টাকার একটি কাণা কড়িও আর অবশিষ্ট নাই। আছে এখন কেবল ব্রাহ্মণীর গায়ের অলঙ্কার কয়খানি। সেই গুলি বিক্রয় করিলে হাজার বারোশত টাকা হইতে পারে। ঐ টাকার ভিতর যাহাতে আমার জাতি রক্ষা হয়, সব দিক রক্ষা হয়, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, —তাহাই আপনারা পাঁচজনে করিয়া দিন।”

এ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে শ্যামাচরণের দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে কিন্তু একটু অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা

দিল। শ্যামাচরণের মত বোম্ ভোলানাথ লোক যে পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহার জ্ঞানের অগোচর ছিল। জমিদারের ঘরে বি, এ, পাস করা ছেলের সন্ধানে আসিয়াছেন, হাতে কিছু নাই সে কি হইতে পারে? সওদাগরি আফিসে চাকরি করেন, বেতন ষাট টাকাতে কি আসে যায়?—অমন কত ষাট টাকা রোজগার করেন তাহার কি কোনও হিসাব আছে?

তথাপি রায় মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা তবে একবার বাড়ীর ভিতর যাই। বলিয়া কহিয়া দেখিগে মেয়েরা যদি কিছু কমাইতে রাজি হন।" বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কমাইবার কথা শুনিয়া মেয়েরা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। বলিয়াছেন, তোমার যাহা খুসী তাহাই কর। আমাদের কথা যদি থাকিবেই না তবে জিজ্ঞাসা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ইহার পর আর খোসামোদ করা চলে না। সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে ত? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিরও আত্মসম্মান একটা সীমার পর আর মাথা নোয়াইতে ঘৃণা বোধ করে। শ্যামাচরণ বাবু এইবার একটু "শুষ্ক শ্বেত হাসি" হাসিলেন—আহা "জমাট অশ্রুর মত তুষার-কঠিন।" বলিলেন—"তাহা হইলে ত আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্মান আমার অদৃষ্টে নাই।"

ইহাতে রায় মহাশয় এমন ভাবটা প্রকাশ করিলেন, যেন তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আর শ্যামাচরণ যেন উভয়েই এক অত্যাচারী রাজার শাসনাধীনে পীড়িত—তাই সমবেদনা অনুভব করিতেছেন। অপর সকলে মনে মনে ভাবিল, ছি এমন স্ত্রীবশ!

যাহা হউক, নিরাশার পাথর বুকে বাঁধিয়া সেই রাত্রেই শ্যামাচরণ গৃহে ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ

বাড়ীতে একটা আশা আনন্দের যে কোলাহল উঠিয়াছিল, শ্যামাচরণ ফিরিবা মাত্র তাহা থামিয়া গেল। বাড়ীসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীর কান্না পাইতে লাগিল। আর শৈলবালা অত্যন্ত গোপনে বাস্তবিকই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।—শুধু কি মা বাপের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল, না আরও কিছু কারণ ছিল?—আমার ত বিশ্বাস, ছিল। কিন্তু সে পণ করিয়া বসিল না—যাহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সে ছাড়া আর কাহাকেও আত্মদান করিব না;—আমি চিরকুমারী থাকিব। সে অতশত জানিত না। তাহার বুকে যে কিসের বেদনা আসিয়া বাজিল, তাহা সে ভাল বুঝিতেই পারিল না।

গৃহিণী বলিলেন—"এখন উপায়?" শ্যামাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি আর কি উপায় করিব? ঈশ্বর কি উপায় করেন দেখি। আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।"

কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। পাত্রের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। হাজার বারো শত টাকায় হয় এমন একটি পাত্র। পাস টাস হোক্ আর নাই হোক্,—দুইটা খাইতে পরিতে দিতে

পারে। আর নিতান্ত মূর্খ, গোঁয়ার, মাতাল, দুশ্চরিত্র না হয়। অনেক সন্ধান করিতে হইল। অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এ ভোগ কাহাকে না ভুগিতে হইয়াছে? কয়েকটা স্থানে ত এই হইল—এই হইল—সব ঠিক্‌ঠাক্‌—আর হইল না। সেই বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিল। পূজার সময় একস্থানে স্থির হইল। হাজার টাকা দিতে হইবে। পাত্রটি উকীল, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের। তাই বলিয়া বয়স অধিক না,—এই ত্রিশের মধ্যে। মেয়েটি বয়স্থা ও সুন্দরী দেখিয়া "বি, এ, বি, এল্‌" এর পিতা হাজার টাকাতেই স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকৃত হইবার আরও একটু বিশেষ গোপনীয় কারণ ছিল। পাঁচ বৎসর ছেলের স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই পাঁচ বৎসর বিস্তর সাধ্য সাধনাতেও ছেলেকে বিবাহে সম্মত করিতে পারেন নহে। এবার কোন শুভগ্রহবশে ছেলে রাজি হইয়াছে। সুতরাং টাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কার্য্যটা শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। কারণ কি জানি, যদি বিলম্বে মতি ফিরিয়া যায়!

১৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। শ্যামাচরণ গহনাগুলি একে একে বিক্রয় করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিবাহের মাস খানেক পূর্ব্বে একটা ভারি দুর্ঘটনা ঘটিল। রান্নাঘরের সম্মুখের বারাণ্ডায় শৈল বসিয়া ছিল। একটি জল খাবার ছোট ঘটির ভিতর বামহস্তের মাঝের আঙ্গুলটি দিয়া, ঘটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, রান্নাঘরের ভিতর সুলোচনার সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে চুণ সুরকীর একটা চাঙর খসিয়া সেই হাতের উপর পড়িল। ঘটির কানাটা ভাঙ্গিয়া গেল, আঙ্গুলও আধখানা সেই সঙ্গে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতেই খুব জ্বর। পূর্ব্বেই ডাক্তার আসিয়া আঙ্গুলটি দ্বিতীয়বার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিল। চারি পাঁচ দিনে জ্বর ছাড়িল; কিন্তু আঙ্গুল ভাল হইতে পনেরো কুড়ি দিন লাগিয়া গেল।

একে মেয়ের বিবাহ হয় না, তাহার উপর আবার আঙ্গুল কাটিয়া গেল! খুব সাবধান, যেন প্রকাশ হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া না যায়।

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। বরপক্ষীয়েরা পল্লীগ্রাম হইতে প্রভাতেই আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহাদের জন্য কাছেই একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া ছিল, তাঁহারা সেইখানে উঠিলেন।

বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল শৈলবালার মুখখানি মলিন। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু দুইটি জলে পূরিয়া উঠিতেছে। তাহার আর সে পূর্ব্বকার আকার নাই। যেন সে সম্প্রতি ছয় মাসের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছে।

বেলা দশটার সময় গায়ে হলুদ হইল। বরপক্ষীয়দের একটা দাসী গায়ে হলুদের সময় বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা সত্ত্বেও সে দেখিয়া গেল, মেয়ের একটি আঙ্গুল কাটা। যথাসময়ে সে বরের পিতার নিকট গোপনে এ সংবাদ দিতে ভুলিল না। বরকর্ত্তা শুনিয়া ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি নিজে পূজার সময় মেয়েকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু হয়ত বাম হাতটা কাপড়ের ভিতর লুকান ছিল, তাই কি অত লক্ষ্য করেন নাই? যাহা হউক প্রিয়বন্ধু ক্ষুদিরাম খুড়ার সহিত অত্যন্ত গোপনে পরামর্শ আঁটিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে কৌশলে এইটা জানাজানি করিয়া দিয়া, আরও দুই এক শত আদায় করিয়া লইতে হইবে।

সন্ধ্যা হইল। বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। বর আসিয়া সভাস্থ হইল। ইয়া গোঁফ্—ইয়া চেহারা—পাড়ার ছেলেরা বরকে যে সকল ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে ভাবিয়া আসিয়াছিল, বরের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সে সব কিছুই করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে কন্যাকর্ত্তা যথারীতি গলবস্ত্র হইয়া সভায় নিবেদন করিলেন—"লগ্ন উপস্থিত, গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি হউক।"

বর গিয়া বিবাহ-মণ্ডপে উপবেশন করিল। শ্যামাচরণ জামাতাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বরকর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের একটা চিরকালের কৌলিক প্রথা আছে, তাহা পালন করিতে হইবে। কনেকে সভায় আনা হউক। বর কনের হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিবে। তাহার পর বরণ হইবে।"

ইহা শুনিয়া কন্যাপক্ষীয়েরা নিজেদের পুরোহিতের মুখপানে চাহিলেন। পুরোহিত বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি নাই। যাহা উঁহাদের করিবার প্রথা আছে তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি কি?"

কনেকে আনা হইল। বরকর্ত্তা বরের হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"এইটি তুমি কনের হাতে দাও।" কনেকে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী, হাত পাত।" শৈল বস্ত্রাঞ্চলের মধ্য হইতে কম্পিত দক্ষিণ হস্ত খানি বাহির করিয়া দিল। বরকর্ত্তা বলিলেন—"না না, এক হাতে কি নিতে আছে মা? দুইটি হাতই পাতিতে হয়।" শৈল ত কিছুতেই বাম হস্ত বাহির করে না। শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়া পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শৈল বাম হস্তখানি বাহির করিল। সকলেই দেখিল, মাঝের আঙ্গুলটির আধখানা নাই।

বরকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"একি! অঙ্গহীন!" পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীগুরু! অঙ্গহীনা কন্যা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে! মুখুয্যে মহাশয়, বিবাহ স্থগিত করুন।"

বিবাহ স্থগিত করুন! কন্যাপক্ষীয়েরা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিল। একজন বলিল—"কোথাকার অশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টাচার্য্য! একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেলে অঙ্গহীন হয় একথা কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন?"

ভট্টাচার্য্য অশাস্ত্রজ্ঞ! ভট্টাচার্য্য কোন্ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন! তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"কে হে বেল্লিক অকালকুষ্মাণ্ড, আমার চেয়ে তোমার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক নাকি?"

শ্যামাচরণ প্রমাদ গণিয়া বলিলেন—"আপনারা যদি এখন বিবাহ স্থগিত করেন, তাহা হইলে আমার জাতি থাকে কেমন করিয়া?"

এইবার ক্ষুদিরাম খুড়া সর্ব্বসমক্ষে বরকর্ত্তাকে বলিল—"কন্যাকর্ত্তা পণস্বরূপ আর দুইশত টাকা ধরিয়া দিউন, মিটমাট করিয়া ফেলা যাইতেছে। কি বল হে ভট্টাচার্য্য?" সেই মাত্র একজন ভট্টাচার্য্যকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া উপহাস করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য প্রমাণ করিবেন, শাস্ত্র-জ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে। তিনি বলিলেন—"টাকা ধরিয়া দিলে শাস্ত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় নাকি?"

সেই স্থানে কন্যাযাত্রী কলেজের একজন জ্যাঠা ছোকরা চশমা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—"ঢের দেখেছি, আর ভট্টাচায্যি-গিরি ফলাতে হবে না। নর শব্দ রূপ কর দেখি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে আসন ছাড়িয়া একলম্ফে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। দুই হাত অতি বেগে ঝাড়িয়া বলিলেন—"এ বিবাহে যদি আমি মন্ত্র বলাই তবে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে।"

বরপক্ষীয় পাঁচজন হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, করেন কি ! করেন কি !" ভট্টাচার্য্য বরকর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে উঠাও বর।"

বর বলিল—"আমি ঐ আঙ্গুলকাটা মেয়েকে বিবাহ করিব না"—বলিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা বরের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"কি ! বিবাহ করিবে না ? লাঠির চোটে মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিব না !"

শৈলবালার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এতক্ষণ কেহ তাহার খবর রাখে নাই। একটা দাসী শ্যামাচরণকে ঠেলিয়া বলিল—"ওগো বাবু, মেয়ে যে এলিয়ে পড়্‌ল।" তৎক্ষণাৎ শৈলকে ধরাধরি করিয়া অন্যত্র পাঠান হইল।

এই গোলমালটা থামিলে বরকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলিয়াছি, প্রথমাবধিই সে বিবাহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। পিতামাতার একান্ত উৎপীড়নে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সে এই সুযোগে চম্পট দিল।

মুখে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিয়া, বাতাস করিয়া, অনেক কষ্টে শৈলবালার চেতনা সম্পাদিত হইল। শৈলর মা কাঁদিয়া বলিলেন—উহাকে আর বাঁচাইয়া কি হবে গো। উহার যে কপাল পুড়িল।

আমরা এতক্ষণ মোহিনীর কোনও উল্লেখ করি নাই। সে কলিকাতাতেই ছিল। আশু বলিল—"বাবা, আমি মোহিনীকে আনিয়া বিবাহ দিব।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজের ডেস্ক হইতে এক খানা বৃহৎ ছুরী বাহির করিয়া লইয়া পাগলের মত মোহিনীর বাসার উদ্দেশে ছুটিল। বাসার দরজা তখনও বন্ধ হয় নাই। দুইট তিনটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া দোতালার ছাদে গিয়া পৌছিল। দোতালার

ছাদে একটি মাত্র কক্ষ, তাহাতে মোহিনী একাকী থাকিত। দুয়ার বন্ধ, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কম্পিত স্বরে আশু ডাকিল—"মোহিনী, মোহিনী!" মোহিনী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। সংক্ষেপে আশু মোহিনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিল,—"ভাই, তুমি যদি এ রাত্রিতে আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া আমাদের জাতি-কুল-মান রক্ষা কর। নহে ত বল, এই ছুরী আনিয়াছি, তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।"

মোহিনী আপাদমস্তক শিহরিয়া আশুর হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইল। বলিল,—"ভাই, চল, আমি তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিব। আত্মহত্যা করিতে হইবে না।"

মোহিনীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বহিল। এই রাত্রে যে শৈলবালার বিবাহ, তাহা সে পূর্ব্বাবধিই অবগত ছিল। টেবিলের উপর একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে সে দুই মিনিট পূর্ব্বে "বিসর্জ্জন" নাম দিয়া একটি কবিতা আরম্ভ করিয়াছে;—তাহার শেষ পংক্তিটির কালি এখনও শুকায় নাই।

চটীজুতা পায়ে, আলুথালু বেশে, মোহিনী আশুর সঙ্গে চলিল। তখন রাত্রি দশটা হইবে। একটার মধ্যে শৈলবালার সঙ্গে মোহিনীর শুভবিবাহ যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়া গেল।

পাঠক, রাগ করিবেন না। ঘটনাটা কিছু নভেলিয়ানা রকমের হইল বটে;—কিন্তু বাস্তবজীবনেও যে প্রতিদিন শত শত নভেলের ঘটনা ঘটিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বিরাগমন

মোহিনী পিতার বিনা অনুমতিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু পিতা ইহা শুনিয়া কি বলিবেন? তিনি যদি এই অপরাধ ক্ষমা না করেন? বিবাহের পর এই ভাবনা মোহিনীর ও তাহার শ্বশুরের প্রধান ভাবনা হইল।

শ্যামাচরণ বাবু কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছেন; মোহিনীকে জামাতা পাইয়া তাঁহার বহুদিনের সযত্নপালিত আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু, এই একটা সমস্যার জন্য আনন্দটুকু প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। গৃহিণী বলেন,—"কে জানে বাবু, কপালে কি আছে। ছেলের মা বাপ বউকে নিলে হয়।"

শ্বশুরবাড়ীতে প্রায়ই মোহিনীর নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। শনিবার ত ফাঁক যায় না। মোহিনী একদিন শৈলকে বলিল,—"দেখ শৈল, আমি মনে মনে ভাবি যে ভাগ্যে তোমার আঙ্গুলটি কাটিয়াছিল—তাইত—নহিলে এতদিন তুমি—।" আর বলিতে পারিল না। সে অবস্থা কি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায়? শৈল স্বামীর এই অসমাপ্ত কথাটুকু বুঝিল। পাঠ্য পুস্তকের অনেক কথা তখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই। মনে মনে বলিল—ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

মোহিনী যখনই আসিত, তখনই শৈলর জন্য কিছু না কিছু সখের জিনিষ লইয়া আসিত, কিন্তু শৈল মহা আপত্তি করিত—কিছুতেই লইবে না। বলিত,—"কোথায় রাখ্‌ব? সবাই যে দেখে ফেলবে।" মোহিনীও

ছাড়িত না ; বলিত,—"দেখে দেখবে, তুমি ত আর চুরি কর্‌ছ না।" শেষকালে শৈলকে লইতে হইত, নহিলে স্বামী রাগ করেন। বিশেষ চেষ্টা করিত, যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইত। ধরা পড়িয়া প্রথম প্রথম লজ্জায় যেন সে মরিয়া যাইত ; কিন্তু বারকতক এইরূপ হইতে হইতেই লজ্জা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল।

মোহিনী শৈলকে একবার বলিল,—"আমাকে পত্র লিখো, নইলে এ শনিবার আমি আসব না।" শৈল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—"কি লিখতে হয় আমি কি তা জানি ?"

"তোমার দিদি তাঁর স্বামীকে যে সব চিঠি লেখেন, তা কি তুমি দেখ নি ?"

"হাঁ, কতবার দিদি আমাকে দেখিয়েছে।"

"সেই রকম তুমিও লিখ্‌বে।"

শৈল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে আমার ভারি লজ্জা করবে ;—সে আমি পারব না।"

"দিদির কেন লজ্জা করে না ?"

"আগে দিদির মত বড় হই"—একথা বলিয়াই শৈল হাসিয়া ফেলিল। সে বেশ বুঝিল, এ ওজরটি নিতান্তই "পঙ্গু" হইতেছে। তাহার সমবয়স্কাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সকলেই চিঠি লেখে। চিঠি লিখিতে ইচ্ছা তাহারও হইত, কিন্তু সে কথা কি স্বামীর কাছে স্বীকার করিতে আছে ? ছি ! বেহায়া মনে করিবেন যে।

চিঠি লিখিবার জন্য শৈলকে বেশী বড় হইতে হইল না ; দুই তিন সপ্তাহ বয়স বাড়িতে না বাড়িতেই সে স্বামীকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম প্রথম চিঠিগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতি হইত, ক্রমে

বাড়িয়া বাড়িয়া দুই তিন পৃষ্ঠা করিয়া হইতে লাগিল। কোন বিশেষ কথা থাকিলে চারি পৃষ্ঠাও পূরিয়া যাইত।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা দারুণ দুর্ভাবনা বহন করিয়াও এই নবদম্পতীর জীবন বেশ সুখে কাটিতে লাগিল। ক্রমে গ্রীষ্মাবকাশ নিকটে আসিল। মোহিনীকে বাড়ী যাইতে হইবে। দুই তিন মাস দেখা শুনা হইবে না, এই আশঙ্কায় দুই জনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। শৈল বলিল,—"কোনও উপলক্ষ্য করিয়া মাঝখানে একবার কলিকাতায় আসিতে পারিবে না ?"

মোহিনী বাড়ী গেলে বাড়ীর লোক তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখ-চক্ষুর ভাব যেন সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মোহিনী কি ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে একদিক পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কিছু উত্তর পায় না।

একদিন পাড়ার একজন প্রবীণা দিদিমা, মোহিনীর সাক্ষাতে তাহার মাকে বলিলেন,—"ছেলে ষেটের বড় হয়েছে—বিয়ে দাওনি—তাই মন শুমিয়ে থাকে।" ইহা শুনিয়া মোহিনী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই তাহার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। মোহিনীর মা ইহা লক্ষ্য করিলেন। সে অন্যত্র চলিয়া গেলে দিদিমাকে বলিলেন,—"ঠিক বলেছ বাছা ; আমি কর্ত্তাকে বলে শীঘ্রই ওর বিবাহ দিতেছি।"

গ্রামের পোষ্টমাষ্টার মোহিনীর একজন প্রিয় বন্ধু। তাহাকে বলা ছিল, মোহিনীর পত্রাদি বাড়ীতে না পাঠাইয়া যেন ডাকঘরেই রাখা হয়, মোহিনী স্বয়ং গিয়া লইবে। একদিন পোষ্টমাষ্টার কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। যথাসময়ে ডাক আসিল। অধীনস্থ পিয়ন নিজেই ব্যাগ খুলিয়া পত্রগুলি বিলি করিল। পল্লীগ্রামের ডাকঘরে এরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সেই সঙ্গে শৈলবালার লিখিত, মোহিনীর

একখানি পত্র ছিল ; তাহা মোহিনীদের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এত লোক থাকিতে, পত্রখানি কি ছাই মোহিনীর ছোট বোন্ মালতীর হাতেই পড়িতে হয় ? মোহিনী তখন বাড়ী নাই। পত্রখানির আবরণ রঙ্গীন, সমচতুষ্কোণ, এসেন্সের গন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। মালতীর কেমন সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ সে জল দিয়া পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল।

পত্র পড়িয়া মালতী অবাক্। ছুটিয়া মা'র কাছে গিয়া বলিল,—"মা, সর্ব্বনাশ হয়েছে। দাদার স্বভাব চরিত্র বিগড়ে গেছে।"

মা পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন। মেয়ের কথায় তাঁহার কোনও সংশয় রহিল না।

ও বাড়ীর বড়বউ এই সময় আসিয়া পৌছিলেন। তিনি পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"আমি জানি, আমার খুড়তুতো ভাই কল্‌কাতায় পড়্‌ত। তারও ঐ রকম হয়। সেও চিঠি ধরা পড়াতে জানাজানি হয়েছিল। তারপর আমরা ধরে বেঁধে তার বিয়ে দিলাম। এখন রোগ শুধ্‌রেছে। একেবারে বউয়ের কেনা গোলাম হয়ে রয়েছে। তা তোমরাও মোহিনীর বিয়ে দিয়ে ফেল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা যে জান্‌তে পেরেছি, তা যেন মোহিনী না শোনে। হয়ত বাছা লজ্জায় আত্মহত্যা করে ফেলবে ; নয়ত বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে। চিঠি জুড়ে ঠিকঠাক করে তোমরা রেখে দাওগে।"

তাহাই হইল। মোহিনী যথাসময়ে আসিয়া পত্র পাইল। খুলিতে গিয়া দেখে, পরিষ্কার একটি জলের দাগ। একবার বন্ধ করিয়া যে আবার খোলা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভাবিল, বাড়ীতে কেহ নিশ্চয় ইহা খুলিয়াছে। কিন্তু পত্রের ভিতর একটা পুনশ্চ ছিল। হয়ত শৈলবালাই পত্র বন্ধ করিয়া ঐ পুনশ্চটির জন্য আবার খুলিয়া

থাকিবে। যাহা হউক বিস্ময়ে সন্দেহে মোহিনী পত্রখানি ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখিল।

গৃহিণী যথাসময়ে একথা কর্ত্তার কাণে তুলিলেন। কর্ত্তা বলিলেন,—"ক্ষেপেছ, তাও কি সম্ভব? ও হয়ত কোনও বন্ধু এয়ার্কি করে ওরকম লিখেছে। ছেলের ছেলেয় অমন করে।" গৃহিণী মনে মনে বলিলেন,—"হে মা কালীঘাটের কালী! তাই যেন হয়। আমার বাছার এ দুর্নাম যেন বেঁচে থাক্‌তে আমায় শুন্‌তে না হয়।"

পরদিন একথা শুনিয়া ওবাড়ীর বড়বউ বলিলেন,—"আচ্ছা, এ বিষয়ের তদন্ত আমরা করছি।"

মোহিনীর অনুপস্থিতিতে, বড়বউ মালতীকে লইয়া ভিন্ন চাবি দিয়া মোহিনীর কলিকাতার তোরঙ্গ খুলিয়া ফেলিলেন। বিস্তর খুঁজিতে হইল না। একখানি চমৎকার লাল রেশমী রুমালে বাঁধা এক তাড়া চিঠি। সবই এক হস্তাক্ষরে লিখিত। সবগুলিই প্রণয়ের চিঠি। প্রিয়তম, প্রাণসখা, অভিন্নহৃদয় ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ। তোমার শৈলবালা, তোমার আমি, তোমার শৈ. তোমার সাধের সই—ইত্যাদি বলিয়া শেষ। অনেকগুলাতেই লেখা, তুমি শনিবারে নিশ্চয় আসিবে। আশা দিয়া নিরাশ করিও না। অধিনী আশাপথ চাহিয়া রহিল।

বেশী পড়িবার সময় নাই। কি জানি যদি হঠাৎ মোহিনী আসিয়া পড়ে। সমস্ত চিঠি পড়িলে কিন্তু প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইতে পারিত। কারণ আমরা জানি একখানিতে লেখা ছিল,—"আমাকে গোপনে বিবাহ করিলে, মা বাপ জানিলেন না, কি উপায় হইবে," ইত্যাদি।

বড়বউ ও মালতী আসিয়া মাকে বলিল,—"মা, আর কোনও সন্দেহ নেই। গাদা গাদা চিঠি।" এই বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারিখানির মর্ম্মও শুনাইয়া দিল। মা শুনিয়া বাষ্পাকুললোচনে ঠাকুর দেবতার কাছে

মানত করিলেন—বাছাকে আমার ডাকিনীর হাত থেকে উদ্ধার কর,—আমি পূজা দিব।

সমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গৃহিণী বলিলেন,—"আর ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে কায নেই। একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও, আমি একটি পয়সাও চাই নে।"

কর্ত্তা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"এতদিন ত কোনকালে বিবাহ হয়ে যেত। তুমি যে এক বারোহাত লম্বা ফর্দ্দ বের করে বসলে! ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল। তার শাপেই ত এ সব হল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তার মেয়েকে যদি মোহিনীর পছন্দ হয়ে থাকে তবে তারই সঙ্গে বিয়ে দাও। তারা যা পারে তাই দেবে।"

কিন্তু কর্ত্তা এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। বলিলেন,—"তাও কি হয়? একবার ফিরিয়ে দিয়েছি। আবার কোন্ মুখে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাব? দেশে কি আর সুন্দরী বড় মেয়ে নেই?"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা যেখানে হয় দাও। আর কিন্তু দেরী করলে চল্‌বে না।"

সেই গ্রামেই অবিলম্বে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা বাহির হইল। যখন টাকাকড়ি সম্বন্ধে আর হাঙ্গামা নাই, তখন মনোমত পাত্রীর অভাব কি?

এক সপ্তাহের পর বিবাহের দিন স্থির হইল। মোহিনী বলিল, আমি বিবাহ করিব না। অনেক পীড়াপীড়ি কান্নাকাটি চলিল। শেষে মোহিনী মাকে বলিল,—"আমার একটা প্রস্তাব আছে, তাহাতে যদি আপত্তি না কর; তবেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে পারি।"

"কি প্রস্তাব?"

"শ্যামাচরণ বাবুদের সপরিবারে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে।"

"সে আর বিচিত্র কি ? তবে কেমন কেমন দেখায় না ? যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?"

"হাঁ, সে গত অগ্রহায়ণ মাসেই হয়ে গিয়েছে।"

মা বলিলেন,—"আচ্ছা, কর্ত্তাকে বলে' দেখব।"

বহু কষ্টে কর্ত্তা রাজি হইলেন। মোহিনী স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া ইহাঁদিগকে আনিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হইলেন না। সকলেই সন্দেহ করিলেন, এ কেবল পলাইয়া বিবাহ বন্ধ করিবার একটা ছল মাত্র।

অগত্যা মোহিনী এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা শ্বশুরকে জানাইল। যাহা যাহা ঘটিয়াছে অকপটে তৎসমুদয়ই বর্ণনা করিল। বলিল, ঘটনা আর গোপনে রাখা চলে না। আমি যেমন আপনার বিপদে সহায়তা করিয়াছি, আপনি সেইরূপ আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করুন। আমি পারিব না,—আপনি আসিয়া সমস্ত খুলিয়া বাবাকে বলুন। আর যে ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া বাবা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত আশুর বিবাহ দিন। তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

শ্যামাচরণ পত্র পাইয়া অনেক কষ্টে আফিসে ছুটি লইলেন। যে দিন বিবাহ সেই দিন বেলা দশটার সময় সপরিবারে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

সেই বৈঠকখানা আবার আজ লোকপূর্ণ। স্বর্ণকার বিবাহের অলঙ্কার লইয়া উপস্থিত। রায় মহাশয় মধ্যস্থলে বসিয়া সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। শ্যামাচরণ বাবুও সেইখানে বসিলেন। রায় মহাশয় ভারি অপ্রতিভ ;—আদর অভ্যর্থনাটা যেন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিলেন। বেলা হইয়াছে, স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিলেন।

শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"আমাকে যদি একটি ভিক্ষা দেন, তবেই আমি আহার করিব।" অত্যন্ত উৎসুক হইয়া কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি।"

তখন সেই গৃহপূর্ণ লোকের সম্মুখে শ্যামাচরণ বাবু কন্যা বিবাহের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। তাহার পর মোহিনীর পত্রখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন। শেষে সহসা রায় মহাশয়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"আপনার বিনা অনুমতিতে যে এ কার্য্য হইয়া গিয়াছে, আর এতদিন যে আপনার নিকট ইহা গোপন রাখা হইয়াছে, তাহার জন্য আমাকে আর আপনার পুত্রকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

সকলেই বলিল,—যাহা হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। এমন বিপদে মোহিনী যে ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিয়াছে, সে কুলোচিত কার্য্যই করিয়াছে। রায় মহাশয়েরা গ্রামের জমিদার; বংশাবলীক্রমে চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু।

হরেকৃষ্ণ বাবু বৈবাহিককে সাদরে উঠাইয়া বলিলেন,—"ভাই, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন হয় ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমার ইচ্ছা ছিল। নারায়ণ সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। এখন তোমরা ব'স, আমি বধূমাতার মুখ দেখিয়া আসি।"

স্বর্ণকারের নিকট হইতে কয়েকখানা অলঙ্কার লইয়া রায় মহাশয় বধূ দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকে শুনিয়া অবাক্। বিস্ময়ের ঢেউ কতকটা প্রশমিত হইলে বধূকে বরণ করিবার ধূম পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যা বেলায় শ্রীমান্ আশুতোষের সহিত সেই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। মেয়েরা ছাড়ে নাই; মোহিনীকেও বাসরে গিয়া গান গাহিতে হইয়াছিল।

হিমানী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মণিভূষণ আজ হিমানীর নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

হিমানীর পিতা বাবু কালিদাস মিত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী,—কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ মিশ্‌নরি কলেজের অধ্যাপক। মণিভূষণ আজ পাঁচ বৎসর যাবত এই কলেজের ছাত্র। কলেজে মণিভূষণের মত প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র দুইটি ছিল না। যেমন তাহার মেধা, তেমনি বুদ্ধি;—তাহার উপর আবার ঈশ্বর তাহাকে প্রচুর দেহসৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়া মণিকাঞ্চন-যোগ সাধন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মিত্র মণিভূষণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মণিভূষণ তাঁহার বাটীতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। অনেকবার চা পান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া, রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সে গুরুগৃহে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকের পরিবারস্থ সকল স্ত্রী-পুরুষের সহিত সে অবাধে মিশিতে পাইত। মণিভূষণ সুকণ্ঠ গায়ক, চিত্রবিদ্যানিপুণ, চমৎকার করিয়া ইংরাজি ও বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে,—এই সমস্ত গুণের জন্য সে সকলেরই স্নেহভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে। আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছে—এবং অন্যের পায়েও মারিয়াছে। দিনে দিনে অল্পে অল্পে সে অধ্যাপকের কুমারী কন্যা হিমানীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে এবং নিজেও হিমানীকে ভালবাসিয়া মরিয়াছে! মণিভূষণ

হিন্দু ;—তাহার পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলেই গোঁড়া হিন্দু। তাহাতে আবার সে বিবাহিত ! খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে হিমানীর পাণিগ্রহণ করিবে, সে পথও বন্ধ। সে যে বিবাহিত, তাহা এই পরিবারে কাহারও অবিদিত ছিল না,—হিমানীও তাহা প্রথমাবধিই জানিত। তাহাদের পরিণয় অসম্ভব জানিয়াও কেন তাহারা যে পরস্পরকে প্রথমে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল,—কেন যে সেই ভালবাসা অঙ্কুরে বিনাশ না করিয়া মনোমধ্যে স্নেহবারিসিঞ্চনে পরিপুষ্ট, পল্লবিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলিল, আমি তাহার কি সদুত্তর দিব ?

উভয়ের মনোভাব যখন ক্রমে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিণত হইল, যখন জানাজানি হইল, তখন সেই প্রবীণ অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী, কি উপায় হইবে, এই পরামর্শ স্থির করিতে বসিলেন। ইহাদিগকে চির-দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় দেখা গেল না। অধ্যাপক মিত্রের অন্তঃকরণটি বড়ই কোমল ছিল ;—তিনি সাশ্রুনয়নে মণিভূষণকে পরামর্শের কথা জানাইলেন। মণিভূষণ বুদ্ধিমান,—বলিবা মাত্রই সম্মত হইল। কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, একবার হিমানীর নিকট জীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার অনুমতি দিন।" তাহার ভিক্ষামিনতিপূর্ণ সকাতর চক্ষু দুইটি দেখিয়া অধ্যাপক প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না,—সম্মত হইতে হইল।

তাই আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মণিভূষণ আসিয়া, সযত্নরক্ষিত হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি, তাহার হাতের খান চারি পাঁচ পত্র—এই সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র—হিমানীর উপহার একটি অতি শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ এবং একখানি কবিতাপুস্তক, এই সমস্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দ্রব্যগুলি হিমানীর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা করিতে চলিল।

আজ সমস্ত দিন হিমানী একাকিনী নিজকক্ষে অবস্থান করিয়াছে। কিয়দ্দূরে টেবিলে তাহার ভোজনসামগ্রী অভুক্ত পড়িয়া। শরীর অতিশয় উষ্ণ। চক্ষু দুইটি রক্তকমলের মত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। গণ্ড স্থলে অশ্রুধারা একটিবার শুকাইবার অবসর পায় নাই। মণিভূষণ অতি সঙ্কুচিত পদক্ষেপে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। জানালার কাছে টেবিলের নিকট একখানি সোফায় হিমানী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল, মণিভূষণ গিয়া সেই সোফায় উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে আর সে কখনও হিমানীর সহিত একাসনে বসিবার সুখ উপভোগ করে নাই। হিমানীর একখানি সুকোমল তপ্ত হস্ত লইয়া মণিভূষণ নিজ হস্তযুগলের মধ্যে রক্ষা করিল। কথা যাহা যাহা বলিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটিও বলিতে পারিল না। সন্ধ্যা দশটার মেলে মণিভূষণ দেশে যাইবে। ক্রমে তাহার বিদায়গ্রহণের নিষ্ঠুর মুহূর্ত্ত নিকট হইতে নিকট-তর হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া গদ্গদস্বরে দুই চারি কথা বলিতে পারিল মাত্র। হিমানী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইহ জগৎকে কেন জানি না মণিভূষণের পরজগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হিমানীর অশ্রুধৌত ক্ষুদ্র সুন্দর মুখখানি হাতে করিয়া তুলিয়া সেই স্বল্পা-লোকে নিরীক্ষণ করিল। আত্মবিস্মৃতির মোহে সে সমাজ ভুলিল, নীতি ভুলিল, পাপপুণ্য ভুলিল, বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিল; সহসা আপনার পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠযুগল হিমানীর ওষ্ঠে মিলিত করিল। হিমানীর চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে চমকিল, কিন্তু মুখ সরাইল না।

সহসা যেন মণিভূষণের হৃদয়ে অশান্তির তুফান কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। সে উঠিয়া হিমানীকে বলিল,—"তবে যাই।"—"তবে আসি" কথাটাই মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু সংশোধন করিয়া

বলিল, "তবে যাই।" বলিয়া ঠিক মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হিমানী সেই সোফায় মুখ লুকাইয়া লুটাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনায় পর তিনটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের মণিভূষণের জীবনে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সামন্তপুর গ্রামের উত্তরসীমা হইতে কিছুদূরে সরস্বতী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। প্রস্থে চারি পাঁচ হাতের বেশী হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হাঁটিয়া পার হওয়া চলে। দুই তীরে আমবাগান, বাঁশঝাড়, ঝাউবন প্রভৃতি শাখাবিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য্যতাপ হইতে এই ক্ষীণতোয়া নদীটিকে রক্ষা করিতেছে।

এই নদীর তীরে মণিভূষণের নবনির্ম্মিত আবাস গৃহ। বাংলো ধরণের একটি ক্ষুদ্র বাড়ী। চারিপার্শ্বে দেশী বিলাতী নানাজাতীয় ফল ফুল ও পাতার গাছ। বাগান ঘিরিয়া সবুজ রং করা লোহার রেলিং।

এই গৃহে মণিভূষণ একাকী বাস করে। এখন তাহার বিস্তৃত ইষ্টকের ব্যবসায়। সরস্বতীর উভয়তীরে যতগুলি পাঁজা দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার। যখন কলেজে পড়িত, তখন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিই তাহার অধিক অনুরাগ ছিল। বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া সে জানিয়াছে, এই স্থানের মৃত্তিকাই ইষ্টকনির্ম্মাণের

পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। বিলাত হইতে এই ব্যবসায় সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক আনাইয়া সে পাঠ করিয়াছে। একবৎসরকাল ক্রমাগত টেষ্টট্যাব্ ভাঙ্গিয়া এবং স্পিরিট্ পোড়াইয়া একটি চূর্ণ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা কাদায় মিশাইলে ইষ্টক বেশ লাল আর খুব শক্ত হয়। এই উৎকর্ষের জন্যই মণিভূষণের ইষ্টকের অনেকদূর পর্য্যন্ত এত আদর।

এই গৃহে একটি অনতিপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ আছে, সেটী মণিভূষণের আফিস্। খাতা ও পুস্তকভরা কাচের আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সমস্ত আসবাবই সাহেবী কেতায় সজ্জিত;—এমন কি চুরটের ছাই ঝাড়িবার পাত্রটি পর্য্যন্ত যথাস্থানে রক্ষিত আছে। আজ বৈশাখের মধ্যাহ্নে মণিভূষণ আপনার নির্জ্জন আফিসগৃহে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টকের হিসাব করিতেছিল না,—কবিতা লিখিতেছিল। তাহার পরিচ্ছদও সাহেবী;—খৃষ্টানদের সঙ্গে মেলামেশা করার দরুণ পূর্ব্বাবধিই তাহার আদব কায়দা সমস্ত সাহেবী হইয়া গিয়াছিল।

মণিভূষণের সম্মুখে যে একখানি সুন্দর বিলাতী বাঁধাইকরা খাতা রহিয়াছে সেখানি প্রেমের কবিতায় পরিপূর্ণ। এক একবার সে খাতা-খানির এখানে ওখানে খুলিয়া পড়িতেছিল,—আবার বন্ধ করিয়া রাখিতেছিল। কবিতাগুলি সমস্তই স্ত্রীলোকের উক্তি। আবরণে লেখা, শ্রীমতী হিমানী দেবী বিরচিত।

কিয়ৎক্ষণ কবিতা লেখার পর দেরাজ হইতে মণিভূষণ তিনখানি চিত্র বাহির করিল;—তিন খানিতেই হিমানী। প্রথম খানিতে হিমানীর কুমারী বেশ; সুন্দর ঢল ঢল মুখখানি; চক্ষুদিয়া সরলতা উছলিয়া পড়িতেছে; যেন কাহার নিকট কি শুনিয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের হাসি হাসিতেছে। দ্বিতীয় খানিতে হিমানী বিবাহসাজে সজ্জিতা;—মুখে

সলজ্জ সুরক্তিম হাসির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে। চক্ষু আনত। হিমানী যেন আপনাতে আপনি লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। শেষের খানিতে যুগল-মূর্ত্তি। হিমানী ও মণিভূষণ পরস্পরের মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া। সে দৃষ্টিতে অতৃপ্তি, মোহ ও চাঞ্চল্য মাখান একটা ভাব নিপুণতার সহিত চিত্রিত।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, হিমানীর সঙ্গে মণিভূষণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ভ্রম করিয়াছেন। কলিকাতা পরিত্যাগের পর হইতেই মণিভূষণ হিমানী অথবা তাহার পিতামাতার কোন সংবাদ পায় নাই এবং লয়ও নাই। হিমানী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহাও সে অবগত ছিল না।

বলিতে ভুলিয়াছি যে মণিভূষণ এখন একটা বিষম চিত্তব্যাধিতে আক্রান্ত। ডাক্তারেরা ইহাকে 'মনোমেনিয়া' বলেন। এক প্রকার পাগল আর কি—সম্পূর্ণ পাগল নহে। এ ব্যাধি যাহার হয়, তাহার কেবল একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে চিত্তবিকার ঘটে ;—আর আর সমস্ত বিষয়ে তাহার মন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কিন্তু একটু পূর্ব্বের ইতিহাস বলার প্রয়োজন।

বাড়ী আসিয়া মণিভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে সে হিমানীকে ভুলিয়া স্বীয় পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী নবদুর্গাকে ভালবাসিতে পারে। জলমগ্ন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁচাইতে হইলে, তাহার মুখপথে ফুৎকারবায়ু প্রেরণ করিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বহাইতে হয়, তাহার পর স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস পুনরাগমন করে। মণিভূষণ প্রথমে নবদুর্গাকে এইরূপ কৃত্রিম মৌখিক ভালবাসা জানাইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল দর্শিল না। সে নিজের সঙ্গে যে প্রাণান্তকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে যদি নবদুর্গার সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারে, এই

দুরাশায় একদিন তাহাকে সমুদয় আত্মবৃত্তান্ত অকপটে জ্ঞাত করিল। কিন্তু তাহাতে হিত না হইয়া তাহার বিপরীত হইল। স্বামীর মুখে যাহা শুনিল, তাহা ত নবদুর্গা বিশ্বাস করিলই, তাহা ছাড়া স্বামীর প্রতি অন্য সন্দেহ করিল; এবং স্বামীকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ডতপস্বী বলিল। অকথ্য ভাষায় হিমানীর প্রতিও আক্রমণ করিল। তাহার পর একটা বীভৎস শপথ দিয়া স্বামীকে বলিল, "তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না।"

ইহার পর স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ হইল। মণিভূষণ জ্বরে পড়িল; কয়েকদিনকাল খুব জ্বর রহিল; মস্তিষ্কবিকারের সূত্রপাত তখন হইতেই। নবদুর্গা যদি আত্মীয় স্বজনের একান্ত অনুরোধে মণিভূষণকে শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহার কাছে যাইত, তাহা হইলে সে রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিত। তাহার নিকট নবদুর্গার নাম পর্য্যন্ত করিবার যো ছিল না।

জ্বর নরম পড়িল, কিন্তু একেবারে ছাড়ে না। ডাক্তার বৈদ্যেরা পরামর্শ করিয়া নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ নবদুর্গার প্রতি বিদ্বেষই এখন মণিভূষণের ব্যাধির প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। জ্বর ক্রমে ছাড়িল বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সেই একটু গোলযোগ রহিয়া গেল। নবদুর্গার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সে কেমন একরকম হইয়া যাইত। নবদুর্গাকে এই কারণে পিত্রালয় হইতে আনা হইল না, এবং পরিবার-মণ্ডলীতে তাহার সর্ব্বপ্রকার প্রসঙ্গ বর্জ্জিত হইল।

ইহার পর গ্রামের চতুর্দ্দিকে মণিভূষণ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে সরস্বতী তীরে তাহার আফিস গৃহ পাঠক দেখিয়াছেন।

নির্জ্জনেই সে ভাল থাকিত; কেহই তাহার নির্জ্জনবাস সম্বন্ধে আপত্তি করিল না। যে দিন খেয়াল হইত, সেই দিন বাড়ী আসিত। দুই তিন দিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইত। সুতরাং নবদুর্গা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল।

অতঃপর মণি আর হিমানীকে ভুলিতে চেষ্টা করিল না। মধ্যাহ্নে বিজন আফিসগৃহে বসিয়া বসিয়া হিমানীর কথা ভাবিত। বাড়ী আসিবার সময় স্বেচ্ছায় হিমানীর ফোটোগ্রাফখানি তাহার পিতাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, এখন সে জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইল। কলেজে পাঠকালে সে চলনসই রকম ছবি আঁকিতে জানিত; হিমানীর একখানি ছবির জন্য সেই বিদ্যার শরণাপন্ন হইল। প্রথম প্রথম কিছুই মিলিল না; ক্রমে একটু আধটু সাদৃশ্যের ছায়া আসিতে লাগিল। চক্ষু দুইটির ভাব যেন কিছু কিছু মিলিল। ক্রমে ওষ্ঠযুগলের ভাবও আসিল। দুই মাস পরিশ্রমের পর হিমানীর একখানি অতি সুন্দর ছবি সমাপ্ত হইল। সে দিন মণিভূষণের কি আনন্দের দিন। কত আদরে সে স্বহস্তাঙ্কিত প্রিয়ামূর্ত্তিকে চুম্বন করিল। এখানি হিমানীর কুমারীবেশের ছবি।

ছবি শেষ হইলে মণিভূষণ ভাবিল, এখানি বাঁধাইয়া না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য কাহারও হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতে বিশ্বাস হইল না। স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া দোকানে বসিয়া থাকিয়া ছবি বাঁধাইল। কিন্তু যে দিন ছবি বাঁধাইল, সেই দিনই রাত্রে তাহার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ছবিখানি বক্ষে চাপিলে আর পূর্ণ মিলন হইল না, মাঝখানে কাচের ব্যবধান রহিয়া গেল। ইহা কি সহ্য হয়? বিদ্যাপতির রাধিকাও ত ঐ কারণে গলায় হার পরিতেন না।

তাহার পর হিমানীর হইয়া সে নিজে কবিতা রচনা করিতে লাগিল। সংস্কৃত কবিরা লিখিয়াছেন, প্রেমিকা নায়িকা বিরহ বিকারে নিজেকে

নায়ক ভ্রম করিয়া নিজের প্রতি প্রেম সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। মণিও তাহাই করিল। সে শুধু হিমানীর হইয়া কবিতা লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, হিমানীর হস্তাক্ষর পর্য্যন্ত অনুকরণ করিল। সে চিত্রবিদ্যায় নিপুণ, তাহার পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন নহে। হিমানীর হস্তাক্ষরে, কল্পিতা হিমানীর কবিতাবলী খাতায় তুলিতে লাগিল। হিমানীর ছবিখানি বাক্সের গায়ে দাঁড় করাইয়া কল্পনা করিত যেন হিমানী তাহার কবিতাগুলি একে একে আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যেখানে ভাবের উন্মাদ-গভীরতা আসিত, সেখানেই ছবিখানি লইয়া চুম্বন করিত। ক্রমে তাহার স্বরচিত হিমানীকে বিবাহের বেশে সাজাইয়া, ছবিতে তাহাকে বিবাহ করিল। পাগল আর কাহাকে বলে?

এইরূপ করিয়া তিন বৎসর কাটিয়াছে। আজ সে তাহার নির্জ্জন আফিসগৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল।

বেলা একটা হইতে, আকাশে মেঘ করিল। কিছুক্ষণ পরে ধূলায় চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ঝড় উঠিল। খুব ঝড়। মণিভূষণের গৃহের উপরিস্থিত টিনের ছাদ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে। সে একবার বাহির হইয়া আকাশের পানে চাহিল। জল আসিতে বিলম্ব নাই।

ফিরিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মধ্যাহ্নের মেঘাচ্ছন্ন আলোক ঠিক্ সন্ধ্যালোকের মত দেখাইতেছিল। জানালার কাচের মধ্য দিয়া মণিভূষণ প্রকৃতির উন্মাদনৃত্য দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিল, তাহার কম্পাউণ্ডের ভিতর, বাগানে, একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। চিনিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না,—হিমানী। হিমানীর বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতেছে; বাগানের গোলাপফুলের পাপড়ি খসিয়া আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িতেছে। হিমানী দাঁড়াইয়া চকিতা হরিণীর মত ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে।

মণিভূষণ কলের পুত্তলের মত আসন ছাড়িয়া উঠিয়া গেল। বাগানে গিয়া হিমানীর মুখপানে চাহিল। তাহার পর হাতখানি ধরিয়া বলিল,—"এস"।

হিমানী মণিভূষণের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহার পরিধানে একখানি মেঘলা রঙের দেশী শাড়ী, সেই কাপড়েরই জ্যাকেট; শাড়ীখানি অল্প তুলিয়া মাথায় দেওয়া, এদিকে ওদিকে একটি আধটি ব্রোচ্ দিয়া আটকানো যাহাতে মাথা হইতে সরিয়া না যায়। বামস্কন্ধের একটু নিম্নভাগে হরতনের আকারে একটি ছোট কালো ঘড়ি, অলঙ্কার এবং আবশ্যকতা দুই সম্পাদন করিতেছে। বেশে কোনও আড়ম্বর নাই, কিন্তু পারিপাট্য-গুণে নয়নাকর্ষক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া মণিভূষণ হিমানীকে একখানি চেয়ারে বসাইল। হু হু করিয়া বাতাস আসিতেছিল, সুতরাং কপাট বন্ধ করিয়া দিতে হইল। এইবার বৃষ্টিও আসিল; মাথার উপর টিনের ছাদে নববর্ষাজল-পাতে বিচিত্র সঙ্গীত উৎপন্ন হইল।

তখনও হিমানী নীরবে বসিয়া। মণিভূষণ ডাকিল;—"হিমানী"।

হিমানী কম্পিতস্বরে উত্তর করিল,—"কি, মণি?"

"একি স্বপ্ন দেখিতেছি, না সত্য?"

"সত্য। স্বপ্ন হইলে বেশ হইত।"

"কেন বেশ হইত? আমার ত শঙ্কা হইতেছে, পাছে ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়।"

"দুঃসংবাদ আনিয়াছি। তোমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তোমায় দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি।"

"আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রীর সংবাদ তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছি।"

"কৃষ্ণনগর!—কৃষ্ণনগরে কি করিতে গিয়াছিলে?"

হিমানী তখন সংক্ষেপে পূর্ব্বকথা বলিল। বলিল,—"তুমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে তিন মাস পরে আমার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য আমার মা যীশুখৃষ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরে যে জেনানা-মিশন্ খুলিয়াছে, তিনি তাহার কর্ত্রী। আমিও তাঁহার কাছে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করি। এইরূপ দুই বৎসর আমরা কৃষ্ণনগরে।"

শুনিয়া মণিভূষণ বলিল,—"আমার স্ত্রীর পীড়ার সংবাদকে দুঃসংবাদ কেন বলিতেছ হিমা? আমার স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহারও জীবন দুঃখময়, আমারও তাহাই।"

হিমানী বলিল,—"ছি মণি, ওকথা মুখে আনিও না। স্বর্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন? আমি তোমার কথায় লজ্জিত হইতেছি।"

মণিভূষণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—"দুটী প্রাণীকে চিরপিপাসায় দগ্ধ করা কি ঈশ্বরের মত কায?"

হিমানী বলিল,—"ছি মণি, ওকথা বলিও না। ঈশ্বরের উপর বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা ছাড়া, কেন তুমি ভুলিয়া যাও যে তুমি বিবাহিত ব্যক্তি এবং তোমার স্ত্রী বর্ত্তমান?"

মণিভূষণ বলিল,—"সত্য বলিয়াছ হিমানী, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান এবং তিনি এই ঘরেই আছেন। দেখিবে? তোমাকেও ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখিতে, তাই ভ্রম করিয়াছিলাম।"

হিমানী ভয় ও বিস্ময়ের সহিত মণিভূষণের মুখপানে চাহিল। তাহার উন্মাদব্যাধির কথা সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল।

মণিভূষণ ছবি তিনখানি বাহির করিয়া হিমানীর হাতে দিল। হিমানী অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অল্প আলোকে ছবিগুলি দেখিল। ওদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে দুই ফোঁটা অশ্রুমোচন করিল। মনে মনে ভাবিল,—মানুষ-জন্ম অপেক্ষা ছবি-জন্ম অনেক ভাল। শেষে ছবিগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল,—"এ তুমি কোথায় পাইলে ?"

মণিভূষণ উত্তর করিল,—"তুমি দিয়াছিলে মনে নাই ? আমার বুকের ভিতর রাখা ছিল, তিল তিল করিয়া বাহির করিয়াছি।"

আর হিমানী পারিল না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা বহিয়া তাহার কপোল ভাসাইল। মণিও কাঁদিল। হিমানী একটু সুস্থ হইয়া বলিল,—"মণি, এতদিন তবে কি করিলে ?"

মণিভূষণ বলিল,—"তুমিই বা কি করিলে ?"

হিমানী বলিল,—"আমি যে কি করিয়াছি তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

মণিভূষণ বলিল,—"আমিও জানি, এই দেখ।" বলিয়া কবিতার খাতাখানি হিমানীর হাতে দিল।

হিমানী দেখিল, তাহার হস্তাক্ষর। পড়িল—তাহারই মনের কথা বটে। মণিভূষণকে একটা কথা বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু তখনি আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ভাবিল "এ কি করিতেছি। নবদুর্গার মঙ্গলামঙ্গল আমার হাতে, কিন্তু আমি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিতেছি। নিবান আগুন আবার জ্বালিতে বসিয়াছি!"

তখন জল ছাড়িয়াছে; আকাশও পরিষ্কার। হিমানী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"মণি, অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিলাম। পাঁচটার গাড়ীতে আমাকে কৃষ্ণনগর ফিরিতেই হইবে। আমার হাতে ভিন্ন নবদুর্গা ঔষধ খায় না। তুমি কাল যাইবে ত ?"

মণিভূষণ ভাবিয়া বলিল—"যাইব।" মনে মনে বলিল—"প্রাণেশ্বরি, তোমার দেখা পাইবার জন্য নরকেও যাইতে পারি।"

হিমানী বলিল—"তবে আমি চলিলাম।"

মণিভূষণ ষ্টেশন অবধি হিমানীকে রাখিয়া আসিতে চাহিল। হিমানী আপত্তি করিল, কিন্তু মণিভূষণ শুনিল না, সঙ্গে গেল। পথে হিমানী মণিভূষণকে সাবধান করিয়া দিল, তোমার সঙ্গে যে আমি পূর্ব্বাবধি পরিচিত, তাহা সেখানে প্রকাশ করিও না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন মণিভূষণ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীর পীড়া সাংঘাতিক অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, একটু সুরাহা হইয়াছে। হিমানী স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছে। তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বাবা, এতদিন পরে কি মনে পড়িল! ও ছেলে মানুষ, ওর কি বুদ্ধি আছে? ওর কথা কি আর ধরিতে হয়!" মণিভূষণ অপ্রতিভের মত মাটীর পানে চাহিয়া, বামহস্তে গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল; কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

হিমানীকে সেখানে সবাই মেমডাক্তার বলিত। মণিভূষণ শুনিল, মেমডাক্তার দুই বৎসর যাবৎ নবদুর্গার সহিত সখীত্ববন্ধনে বদ্ধ। এই দুই বৎসরের প্রায় প্রতিদিনই তিনি আসিয়া নবদুর্গাকে লেখাপড়া এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম শিখাইয়াছেন। পীড়ার প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি স্বয়ং চিকিৎসা করিতেছেন। এখন যে নবদুর্গার বাঁচিবার আশা

হইয়াছে, তাহা কেবল মেমডাক্তারের সযত্ন শুশ্রূষা এবং অশ্রান্ত চিকিৎসার গুণে।

শুনিয়া মণিভূষণের অন্তরাত্মা পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যে দেবীকে সে এতদিন হৃদয়মন্দিরে পূজা করিয়া আসিতেছে, সে দেবীর দেবীত্ব সত্যকার—কল্পনার নহে।

হিমানী ও মণিভূষণ দুইজনে রাত্রি জাগিয়া নবদুর্গার সেবা করিতে লাগিল।

এইরূপে দুইদিন কাটিল। তৃতীয় দিনে হিমানী তাহার চিকিৎসা-গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া সমস্ত প্রভাতকাল অধ্যয়ন করিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পরিবারস্থ সকলকে বলিল,—"যদিও রোগিনীর অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন নহে বটে, কিন্তু দুর্ব্বলতা এত অধিক যে হঠাৎ জীবন সংশয় হইতে পারে। এই দুর্ব্বলতার আশু প্রতিকারের জন্য ইঁহার শরীরে কোনও রোগশূন্য স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির রক্ত সঞ্চালন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। জীবিত ব্যক্তি কে রক্ত দিবে? কার এত সাহস? হিমানী বলিল,—"কোনও চিন্তা নাই। আমি দিব।"

কেহ কেহ বলিল,—"তাও কি হয়! শেষে কি হইতে কি হইবে?"

হিমানী বলিল,—"তাহাতে কোন বিপদ সম্ভাবনা নাই। আমি সবল ও সুস্থকায়, বয়সেও রোগিনীর সমান, আমার রক্তেই সব চেয়ে বেশী উপকার হইবে।"

নবদুর্গার দাদা বলিলেন,—"ঐরূপ বয়সের কোনও ছোটলোকের মেয়েকে টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করিবার চেষ্টা দেখা যাউক।"

হিমানী বলিল,—“না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমিই দিব। কোনও ভয় নাই, ভয় থাকিলে আমি এমন কায কেন করিব? প্রাণের মায়া আর কার নাই?”

লোকে মনে করিল, তা বটেও ত। ভয় থাকিলে রোগীর জন্য কেন ডাক্তার এত করিতে যাইবে, গরজ কি?—চিকিৎসায় হিমানীর বেশ পশার ছিল, তাহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কিছু সন্দেহ হইল না। নবদুর্গার মা শেষে বলিলেন—“যা তুমি ভাল বোঝ বাছা! কিন্তু যেন কোনও বিপদ ঘটাইও না।”

পাড়ায় একজন নবপরীক্ষোত্তীর্ণ নেটিভ্ ডাক্তার ছিল, হিমানী তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রক্রিয়ার সময় একজন চিকিৎসাব্যবসায়ীর সাহায্য প্রয়োজন। সকলে বলিল,—“যদি সাহায্যেরই প্রয়োজন, তবে সাহেব ডাক্তার আনান যাউক। ও অভিজ্ঞতাবিহীন ডাক্তারকে বিশ্বাস কি?”

হিমানী বলিল,—“বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। কেন বৃথা অর্থব্যয় ও বিলম্ব বৃদ্ধি করিবেন?”—বুঝি হিমানীর শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে বিজ্ঞ সাহেব ডাক্তার আসিয়া তাহার চিকিৎসা প্রণালীতে বাধা দেয়।

পরামর্শ ঠিক হইল, এই রক্ত সঞ্চালন কার্য্য রাত্রে ঠাণ্ডার সময় করিতে হইবে। নিজের হাঁসপাতাল হইতে হিমানী প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া রাখিল। নেটিভ্ ডাক্তারকেও বলিয়া কহিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিল।

রাত্রি নয়টার সময় যথারীতি কোট প্যাণ্টালুন আঁটিয়া, ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া, নেটিভ্ ডাক্তার উপস্থিত। সাবধানে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে রোগিনীর হাতের কব্জির একটা ধমনী ছিন্ন করিয়া যথারীতি নল বসান হইল। পরে সেই নল আনিয়া হিমানীর হস্তের ছিন্ন ধমনীর

মুখে যোজিত করা হইল। নেটিভ্ ডাক্তার ধীরে ধীরে কল চালাইল। হিমানীর শরীর হইতে রক্তধারা নল বহিয়া নবদুর্গার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চলিলে, হিমানীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষু বসিয়া গেল, হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ক্ষীণস্বরে সে সহকারী ডাক্তারকে বলিল,—"এইবার বন্ধ করুন, আমার মাথা ঘুরিতেছে।"

কল বন্ধ হইল। ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে নল খুলিয়া একে একে উভয়ের ছিন্ন ধমনী বাঁধিয়া দিল। ক্ষতমুখে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ্ করিল।

নবদুর্গার মা হিমানীকে ধরিয়া তাহার শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। মণিভূষণ আর দুই একজন তাহার সঙ্গে গেল। হিমানী শয়ন করিল। তাহার কথা জড়ান,—যেন নেশা হইয়াছে। বলিল,—"আমার মুখে অল্প অল্প করিয়া সেই ঔষধ ও ব্রাণ্ডি মিশান গরম দুধ দাও।"

দুগ্ধ পানে হিমানী একটু সুস্থ হইল। বলিল—"আর কিছু করিতে হইবে না। তোমরা যাও। আমি ঘুমাইব। ঘুমাইলেই সব সারিয়া যাইবে।"

সকলের সঙ্গে মণিভূষণও চলিয়া যাইতেছিল। হিমানী বলিল— "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, রোগীর সম্বন্ধে আপনাকে দুই চারিটা কথা বলিব।"

সকলে চলিয়া গেল। মণিভূষণ হিমানীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল,—"মণি, আমার মাথা যেন ঘুরিতেছে। কিছু বলিতে চাই—কিন্তু হয় ত কি বলিতে কি বলিব।"

মণিভূষণ হিমানীকে ব্রাণ্ডি মিশান আর একটু দুগ্ধ পান করাইল। হিমানী আবার প্রকৃতিস্থ হইল।

সে রাত্রি পূর্ণিমা ছিল। সমস্ত বহির্দ্দেশ জ্যোৎস্নাবন্যায় প্লাবিত। কতকটা জ্যোৎস্না মুক্ত বাতায়নপথে উছলিয়া আসিয়া হিমানীর শয্যার উপরেও পড়িয়াছে। নারিকেলের পাতা কাঁপাইয়া এক একবার ঝির্‌ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে।

হিমানী বলিল,—"মণি, আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার নারীজন্ম বিফল হইবে। কিন্তু এখন তাহা কতকটা সফল করিতে পারিলাম মনে হইতেছে। তুমি যদি ব্যাঘাত না দাও তবেই হয়।"

মণিভূষণ বলিল—"সে কি হিমা! আমি ব্যাঘাত দিব?"

হিমানী জড়ান জড়ান এলান এলান কথায় ধীরে ধীরে বলিল,—"দেখ, আমার শরীরের যাহা সার পদার্থ—রক্ত—তাহা আমি নবদুর্গাকে দিলাম। উহার আত্মা লইয়া যদি আমার আত্মাটাও উহাকে দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে ওই তোমার হিমানী হইতে পারিত।"

মণিভূষণ নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মোচন করিল।

হিমানী বলিল,—"মণি, আমার কি নেশা হইয়াছে? আমি যেন কত কি দেখিতেছি, শুনিতেছি। ভারি আশ্চর্য্য। ভারি চমৎকার। যেন ঈশ্বর আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, দেবদূতেরা আসিয়াছে। আমি ত যাইব না, নবদুর্গা যাউক।"

মণিভূষণ বলিল,—"হিমা তুমি অমন করিতেছ কেন? আর একটু দুধ দিব?"

হিমানী আবার দুগ্ধ পান করিল। আবার একটু সুস্থ হইয়া বলিল,—"কতকগুলা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু বড় চমৎকার স্বপ্ন। দেখ মণি, আমি যেন নবদুর্গা হইয়া জন্মিয়াছিলাম, আর তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইতেছিল। আমি যদি নবদুর্গা হইয়া জন্মাই, তবে তুমি কি আমায় এমনি ভালবাসিবে?"

মণিভূষণ বাষ্পাকুলস্বরে বলিল—"হাঁ হিমা, এমনিই ভালবাসিব।"

হিমানী বলিল,—"তবে কাল প্রাতে আমার আত্মা নবদুর্গার সঙ্গে বিনিময় করিব।"

এই সময় নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কোন একজন হিন্দুস্থানী গলা কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিল :—

স্থখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

হিমানীর কাণে এই গান পৌঁছিল, সে জাগিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার অল্পালোকে মণিভূষণের ম্লান মুখখানির পানে চাহিল। মণিভূষণ তখন হিমানীকে নিদ্রাতুর দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। হিমানী ডাকিল—"মণি"।

মণিভূষণ এই সোহাগের স্বরে গলিয়া উত্তর করিল—"কি হিমা?"

হিমানী বলিল—"মনে পড়ে?"

মণি হিমানীর মুখের পানে চাহিল। হিমানী বলিল—"সেই একদিন কলিকাতায়, যে দিন তুমি আমাকে ফেলিয়া আসিয়াছিলে?"

সেই হিন্দুস্থানী তখনও গলা কাঁপাইয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতেছে :—

স্থখসাগরমে আয়কে ন যাইও রে পেয়াসা।

মণিভূষণের মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থগভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। হিমানী বলিল—"আমার বড় ঘুম পাইতেছে; সে দিন যাইবার সময় যাহা দিয়াছিলে, তাই দিয়া যাও।"

মণিভূষণ হিমানীর বিবর্ণ শীতল ওষ্ঠাধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিল। হিমানী বলিল,—"সেবারে দুইজনেই মনে করিয়াছিলাম, এই দেখা শেষ দেখা। কিন্তু আবার দেখা ত হইল। সে দিনের বিদায় চুম্বনের যাহা গুণ ছিল, এটিতেও যেন তাহাই থাকে।—আবার যেন দেখা হয়। আমার ঘুম পাইতেছে, এখন তুমি যাও।"

মণিভূষণ বাহির হইয়া গেল।

হিমানীকে একাকী রাখিয়া আসিয়া তাহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহার শালাজকে হিমানীর শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিল।

তিনি গিয়া দেখিলেন, হিমানীর বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, হৃৎ-স্পন্দনও থামিয়াছে। নিশ্বাসও বহিতেছে না।

চীৎকার করিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেলেন। সকলে আসিল, ডাক্তার আসিল, আলো জ্বলিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! ইনি ব্যাণ্ডেজ্ খুলিয়াছেন, ধমনীর মুখ ছিঁড়িয়া দিয়াছেন। শরীরে যাহা অল্প রক্ত অবশিষ্ট ছিল, তাহা নির্গত হইয়া গিয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা।"

* * *

মণিভূষণের পাগলামি-ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাধিতেও একটা সুলক্ষণ দেখা যায়। স্ত্রীর প্রতি তাহার মন আশ্চর্য্য-রূপে ফিরিয়া গিয়াছে। এখন সে স্ত্রীকে হিমানী বলিয়া ডাকে।

ভূত না চোর?

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রপিতামহ মহাশয় বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে দিল্লী সহরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই অবধি বংশানুক্রমে আমরা দিল্লীরই অধিবাসী। বাঙ্গালী বলিয়া এখনও নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের পরিমাণ উচ্চ-ক্রমের হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আদিবাস ডুমুরদহ গ্রাম, বঙ্গের মানচিত্রে কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহাও জ্ঞাত নহি। বাস্তবিক, আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী খাঁটি বাঙ্গালিনী না হইলে, এতদিন আমি মাতৃভাষার একটি কথাও মনে করিয়া রাখিতে পারিতাম কিনা বিশেষ সন্দেহ।

আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল থাকিলেও, পিতা ও পিতামহের দোষে আমি এক প্রকার নিঃস্ব। শুনিয়াছি আমার পিতামহের আমলে আমাদের এই অট্টালিকাখানি এই সুবিস্তৃত দিল্লী সহরের তদানীন্তন কোনও রঙ্গিণীর চরণরেণুকায় বঞ্চিত হয় নাই। আমার পিতার চরিত্রও নির্দ্দোষ ছিল না;—কিন্তু তাঁহার ক্যাস্‌বাক্সে টাকাও অধিক ছিল না। শেষ দশায় তিনি বাড়ীখানি বন্ধক দিয়া যান; তাঁহার মৃত্যুর পরে, আমি স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া বহুকষ্টে বাড়ীখানি উদ্ধার করি। এখন অনেক উমেদারীর পর জজ্ সাহেবের কাছারিতে সেরেস্তাদারী কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি।

মহল্লা "মোসাক্ চৌকে" আমাদের বসতি। দিল্লীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের বাড়ীটি সেকেলে ধরণের, চক্‌মিলান প্রকাণ্ড তিনতালা অট্টালিকা,—অনেকগুলি ঘর। আমরা স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী, দুটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, আমরা অত বড় বাড়ী লইয়া কি করিব? অনেক দিন হইতে মনে করিতেছিলাম, যদি ভাড়াটিয়া পাই, তবে তেতালার উপরের ঘরগুলি ভাড়া দিই। তেতালার ভাল ঘরগুলি এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রে ছাদের মুক্ত বায়ুর মহাসুখ অন্যের জন্য ছাড়িয়া দিতে যে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। বাড়ীর ভিতর দিয়া না যাইয়া, বাহির হইতেও তেতালার উপর পৌঁছান যায়। রাস্তার ধারে যেখানে আমাদের সদর দরজা, তাহার বাম দিকেই একটু গলির মত আছে। সেই গলিতে সিঁড়ির দরজা আছে, তাহা দিয়া পরে পরে দোতালায় ও তেতালায় যাওয়া যায়। সিঁড়ির যে দরজা দোতালায় খুলিয়াছে, সেইটিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দিলেই, আর আমাদের সঙ্গে তেতালার কোনই সম্বন্ধ রহিল না। নীচেরতলায় আমার প্রপিতামহ মহাশয়ের "দফ্‌তরখানা" ছিল—কর্ম্মচারী, লোকজনে সদা পূর্ণ থাকিত; সেই জন্য মেয়েছেলেদের বাহিরে যাইতে হইলে এই সিঁড়ির দরজার মুখে পাল্কী আসিয়া লাগিত;—অর্থাৎ এইটাই যেন আমাদের খিড়্‌কী দরজার মত ছিল।

আমি যে উপরতালাটি ভাড়া দিব, তাহা অনেক দিন হইতে অনেক লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইয়াছি। কয়েকটা লোক চাহিয়াও ছিল, কিন্তু কেহই মনের মত হয় নাই বলিয়া দেওয়া হয় নাই। হয় অতি অল্প ভাড়া দিতে চায়, নয়ত মুসলমান, নয়ত আর কোনও বাধা থাকে। একদিন রবিবারে অপরাহ্ণে বৈঠকখানা ঘরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছি, মৌলবী সাহেব তক্তপোষের উপর ছেলেদের লইয়া সুর

করিয়া করিয়া "চুয়া হঙ্গে রফ্‌তন্ কুনদ্‌জানে পাক্" ইত্যাদি গোলেস্তাঁ পড়াইতেছেন, এমন সময় একটি ফিরিঙ্গি সাহেব আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহাকে সাহেব দেখিয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দিলাম, নিজে তক্তপোষে বসিলাম।

সাহেব বলিলেন—"বাবু, আপনার নাম সেরেস্তাদার বাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আপনি তেতালার মহল ভাড়া দিবেন?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"কত ভাড়া? আমি লইতে ইচ্ছা করি।"

আমি বলিলাম—"আপনি লইবেন? বেশ ত! আগে দেখুন কেমন কেমন ঘর দুয়ার। পছন্দ যদি হয়, তাহার পর সে কথা হইবে।"

সাহেব সম্মত হইলেন। আমি বাড়ীর ভিতর হইতে সিঁড়ির খিড়কী-দরজার চাবি চাহিয়া আনিলাম। সাহেবকে লইয়া উপরে গেলাম। ঘরগুলি, গোসলখানা ইত্যাদি সমস্ত দেখিয়া সাহেব ভারি খুসী হইলেন। শেষে ছাদের উপর যাওয়া গেল। সেখানে একটি ছোট কুঠারি ছিল, সাহেব বলিলেন, এইটি আমার "বাবুর্চ্চিখানা" হইবে।

দেখা শেষ হইলে দুইজনে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। ভাড়ার কথা হইল। সাহেব বলিলেন—"কত চাহেন?" আমি বলিলাম, "কত দিতে পারেন?" সাহেব বলিলেন—"দশ"। আমি শুনিয়া হাসিলাম। মৌলবী সাহেব তাঁহার সেই সুদীর্ঘ দাড়ী দোলাইয়া হা হা হা হা করিয়া সপ্তমে এমন হাসিলেন, যে সম্মুখে রাজপথচারী দুই চারিজন লোক ঘরের মধ্যে সোৎসুক দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল। মৌলবী সাহেব যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ এই—"এমন ইন্দ্রালয় (ফির্‌দোস্ত) ইহার ভাড়া দশ টাকা!" সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া

আমাকে বলিলেন—"বাবু, আপনি কত চাহেন?" আমি বলিলাম—"পঁচিশ।" সাহেব বলিলেন—"অত হইবে না, পনেরোর বেশী এক পয়সা নহে।" আমি বলিলাম—"সাহেব, আপনি বিবেচনা করুন। তেতালার উপর, অমন ভেন্টিলেটেড্ ঘর, অমন ছাদ" ইত্যাদি। সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমার মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি আমির লোক; আমি বড় গরীব। আমার প্রতি দয়া করিয়া যদি অল্প ভাড়ায় দেন ত ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

সাহেবের করুণ কাতরোক্তিতে আমার হৃদয় গলিয়া গেল। হোক না কালো ফিরিঙ্গি সাহেব—হ্যাটকোটধারী ত বটে! ঐ পরিচ্ছদবিশিষ্ট জীবগণের নিকট হইতে গালি ধমকই আমাদের ন্যায্য পাওনা বলিয়া অনেক দিন হইতে মনে মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে। সুতরাং ও শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মিষ্ট কথা শুনিলেই ভিজিয়া যাইতে হয়—কাতরোক্তিতে আর হইবে না?

আমি বলিলাম—"আচ্ছা সাহেব, আপনি বসুন! দশ মিনিট পরে আসিয়া আপনাকে বলিব।" সাহেব নিশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"অল্‌রাইট্ বাবু।"

গৃহিণী ত প্রথমে সাহেব শুনিয়া কিছুতেই রাজি হন না। বলিলেন—"সাহেবকে ভাড়া দিব যদি, তবে মুসলমানেরা কি দোষ করিয়াছিল? কে জানে বাবু, তোমার কেমন প্রবৃত্তি!" আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম—সাহেবেরা মুসলমান নহে উহারা অন্য জাতি। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। গৃহিণী বলিলেন—"সেই ত মাংস রাঁধিবে, পেঁয়াজ রাঁধিবে, গন্ধে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইবে?" আমি বলিলাম, "সে ভয় নাই; সাহেবের রসুইঘর ছাদের উপর হইবে, এখানে দুর্গন্ধ আসিবে

না।" শুনিয়া গৃহিণী আশ্বস্ত হইলেন এবং মত করিলেন। ভাড়ার কথায় তাঁহার কোনও বক্তব্য ছিল না। অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সেরেস্তাদার স্বামী তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর, ইহাই তাঁহার চির দিন বিশ্বাস। তবে তিনি বলিলেন—"সাহেব যদি ননী আর চারুকে কিছু কিছু ইংরাজি পড়াইতে স্বীকার হন, তবে অল্প ভাড়ায় বা ভাড়া না লইয়া দেওয়া যাইতে পারে।'" শুনিয়া আমার মনে হইল, ঠিক ত! "দেখা যাক্" বলিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া নীচে চলিয়া গেলাম।

সাহেবকে বলিলাম—"আপনি যদি আমার ছেলেদুটিকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ইংরাজি পড়াইতে পারেন, তবে আপনার কিছুই ভাড়া লাগিবে না।" এ প্রস্তাবে সাহেব পরম আহ্লাদিত হইয়া সম্মত হইলেন এবং আমাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন—তাঁহার পত্নী আমার "লেডির"—(হা হা—শৈলবালা লেডি! ভারি হাসির কথা) "ক্যাপিট্যাল্ কম্প্যানিয়ন্" (উত্তম সঙ্গিনী) হইবেন, এবং অনেক প্রকার উলটুলের কায শিখাইয়া দিতে পারিবেন। আমি ভাবিলাম আমার স্ত্রী সেই ম্লেচ্ছানীকে চৌকাঠের এ দিকে পদার্পণ করিতে দিলে ত! সাহেব বলিলেন—"বাবু, তবে আমি পরশু বৈকালে জিনিষপত্র ও মেম সাহেবকে লইয়া আসিব। কাল আপনি ঘরগুলা পরিষ্কার করাইয়া রাখিবেন।" বলিয়া তিনি আমার সহিত শেক্‌হাণ্ড করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাহেব সপরিবারে জিনিষপত্র লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন—"বাবু আমি গাজীপুর হইতে পত্র পাইয়াছি আমার শ্যালক বড় পীড়িত। আমরা আজই রাত্রে সেখানে চলিলাম। জিনিষপত্র সব চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। বোধ হয় দুই সপ্তাহের এ দিকে ফিরিতে পারিব না।" বলিয়া সাহেব ও মেম খিড়কীর সিঁড়ির দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা বেলায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকাল সকাল শয়ন করা আমাদের বহুদিনের অভ্যাস। যখন রাত্রি নয়টা বাজে, তখন আমাদের বাড়ীটি অন্ধকার হয়, এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। রাত্রি চারিটা বাজিলেই সকলকার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, ছেলেরা বিছানায় থাকিয়াই "শুক্রো সিপাসো মিন্নতোইজ্জৎ খোদা এরা" করিয়া পারসী শ্লোক আবৃত্তি করিতে থাকে। আমরা স্ত্রী পুরুষে সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হই। বেশ আলো হইলে তবে সকলে শয্যা-ত্যাগ করি।

সাহেব যে দিন গাজীপুর গেলেন, তাহার তিন চারিদিন পরে অনেক রাত্রে (বোধ হয় বারোটা হইবে—বারোটাই আমাদের "অনেক রাত্রি") হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বোধ হইল যেন উপরে দুব্ দুব্ করিয়া কি শব্দ হইতেছে। কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলাম, শব্দ আর শুনা গেল না। একটু তন্দ্রা আসিল। আবার যেন শব্দ হইল। মনে করিলাম, ও কিছু নয়, কি শুনিতে কি শুনিয়াছি। অনেকক্ষণ কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম, আর কিছুই শুনিলাম না। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক রাত্রে কাহার মৃদুহস্তস্পর্শে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আর ভয়ের কোনও কারণ রহিল না। শৈলবালা কম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"ওঠ ওঠ—উপর ঘরে ভূত আসিয়াছে।"

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম,—"ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে নাকি?"

তিনি বলিলেন—"হাসি রাখ। উপরে ভারি শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি দিয়া কে যেন ওঠা নামা করিতেছিল। আমার গা কেমন করিতেছে।"

আমি সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলাম। ঠিক সেই সময়ে উপরে গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হইল। মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ভাবিলাম, ভয় পাওয়া উচিত নহে। আমি ভয় পাইয়াছি দেখিলে এই বাঙ্গালিনীর ত মূর্চ্ছা হইবে। সুতরাং সাহস করিয়া বলিলাম—"বেরাল টেরাল আসিয়াছে বোধ হয়।"

স্ত্রী বলিলেন—"তুমি কি পাগল হইলে? বেরালের পায়ের শব্দে কখনও গুম্ গুম্ করিয়া শব্দ হয়?"

আমি বলিলাম—"কুকুর ত হইতে পারে?"

"কুকুর কোথা দিয়া যাইবে?"

"সাহেবের কুকুর বোধ হয় সাহেব ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন।"

"সাহেবের ত কুকুর আসে নাই।"

মনে করিলাম,—তাইত! বলিলাম—"বোধ হয় চোর টোর"।—গৃহিণী এ কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। খোকা কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাহার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম মনে নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, শৈলবালার চক্ষু রক্তবর্ণ। বলিলেন, সমস্ত রাত্রি ভয়ে তাঁহার ঘুম হয় নাই। আবার নাকি বেশী রাত্রেও দুইবার শব্দ হইয়াছিল। আমি যে আর একদিন ঐরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলি নাই। এইবার বলিলাম। শুনিয়া তিনি অধিক ভীত হইলেন।

যথাসময়ে ছেলেরা আহার করিয়া স্কুলে গেল। আমি কাছারি গেলাম। মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া রহিল। কাহারও কাছে এ কথা বলিলাম না। সহকর্ম্মীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"অক্ষয় বাবু, আজ আপনার অসুখ করেছে নাকি?" একজনকে ঠাকুরদাদা বলি, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"কা'ল রাত্রে নাত্ বৌ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বুঝি?" ইত্যাদি।

সে দিন একটু সকাল সকাল কাছারি বন্ধ হইল। পরদিন বক্‌রা-ইদের ছুটি। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল। তাহারা খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। আমরা পরামর্শ করিলাম, আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে ব্যাপারটা কি।

সকাল সকাল বালকবালিকাদিগকে খাওয়াইয়া তাহাদিগকে বিছানায় দেওয়া হইল। আমি ভাল আহার করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অমন করিয়া ঘাঁতিয়া বসিয়া থাকিলে কি খাওয়া যায়? আর শৈলবালা—তিনি ত নাম মাত্র আসনে বসিলেন।

দুইটা বাতি ঠিক করিয়া রাখিলাম। দিয়াশলাই রাখিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—"চল আমরা ওঘরে গিয়ে কিছু পড়ি টড়িগে।" আলোক সম্মুখে রাখিয়া গৃহিণী একখানি বাঙ্গালা বহি লইয়া পড়িতে লাগিলেন, আমি তামাক খাইতে খাইতে শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মন তখন উদ্‌ভ্রান্ত। কতক শুনি, আবার গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলি। এই রকম করিয়া রাত্রি দশটা বাজিল। তখন আস্তে আস্তে হুট্ হুট্ করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। শৈলবালা বলিলেন—"ঐ দেখ।" বলিয়া বহি বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে শব্দ বেশ স্পষ্ট আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম—"আর কিছু নয়, উপরে চোর গিয়াছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"চোর হইলে এক দিনে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইত, রোজ রোজ আসিবে কেন ? ও ভূত বই আর কিছু নয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল। আমি বলিলাম—"একবার 'কোন্ হায়রে' বলিয়া একটা হাঁক দিব ?"

"হানি কি ?"

আমি তখন উঠিয়া জানালার কাছে গেলাম। মুখ বাহির করিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"কোন্ হায় রে ?" স্বরটা যেন বড় উচ্চ হইল না। পুনশ্চ সপ্তমে বলিলাম,—"কোন্—হায়—রে ?"

কিন্তু শব্দ বন্ধ হইল না।

শৈলবালা বলিলেন—"ভূত ত তোমার ভয়ে মরে' কাঠ হয়ে যাবে !"

কিছুক্ষণ পরে শব্দ বন্ধ হইল। আমি তখন সগর্ব্বে বলিলাম—"দেখ ভূত না চোর। এ চোর তাতে কোন সন্দেহ নাই।"

গৃহিণী বলিলেন—"হায় হায়, সাহেবের সর্ব্বস্বটা চুরি করে' নিয়ে গেল গো !"

আমি বলিলাম—"দেখ, সে বেচারি আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষ-পত্রগুলি রাখিয়া গেল। আমি যদি জানিয়া শুনিয়া চোরকে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দিই, তবে নিতান্ত অধর্ম্ম হয়। আমি উপরে গিয়া চোর ধরি।"

প্রশ্ন হইল—"কেমন করিয়া যাইবে ?"

"চোর যেমন করিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির দরজার তালা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে।"

"তুয়ার কি আর খুলিয়া রাখিয়াছে? চোর যদি হয়, নিশ্চয়ই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।"

আমি বলিলাম—"তুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

গৃহিণী বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে কি আর তোমাকে ফিরিয়া পাইব? বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ভুজালি হাতে করিয়া যাইব।" গৃহিণী বলিলেন—"না, সে কখনই হইবে না। চোর নয়—চোর নয়।"

আমি বলিলাম—"যদি চোর না হয়, ভূতই হয়, তবে সিঁড়ির খিড়কী দরজায় সাহেবের তালা যেমন তেমনই থাকিবে। দেখিয়া আসিতে ক্ষতি কি?"

গৃহিণী কহিলেন—"এই রাত্রে! কাল সকাল গেলেই ত হইবে।"

আমি বলিলাম—"যদি চোরই হয়, তবে পুলিশ ডাকিতে পারিব। চাকরবাকরকে জাগাইব। সকালে চোর পলাইলে আর কি হইবে?"

শৈলবালা আমাকে তিন সত্য করাইয়া লইলেন, যদি চোরই হয়, তালা ভাঙ্গিয়াই থাকে, তবে আমি নিজে উপরে যাইব না। শেষে তাঁহার গা ছুঁইয়া শপথ করিতে হইল। যাইবার সময়—"আমার মাথা খাবে, আমার মরা মুখ দেখিবে" এই তুইটা দিব্যও প্রয়োগ করিয়া দিলেন। আমি লণ্ঠন লইয়া নীচে গেলাম। সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিলাম। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির দরজায় উপস্থিত হইলাম। সাহেবের তালা যেমন তেমনই আছে। তাহাতে মাছিটিও বসিয়া পায়ের দাগ রাখিয়া যায় নাই।

এ পথ ব্যতীত উপরে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। মানুষের ত নাই—ভূতের থাকিতে পারে, কিন্তু ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে কি মানুষ

বেলুনযোগে আমার ছাদে অবতীর্ণ হইল? ইহা ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীতে, অন্ততঃ আমাদের দেশে ত এরূপ বৈজ্ঞানিক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক উপরে গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম—"তালা ত ঠিক আছে।"

তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি ত বলিয়াইছি।"

আমার "কোন্ হায়রে" বলিয়া হাঁক দেওয়ার পর আধ ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইয়াছে। আবার শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"রাম রাম করিয়া আজিকার এ কালরাত্রি কাটিয়া যাক্—কালই সকালে তুমি অন্য বাড়ী ভাড়া কর, সেইখানে যাই। আমার এ ছেলে পিলের ঘরকন্না, কোথা থেকে হতচ্ছাড়া সাহেবকে আনিয়া জুটাইলে, বাড়ীটা ভূতের বাথান হইয়া দাঁড়াইল।"

আমি ত নীরব। ভূত—(ভূত না বলিয়া আর কি বলিব?) যেন উপরে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর যেন মনে হইল, দুইটা ভূত। একটা এ ঘরের উপর, একটা ও ঘরের উপর। আমার স্ত্রীও ইহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন,—"ঐ দেখ, একটা ছিল, দুটা ভূত হইল। সে হতভাগা মিন্‌সে কখনই সাহেব নয়। কোনও যাদুকর সাহেবের বেশ ধরে এসেছে। সেই কালো কালো বাক্সগুলো করে ভূত ভরে এনেছিল, তা কে জান'ত? মা গো মা, কি সর্ব্বনাশ হল!" বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি ত মহাবিপদে পড়িলাম। কি বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করি? কি বলিয়া ভয় ভাঙ্গিয়া দিই? ঘড়ি দেখিলাম, তখনও বারোটা বাজিতে কয় মিনিট বাকী। শৈলবালা রামনাম জপ করিতে করিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাড়ীটি চক্‌মিলান। যে বারাণ্ডায় উপরে যাইবার সিঁড়ি-দরজা আছে, সে বারাণ্ডার ঠিক বিপরীত দিকের বারাণ্ডায় আমার শয়নঘর। আমি জানালা দিয়া ওদিকের বারাণ্ডা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। যখন ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিলাম, সিঁড়ির সেই দরজাটি আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি, কিন্তু সে সময়টা একটু মেঘ থাকাতে আলোক অল্প ছিল। সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম, শ্বেত বস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তির মত কি একটা সিঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডা দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল। দুই তিন মিনিট পরে আবার সেইটা ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজা অতি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। আমি শৈলবালাকে এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় দুয়ার খুলিয়া সেই শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি বাহির হইল। এই সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—"ও কি ?" আমি বলিলাম—"ভূতই হউক, আর মানুষই হউক, ওই সে। আমি একবার দেখিব উহা কি। আমার ভুজালি কৈ ?" বলিয়া দেওয়াল হইতে ভুজালি পাড়িয়া লইলাম। স্ত্রী আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমি সবলে হাত ছাড়াইয়া এক লম্ফে ঘরের বাহিরে গেলাম। নিমেষের মধ্যে সিঁড়ির দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইলাম। মেঘটা তখন অপসৃত হইল—জ্যোৎস্না প্রকাশ হইল। দেখিলাম সিঁড়ির দরজার কাছে অনেকটা স্থান যেন রক্তমাখা! তেতালার উপর হইতে যেন কাহার কাতরাণিও শুনিতে পাইলাম। লিখিতে লজ্জা নাই, আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—মনে করিলাম বীরত্বে কায নাই,

পলাইয়া যাই। কিন্তু রহস্যের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া, সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বজ্রমুষ্টিতে ভুজালি ধরিয়া, যেন সাক্ষাৎ শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছে। সেই শাদা ছায়াটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এই সময়। তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া পড়িয়া ভুজালি তুলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—"কে তুই বল, নহিলে খুন করিব।" সেই মূর্ত্তি "My God" বলিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহার পর অতি দ্রুতভাবে ইংরাজিতে বলিল—"আমি—আমি—আমি—বাবু;—আমি।" পরিচিত কণ্ঠস্বর! নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যাহাকে বাড়ী ভাড়া দিয়াছি, সেই সাহেব!!

আমি তখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সেই সময় উপর হইতে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। বলিলাম—"সাহেব, তুমি খুন করিয়াছ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি খুন করিব কেন? তুমিই আর একটু হইলে আমাকে খুন করিয়াছিলে।"

আমি পায়ের কাছে দেখাইয়া বলিলাম—"এত রক্ত কেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ও বুঝি রক্ত? ও তো জল। এই দেখ—" বলিয়া সাহেব একটি জলপূর্ণ ছোট বাল্‌তী তুলিয়া ধরিলেন।

সাহেব বলিলেন—"এই নূতন সিমেণ্টের উপর জল পড়িয়া জ্যোৎস্নায় রক্ত বলিয়া তোমার ভ্রম হইয়াছিল।"

এই সময়ে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। সাহেব বলিলেন—"বাবু তুমি বিস্মিত হইয়াছ, ভয়ও পাইয়াছ। আমার স্ত্রী পীড়িতা—তাই ও কাতরাণি শব্দ। সকল কথা কাল সকাল বেলা বলিব। আমি কোথাও যাই নাই। গাজীপুর যাওয়ার কথা ছলনা মাত্র। আমি দেনার জ্বালায় এমন করিয়াছি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম শৈলবালা মূর্চ্ছিতা। অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলাম। সমস্ত রাত্রি সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে সুস্থ করি।

সকাল হইলে সাহেবের মুখে শুনিলাম, তিনি সেই রাত্রে আবার চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল, সে ইঁহা-দিগকে ভিতরে দিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সাহেবের নাকি মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা চাকরী হইবে—হইলেই তিনি অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইবেন। পাছে আমরা জানিতে পারি, এই ভয়ে তাঁহারা দিনের বেলায় চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। অনেক রাত্রি হইলে রান্না খাওয়া করিয়া লইতেন। আমাদের রান্নাঘরের পাশে যে চৌবাচ্চা আছে, তাহা হইতে জল লইয়া যাইতেন। শৈলবালা ত এ কথা শুনিয়া মহা খাপ্পা হইলেন, বলিলেন—না জানিয়া সাহেবের ছোঁয়া জল খাইয়া আমাদের সপরিবারের জাতি গিয়াছে।

যাহা হউক আগামী বারের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহাকে এলাহা-বাদে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিব, এরূপ আশা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিয়াছি। ভাগ্যে আমার স্ত্রী জ্যোতিষ জানেন না! এই সেদিন অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়া গিয়াছে, আপাততঃ দশ বারো বৎসরের মধ্যে আর তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বেনামী চিঠি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কত সামান্য তুচ্ছ ঘটনার মূলভিত্তির উপর কত বড় বড় ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কথিত আছে, কোনও দেশের রাজা মৃগয়া করিতে যাইবার মানসে ভৃত্যকে অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দেন। ভৃত্য যখন এই কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার শিশুপুত্র আসিয়া মিঠাই খাইবার জন্য মহা আব্দার আরম্ভ করে। পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল, ইহাতে সেই ক্রুদ্ধ শিশু একটা বংশদণ্ড তুলিয়া পিতার পদে নিক্ষেপ করিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ও মনের বিরক্তিতে ভৃত্য ভাল করিয়া জিন কষিতে পারিল না। এই ত্রুটিবশতঃ মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া রাজার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী রাজাটি ভয়ানক অত্যাচারী হইল। দেশসুদ্ধ লোক তাহার কু-শাসনে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়া গেল,—এক কথায় রাজ্যটা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। এখন, এত বড় একটা ব্যাপারের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেই সহিসপুত্রের সন্দেশ খাইবার লোভে আসিয়া পৌছিতে হয়!—আমাদের এই আখ্যায়িকাটিতেও একটি সামান্য ঘটনায় একটি বৃহৎ ফল ফলিয়াছিল। বুদ্ধিহীনা বালিকার লিখিত একখানি দুই তিন ছত্র-বেনামী চিঠিতে, একটি মনুষ্যজীবনের গতি আশ্চর্য্যরূপে ভিন্নদিকে ধাবিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন গল্প আরম্ভ করি।

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল রামসুন্দরের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য!—সে এখন পর্য্যন্ত একটিবারও শ্বশুরবাড়ী যাইতে পাইল না। সে যখন বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাহার বিবাহ হয়। তখন পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে, তাহার শ্বশুর সপরিবারে নিজ কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে ফিরিয়া যান। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ আসিল। সে বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম;—কলেরা ও বসন্ত সেই দিকটাতেই নিজেদের দিগ্বিজয়ের শিবির স্থাপনা করিয়াছিল। সংবাদপত্রের স্তম্ভ হইতে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া রামসুন্দরের পিতা পুত্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আপত্তি করিলেন। তাহার পর পূজার ছুটির সময় আবার যথারীতি নিমন্ত্রণ আসিল। কিন্তু রামসুন্দর জ্বরে পড়িল, যাওয়া হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাইষষ্ঠীর দিন আবার নিকটে আসিতে লাগিল। এবার রামসুন্দর যাইবেই। এবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইতেছে; কোনও প্রকার রোগের উপদ্রব নাই। এবার আর রামসুন্দরের আশালতা পুষ্পিত হইতে বাকী থাকিবে না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে একখানা 'টাইম-টেবিল' সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই টাইম-টেবিলখানি এখন তাহার "বেদ"—অথবা একালের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের "গীতা" হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রি দশটার সময় হুগলিতে গাড়ী চড়িতে হইবে। ছাড়িবার পূর্ব্বে "অমুক সময়ে পৌছিতেছি" বলিয়া এলাহাবাদে একখানা টেলিগ্রাম্ পাঠাইতে হইবে। তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া, উপরের বঙ্কে বিছানা পাতিয়া নিদ্রা;—নিদ্রা হইবে কি? গ্রীষ্মকালের রাত্রে রেলপথে ভ্রমণ কি আরামদায়ক! কি সুন্দর শীতল বায়ু! তাহার উপর রজনী যদি চন্দ্রালোকিত হয়!—মোকামায় গিয়া প্রভাত

হইবে। তখন এক পেয়ালা গরম গরম চা। নিশ্চয়ই খুব আরাম হইবে। বেলা দুইটার সময় এলাহাবাদে পৌঁছান যাইবে।—ইত্যাদি প্রকারে রামসুন্দর-মিস্ত্রী কল্পনার মালমসলায় আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু হরি হরি, সব পণ্ড হইয়া গেল! যাত্রার অবধারিত দিনের কিয়ৎপূর্ব্বে রামসুন্দরের মাতার ভয়ানক জ্বর।—আর যাওয়া হইল না। আমরা রামসুন্দরের প্রতি অবিচার করিব না। সে এমন কথা ভাবে নাই, আমি যাত্রা করিলে পর তখন মার জ্বর হইল না কেন? অথবা আমার যাত্রা করিবার দিন আরও কিছু পূর্ব্বে ধার্য্য হয় নাই কেন?—সে প্রাণপণে জননীদেবীর সেবা করিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হইল না, ইহার দরুণ কোনও ক্ষোভ কোনও অসন্তোষ তাহার মনে স্থান পাইল না। রামসুন্দরের মাতা আরোগ্যলাভ করিলেন। গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল। এখন রামসুন্দর আইন পড়িতেছিল, বাক্স বিছানা পুস্তকাদির তল্পী বাঁধিয়া পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলেজে তাহার সহপাঠী বিবাহিত বন্ধুরা আসিয়া নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ীর গল্প ফাঁদিল। রামসুন্দর তাহাদের গল্পে নিজের কোনও অভিজ্ঞতা যোগ করিতে পারিল না। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের বাণ আসিয়া তাহার মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে মুখটি চুণ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া পেন্সিলের মস্তকে নিজ নামের আদ্যক্ষরটি খোদিত করিয়া সময় কাটাইল।

এবৎসর রামসুন্দরের আইন পরীক্ষা। পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বাড়ীতে লিখিয়া পাঠাইল, "পরীক্ষা নিকট, পড়াশুনার চাপ অত্যন্ত অধিক, এবার বাড়ী যাইব না।" রামসুন্দরের জননী ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আপত্তি টিকিল না। ছুটীতে রামসুন্দরের মেসের বাসার সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল; রামসুন্দর একা হইয়া

পড়াশুনা করিতে লাগিল। দুইচারিদিন এইরূপে কাটিলে, একদিন ভোরের বেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর বিছানায় পড়িয়া, হঠাৎ তাহার মস্তকে একটা মৎলবের আবির্ভাব হইল, একবার এই ফাঁকে এলাহাবাদ সহরটা দেখিয়া আসিলে হয় না?—সেদিন প্রভাতে আর তাহার পড়াশুনা কিছুই হইল না। কেবল "যাব কি যাব না"—এই ভাবনায় মগ্ন রহিল। অবশেষে যাইবার পরামর্শই স্থির করিল। আহারান্তে বাজারে বাহির হইয়া, স্ত্রীর জন্য নানাপ্রকার সাবান, চিরুণী, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, লতা-পাতা-ফুল-আঁকা চিঠির কাগজ ও খাম, দুই একখানি গল্পের ও কবিতার বহি এবং আরও কত কি সব আমাদের স্মরণ নাই—ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর হাওড়ায় গিয়া, যাত্রা করিবার সংবাদ এলাহাবাদে টেলিগ্রাম্ করিয়া, ডাকগাড়ীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রামসুন্দর এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছে। তাহার শ্বশুর স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া সাদর সম্ভাষণে প্রাণাধিক জামাতাকে গৃহে লইয়া গিয়াছেন। রামসুন্দরের শ্বশুরের নাম নিমাই বাবু। সে কালের অনেক লোকে নিজ নাম অদ্ভুত রকমে ইংরাজিতে বানান করিয়া থাকেন;—ইনিও নিজের নাম Nemye Loll এইরূপ লিখিতেন। নিমাই বাবু বাল্যকালে মিশ্‌নারী স্কুলে পড়িতেন, কিঞ্চিৎ সাহেবী ধরণের লোক। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া রামসুন্দর হ্যাট্‌কোট্‌ধারী

শ্বশুরকে প্রথমে চিনিতেই পারে নাই, বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে নামাবলী গায়ে দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কি না! তাহার পর চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি তাহাকে বাধা দিয়া শেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন। নিমাই বাবু ইংলিশ ডিনারের ভয়ানক পক্ষপাতী, মোগল-ডিষ্‌গুলির প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ অল্প ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবিয়ানা বন্ধুসমাজে ও বৈঠকখানায়; অন্তঃপুরে তাহা মোটেই প্রশ্রয় পাইত না। সেখানে তিনি যতক্ষণ থাকিতেন, "জুজুটি" হইয়া থাকিতেন।

রামসুন্দর নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া খুব আমোদে দিন কাটাইতেছে। তাহার স্ত্রীর কোনও সহোদর বা সহোদরা ছিল না; কিন্তু খুড়তুতো ও পিস্‌তুতো একটি দুইটি তিনটি শ্যালিকা-রত্ন সমস্ত দিন তাহাকে খেলার পুঁতুল করিয়া তুলিল। এই তিনটির মধ্যে বড়টির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছিল। অপর দুইটির মধ্যে একটির দুধে দাঁত ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অন্যটির মাথায় একগাছিও চুল ছিল না। সম্প্রতি রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া তাহার এ বিপত্তি ঘটিয়াছিল। রামসুন্দরের বড় শ্যালিকাটি চিরদিনই বাঙ্গালা দেশের বাহিরে—তথাপি তাহার সংবাদ পাইতে বাকী ছিল না যে, ভগ্নীপতির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে হয়। অতএব সে এই কর্ত্তব্যভার স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিতে নিমেষমাত্রকাল বিলম্ব করিল না। ছোট বোন্ দুইটিকে লইয়া সে একটি ফৌজ গঠন করিয়া, রামসুন্দরের ভগ্নীপতিত্ব-দুর্গে অবিশ্রান্তভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল। পাণের ভিতর সুপারির পরিবর্ত্তে কয়লার গুঁড়া ভরিয়া দিয়া, জলের গেলাসে লবণ মিশাইয়া দিয়া, আল্‌তা গুলিয়া চা করিয়া দিয়া, রুমালে বাঁধা পোর্টমেণ্টোর চাবি হরণ করিয়া লইয়া, এমন কি জুতা একপাটি পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিয়া রামসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তুলিল। পরিবারস্থা একটি সুরসিকা, পরিচিত তাবৎ দম্পতির নামে ছড়া বাঁধিয়াছিলেন ;—রামসুন্দর ও তাহার পত্নীর নামেও বাঁধিয়াছিলেন। সেই ছড়াটি তিনজনে সমস্বরে আবৃত্তি করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি মানিল না। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই ছড়াটি এখানে বলিতেছি।

বেল ফুলের গড়ে মালা
রামসুন্দরের সুরবালা।

এই কবিনীর অন্যান্য কবিতায় তাঁহার আরও অদ্ভুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের হিতার্থ তাহার দুই একটির নমুনা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। আমার কি হৈল
অক্ষয়ের শৈল।
২। আমি কি হয়েছি কালা (!)
যতীশের নগেন্দ্রবালা।

এইরূপে জ্বালাতন হইয়া, রামসুন্দর তাহার বড় শ্যালিটিকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব উপায় অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। এই বালিকাটির নাম চিরদিনই ডেমি ছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সে হঠাৎ ইন্দুবালা হইয়া গিয়াছে। এই নূতন নাম পুরাতন মেয়েটিকে মানাইয়া লইবার জন্য বাড়ীর লোকেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদাই তাহাকে ইন্দুবালা বলিয়া ডাকেন। রামসুন্দর তাহাকে দুই একবার ডেমি বলিয়া ডাকিল, তাহাতে ইন্দুবালা কিঞ্চিৎ ক্রোধের সহিত আপত্তি জানাইল। রামসুন্দর আর ছাড়িবে কেন? সে তাহাকে ক্রমাগত ডেমি বলিতে লাগিল। ইহাতে সেই দাঁতপড়া মেয়েটির পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল; সে এবং তাহার অনুকরণে ছোট মেয়েটি "ডেমি-ড্যাম্-ড়েমি" এই পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় খ্যাপানটি সুর করিয়া উচ্চস্বরে বলিতে

বলিতে ব্রাহু তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা দেখিয়া রামসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিল। ইন্দুবালা প্রথম প্রথম অন্তঃপুরে গিয়া নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তত্রস্থ ধর্ম্মাধিকরণেরা হাসিয়া এই মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বালিকার অভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে রামসুন্দর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

সে দিন গেল। পরদিন আবার এই অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। আর কিন্তু ডেমি অন্তঃপুরে নালিশ করিতে গেল না। সে কিছু দিন পূর্ব্বে একখানি গল্পের বহিতে পড়িয়াছিল, কোনও লোক তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে অবস্থান করিতে করিতে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করে। তাহার পিতা মাতা ইহা জানিতে পারিয়া সময়মত আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে জামাই বাবুর নাকালের শেষ থাকে নাই। ইন্দুবালা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া এক টুক্‌রা কাগজে বামহস্তে লিখিল :—

"তোমার ছেলে বিলাত পলাইয়া যাইবার আয়োজন করিয়াছে, সাবধান।"

এই কাগজখানি খামে ভরিয়া, রামসুন্দরের পিতার নামে ঠিকানা দিয়া দাসীহস্তে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পত্র তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় রামসুন্দরের পিতার হস্তগত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামসুন্দরের পিতার নাম হরিবল্লভ বাবু। লোকটি সম্পূর্ণ সে কালেরও নহেন, এ কালেরও নহেন। সামান্য ইংরাজি জানেন। বয়স পঞ্চাশ। পূর্ব্বে কোথাকার নীলকুঠীতে চাকরি করিতেন। শুনা যায় সে কার্য্য-টিতে তাঁহার বেশ 'দু পয়সা' ছিল। এই 'দু পয়সা' সম্বন্ধীয় কি গোল-যোগে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। এখন বাড়ীতে বসিয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেছেন। পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত জমিদারী সম্পত্তির আয় হইতে সংসারটি বেশ চলিয়া যায় এবং "কোম্পানির" কাগজের সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধিই হইতে থাকে।

হরিবল্লভ বাবু বৈঠকখানার ঘরে বসিয়া ঘোষেদের কন্যা-বিবাহের একটা ফর্দ্দ করিয়া দিতেছিলেন। এমন সময় উল্লিখিত পত্রখানি তাঁহার হাতে পৌঁছিল। খুলিয়া পাঠ করিয়া, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এ সংবাদ গৃহিণীকে অবগত করাইলেন। তিনি ত ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়াময় এ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন অনেকগুলি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলেন, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে, কলিকাতায় গিয়া, যাহাতে ছেলেকে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ পাল্কীর বেহারা ডাকিতে লোক ছুটিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। রামসুন্দরের পিতা অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থাতেই যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাহা আর হইতে পাইল না। হরিবল্লভবাবু গৃহদেবতাকে সজলনেত্রে

ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, যদি মা কালী মা দুর্গার ইচ্ছায় এখনও সে বিলাত না গিয়া থাকে, তবে যেন তাহাকে বাড়ীতে আনা হয়; আর ছাই ইংরাজি পড়িয়া কায নাই। বামুণের ছেলে ঠাকুরপূজা করিয়া খাইবে।

হরিবল্লভবাবু কলিকাতায় পৌছিয়া রামসুন্দরের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। দরজায় চাবি বন্ধ। পাশে একটি মুসলমান দোকানদার ছিল, সে বলিল, ছুটিতে সব বাবুরাই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একটি বাবু ছিলেন, কয়দিন হইতে তাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

বৃদ্ধ হরিবল্লভের দুই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ছেলে যে বিলাত গিয়াছে, এ বিষয়ে আর তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমনটা যে হইবে, তাহা কি তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? এত কাল বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে পোষণ করিয়াছেন, সে তাঁহার এই বৃদ্ধ দশায় বুকে শেল মারিয়া বিলাত চলিয়া গেল? ভাবিলেন—আর কি সে বাঁচিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসে তবে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত হইয়া আসিবে; তাহাকে আর ঘরে রাখিতে পারিব না—শ্রাদ্ধের পর্য্যন্ত সে অধিকারী থাকিবে না। হয় ত একটা খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনিবে;—এমনও ত অনেক লোকে করিয়াছে। সকলই ইংরাজি শিক্ষার দোষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন, রামসুন্দর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সময় গ্রামের স্কুলে যে মাষ্টারিটি যুটিয়াছিল, তাহা করিতে দিলে কলিকাতায় আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া ছেলেটি খারাপ হইত না। বাসার দরজার বাহিরে দুই ধারে যে ইষ্টক নির্ম্মিত দুইটি বসিবার স্থান আছে, সেইখানে বসিয়া বৃদ্ধ ব্যথিত-মনে এই সমস্ত চিন্তা ও অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন উঠিয়া ধীরপদে আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইলেন।

তাঁহার এক বাল্যসখা জীবনকৃষ্ণবাবু হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন, বাসা বাগবাজারে, তাঁহারই কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর অনেককালের পর সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর, হরিবল্লভবাবু নিজের বিপদের কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু সমস্ত শুনিয়া নীরবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন—"আচ্ছা, বিলাত গেল, টাকা পাইল কোথায়?" হরিবল্লভ বলিলেন—"টাকা কোথায় পাইল, তাহা ত আমিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"বিলাত যাওয়া ত মুখের কথা নহে, বিস্তর টাকার প্রয়োজন। তা ছাড়া, সেখানে ত অবশ্য পড়িতে গিয়াছে, সেখানে তাহার খরচ যোগাইবে কে?" এই কথাটা শুনিয়া হরিবল্লভবাবু যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু গোলযোগ আছে। পকেট হইতে বেনামী চিঠিখানা বাহির করিয়া, জীবনকৃষ্ণবাবুর হাতে দিলেন। জীবনকৃষ্ণবাবু পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, দেরাজ হইতে চশ্‌মাটি বাহির করিলেন। বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, চশ্‌মাটি সাবরের চামড়ায় বেশ করিয়া মুছিলেন। চশ্‌মা পরিয়া উকীলোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত পত্রখানি অত্যন্ত সাবধানে পাঠ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার, তাহা তুমি কিছু আন্দাজ করিতে পার? অবশ্য বাম হাতের লেখা।" হরিবল্লভবাবু "না" উত্তর-সূচক শিরশ্চালন করিলেন। আরও কিছুক্ষণ গেল। জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"ছেলের বিবাহ দিয়াছিলে এলাহাবাদে না?" হরিবল্লভবাবু বলিলেন—"হাঁ। কেন বল দেখি?" জীবনবাবু উত্তর করিলেন, "পত্র এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। এই দেখ এলাহাবাদের ছাপ রহিয়াছে।"

হরিবল্লভবাবু সাগ্রহে বলিলেন—"তবে ত সে নিশ্চয়ই এলাহাবাদে গিয়াছে।"

জীবন বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"শুন। হয় ত এ চিঠির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোনও লোকের দুষ্টামি। কিন্তু তথাপি রামসুন্দর হঠাৎ বাসা ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার মীমাংসা হয় না। নহে ত, সে বিলাত যাইবার বাস্তবিকই আয়োজন করিয়াছে। পত্রে এ কথা বৌমাকে লিখিয়া থাকিতে পারে। কিম্বা হয় ত এই মুহূর্ত্তে সে এলাহাবাদেই অবস্থান করিতেছে।"

হরিবল্লভবাবু প্রস্তাব করিলেন,—"তবে এলাহাবাদে টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিই, যাহাতে সে না যাইতে পারে।" জীবনবাবু বলিলেন,—"পূর্ব্বে সংবাদ লওয়ার প্রয়োজন, সে এলাহাবাদে আছে কি না।" হরিবল্লভ বাবু ইহাই উচিত বিবেচনা করিলেন। বলিলেন,—"যদি এলাহাবাদে থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিব যাহাতে বিলাত না যাইতে পারে, এবং কল্যকার ডাকগাড়ীতে আমি স্বয়ং এলাহাবাদে গিয়া ছেলেকে ফিরাইয়া আনিব।"

তৎক্ষণাৎ নিমাইবাবুকে অর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—"রাম-সুন্দর ওখানে আছে কি না এবং কেমন আছে।"

জীবনকৃষ্ণবাবু বলিলেন—"যদি সে বাস্তবিকই বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তবে পথের মাঝে এলাহাবাদ, ওখানে না হইয়া কখনই যাইবে না। আজকালকার ছেলে কি না!—যদি এখনও না গিয়া থাকে, তবে আবার টেলিগ্রাফ্ করিয়া এলাহাবাদে তাহাকে আটক করান যাইবে। আর যদি কোনও উপায়ে জাহাজের ভাড়া সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে, তবে তাহার পড়িবার খরচ তোমাকে যোগা-ইতেই হইবে। অদৃষ্টে থাকে ত ছেলেটা মানুষ হইয়া আসিবে।"

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনকৃষ্ণ বাবুর বারম্বার অনুরোধে হরিবল্লভ বাবু হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যার্চ্চনায় মনোনিবেশ করিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে এগারোটা বাজিয়া গেল। এই সময়ে এলাহাবাদ হইতে উত্তর আসিল—"রামসুন্দর এখানে আছে। ভাল আছে।"

বৃদ্ধ হরিবল্লভ এ সংবাদ পাইয়া আনন্দের অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিলেন না। জীবন বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"ভাই তুমি আজ আমার প্রাণদান দিলে। আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এজন্মে বিস্মৃত হইতে পারিব না। ঈশ্বর তোমাকে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর করুন।"

জীবনকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"আমি আর তোমার উপকারটা কি করিলাম!" হরিবল্লভ বলিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি না পরামর্শ দিলে ও সব বুদ্ধি কি আমার পাড়াগেঁয়ে মাথায় প্রবেশ করিত?"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার এলাহাবাদে অর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম্ প্রেরিত হইল—"রামসুন্দর বিলাত পলাইবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাকে আটক কর। আমি আসিতেছি।"

ইহার পর দুই বন্ধু রাত্রের মত পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মানসিক উৎকণ্ঠাবশতঃ সমস্ত রাত্রি হরিবল্লভ বাবুর নিদ্রা হইল না বলিলেই হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিনের প্রভাতটি বড় সুন্দর হইয়া এলাহাবাদ সহরে দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বদিনের মেঘ ও বৃষ্টি একেবারে অন্তর্হিত। রামসুন্দর প্রাতর্ভ্রমণের পর ফিরিল। তখন বেলা ৭টা হইবে। বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার শ্বশুর মহাশয় সেই মাত্র চা পান শেষ করিয়া আরামকেদারায় বসিয়া চুরট সেবা করিতেছেন এবং একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন।

রামসুন্দর তাঁহার কাছের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। জামাতাকে দেখিয়া নিমাই বাবু সংবাদপত্রখানি টেবিলে রাখিয়া দিলেন। নেত্রলগ্ন চশ্‌মাটি ঠিক করিয়া লইয়া, চুরট্‌টি দন্তে দংশন করিয়া, ইংরাজি ভাষায় বলিলেন—"তুমি বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ? বেশ ত—অতি উত্তম কথা।"

রামসুন্দর ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত চাহিয়া রহিল।

নিমাইবাবু স্বীয় জামাতার ভাবী পদগৌরব কল্পনায় সূচিত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং সেই উচ্ছ্বাসে কেবল ইংরাজি কথাই বলিতে লাগিলেন। আমরা তাহার বঙ্গানুবাদগুলিই নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

জামাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া নিমাইবাবু বলিলেন—"আমার কাছে আর লুকাও কেন? আমি সকলই জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে বিলাত যাইবার কল্পনা করিয়াছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তুমি খরচের কি বন্দোবস্ত করিয়াছ জানি না; হয় ত বিলাতে

পৌঁছিয়া পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহাই ভাবিয়াছ। এইরূপ কেহ কেহ করিয়াছে শুনিতে পাই। তোমার পিতা দায়ে পড়িয়া তোমাকে খরচ যোগাইবেন সত্য, কিন্তু তোমার আচরণে তিনি দুঃখিত ও রুষ্ট হইবেন। তাহতে কায নাই। আমিই তোমার সমস্ত খরচের ভার লইলাম।”

রামসুন্দর এ সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। আকাশ পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। প্রথমে মনে হইয়াছিল, শ্বশুর বুঝি পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিয়া তাঁহার মুখে, কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে সে ভাবের কণিকামাত্রও লক্ষিত হইল না। উত্তরে সে যে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিমাইবাবু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

“তোমরা নব্যসম্প্রদায়েরা শ্বশুরের টাকা লইতে নিতান্ত নারাজ, আমি তাহা জানি। আমাদের সময়ে এরূপ ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয়ই ত আমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, লেখা পড়া শিখাইয়া, চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাহা না করিলে আমি এতদিন কোথায় থাকিতাম? আমার একটিমাত্র কন্যা। আমার যাহা কিছু আছে তাহা ভবিষ্যতে তোমার হইবে। তুমি তোমার নিজের টাকায় বিলাতের ব্যয় নির্ব্বাহ কর। আজ কাল যে দিন সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এখানে থাকিয়া আর কিছুই হয় না। সুতরাং মনে কোনও প্রকার দ্বিভাব করিও না।”

তখন রামসুন্দর মনে করিল, “বাঃ, এ ত দেখিতেছি ব্যাপার মন্দ নয়! শ্বশুরের অর্থে যদি একটা “কেষ্ট-বিষ্ণু” হইয়া আসিতে পারা যায়, তবে সে সুযোগ ছাড়ে এমন হস্তিমূর্খ কে আছে?” প্রকাশ্যে সাহস করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—

"আমি বিলাত যাইব আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

নিমাই বাবু পকেট হইতে টেলিগ্রাম্ দুইখানি বাহির করিয়া, হাসিতে হাসিতে রামসুন্দরের হাতে দিলেন। রামসুন্দর সে দুইটি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিল—"আর কিছুই নয়, বাবা কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিতে পান নাই। অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া একটু মজা দেখিতেছে। বাল্যকাল হইতে আমার বিলাত যাইবার ঝোঁক, ইহা তিনি অবগত আছেন, এইজন্য এ কথা সহজেই বিশ্বাস হইয়াছে। যাহা হউক, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ধরিতে আসিবেন। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে।" শ্বশুরকে বলিল—

"বাবা ইহাতে রাগ করিবেন, মা কাঁদিবেন, এমন কায করা কি আমার উচিত ?"

নিমাইবাবু একটু যেন উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—"কোন্ পিতা কোন্ সন্তানের উপর রাগ না করেন ? আর কান্না ত স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই। তোমার পিতা এখানে আসিলে তাঁহাকে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিব। বলিব আমিই তোমাকে পাঠাইয়াছি, তোমার ইহাতে কোন দোষ নাই। বরং প্রথমে তুমি অসম্মত ছিলে। আর তাঁহার সহিত সুরবালাকে পাঠাইয়া দিব। তোমার মা বধূকে পাইয়া পুত্র-বিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা-লাভ করিবেন। যখন তুমি মনে জানিতেছ এ কায গর্হিত নয়, ইহার ভাবীফল সর্ব্বাংশে শুভই হইবে, তখন একটু আধটু অসুবিধা ও সেন্টিমেণ্টালিটির জন্য কায হারান নিতান্ত বোকামি।" —এই পর্য্যন্ত বলিয়া, অল্প হাসির ভূমিকার সহিত বলিলেন—"আর তোমার উপর তোমার সে পিতার অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী—কারণ আমি হইলাম ফাদার্-ইন্-লা ;—আমিই তোমার আইনসঙ্গত

পিতা।" এই বলিয়া তিনি হোঃ—ওহ্—ওহ্ করিয়া উচ্চহাস্য করিলেন, এবং নির্ব্বাপিত চুরুট্‌টি পুনর্ব্বার প্রজ্বালিত করিয়া স্বচ্ছন্দমনে সতেজে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন বৈকালে দুই তিন ঘণ্টাকাল রামসুন্দর শ্বশুরের সহিত দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পোষাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিল। সন্ধ্যার পর এক পরিচিত সাহেব ব্যারিষ্টারের নিকট নিমাইবাবু তাহাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে বিলাতে বাস করা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ এবং কয়েকখানি পরিচয়-পত্র পাওয়া গেল। জাহাজে স্থান রাখিবার জন্য বোম্বাইয়ে টেলিগ্রাফ্ করা হইল। সেইদিন রাত্রেই তিনটার মেলট্রেণে রামসুন্দর সাহেব সাজিয়া যাত্রা করিল।

কোনওরূপ বিদ্রোহাশঙ্কায় এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল না। নিমাইবাবু গৃহিণীকে বড়ই ভয় করিতেন। মেয়েরা জানিলেন, রামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিনই হরিবল্লভবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সকল কথা ফাঁস হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে বিলক্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইন্দুবালা এই ব্যাপারসম্বন্ধে একটি কথাও বলে নাই।

সুখের বিষয়, হরিবল্লভবাবুকে ঠাণ্ডা করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। বেহাই তাঁহার পুত্রের জন্য অত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বেহাইয়ের উপর রাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ নিমাইবাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ভাল করিয়া বুঝাইলেন, বিলাতে প্রবাসকালে অথবা পথে কোনও বিপদসম্ভাবনা নাই, কোনও ভয় নাই, কোনও চিন্তা নাই, কত লোক যাইতেছে ইত্যাদি।

পূর্ব্বপরামর্শমত সুরবালাকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

উপসংহার

আমরা গল্পলেখকেরা বিধাতার বরে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদেরও ক্ষমতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিগণ আমাদের গল্পের বিষয়ীভূত হইলে, তাঁহাদিগকে মিষ্টার ছাড়া অন্য কিছু বলা আমাদের সেই ক্ষমতাসীমার অতীত। মিষ্টার রামসুন্দর বিলাত হইতে ফিরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দুই বৎসরেই বেশ পসার জমিয়া গিয়াছে। পিতা মাতা পুত্রের সম্পদে তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছেন। একটা জাঁকাল রকমের প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়ায় সমাজও রামসুন্দরকে মার্জ্জনা করিয়াছে। আপাততঃ মার্জ্জনা করিয়াছে বটে, কিন্তু কন্যার বিবাহের সময় কোনও গোল উঠিবে কিনা বলা যায় না। রামসুন্দর দেশের বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া পিতা মাতাকে মাঝে মাঝে লইয়া আসেন, কিন্তু এখানে অত্যন্ত গরম বলিয়া তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে চাহেন না।

এক বেনামী চিঠিই যে তাঁহার বিলাত যাওয়ার মূলসূত্র, তাহা রামসুন্দর অনেক দিন জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু কে যে তাহার লেখক, বহু চেষ্টাতেও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আমাদের পাঠিকাগণের প্রতি ইন্দুবালার বিশেষ অনুরোধ, যদি কখনও তাঁহারা নিমন্ত্রণসমাজে তাহার সুরিদিদির সহিত মিলিত হন, তবে যেন কথায় কথায় এটা প্রকাশ করিয়া না ফেলেন।

কুড়ানো মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেহাই বাড়ী

অপরাহ্ন কাল। শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা মতিগঞ্জের ঘাটের অশ্বত্থ-মূল লেহন করিয়া বহিতেছে। একখানি জীর্ণকলেবর ডাউলে আসিয়া ঘাটে লাগিল। একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাবধানে সন্তর্পণে তীরে অবতরণ করিলেন। মাঝি তাঁহার ব্যাগটি, ছাতাটি, লাঠিখানি নামাইয়া দিল। তিনি সেইগুলি হাতে লইয়া, দাঁড়ী মাঝির খোরাকীর জন্য একটি সিকি বাহির করিয়া দিলেন। মাঝি সিকিটি হাতে করিয়া বলিল—"কর্ত্তা, আমরা পাঁচটি প্রাণী, চার আনায় কি করে পেট ভর্‌বে ?"

"সে কিরে চার আনা কি অল্প হল ?"

"ঠাকুর, চার সের চাউল কিন্‌তেই ত চার আনা যাবে। হাঁড়ি আছে, কাঠ আছে, নুনতেল আছে—"

"নে নে—আর দু গণ্ডা পয়সা নে।" বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত সাবধানে দুই তিনবার গণিয়া, আটটি পয়সা মাঝির হাতে দিলেন। তবু মাঝি সন্তুষ্ট হইল না। বলিল—"মশাই পাঁচ পাঁচটা পেট, সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা মেহন্নতের পর—না হয় আট গণ্ডাই পূরোপূরি দিন।"

উভয়পক্ষে কিয়ংক্ষণ কথা কাটাকাটির পর বৃদ্ধ আর চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে মাঝিকে বলিলেন—"যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কি করতে এসেছ, বলিস্ আমাদের ঠাকুরমশাই একটা বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছেন।"

তাহার পর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থান অভিমুখে চলিলেন। দোকানী পশারীরা এই নূতন লোকটির পানে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার স্ব স্ব কার্য্যে মন দিল।

বৃদ্ধের নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস নবগ্রাম। সকাল বেলায় লিখিতে বসিয়াছি, অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না;—নবগ্রামের কেহ আহারের পূর্ব্বে এই বৃদ্ধের নামোচ্চারণ করে না। তাঁহার কৃপণতাযশ বহুদূর ব্যাপ্ত। মতিগঞ্জে তাঁহার বেহাই বাড়ী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অন্নদাচরণের বিবাহ হইয়াছিল। বৎসর খানেক হইবে তাঁহার বধূমাতা সন্তানসম্ভাবনাবশতঃ পিতৃগৃহে আনীত হইয়াছিলেন। আজ পাঁচ ছয় মাস হইল, একটি কচি মেয়ে রাখিয়া বধূটি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একদা উৎসববেশ পরিধান করিয়া বাদ্যভাণ্ডের সহিত সীতানাথ এই পথে পাল্কী করিয়া বর লইয়া গিয়াছিলেন, আজ সেই সমস্ত অতীত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। মনটা, বিশেষ নহে, একটু যেন বিষন্ন হইল।

বৈবাহিকের বাটী পৌঁছিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। বৈঠকখানা খোলা ছিল, সীতানাথ সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই কক্ষের ভিত্তিগাত্রে বসুধারার সপ্তরেখা আজিও বিদ্যমান। মনে হইল, পুত্রের বিবাহান্তে এই কক্ষে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের

সমকালে তাঁহার বৈবাহিক হৃষীকেশের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া তিনি একমাত্র কন্যাটির বিবাহ দিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চালানের ব্যবসায় করেন। পাঁচ বৎসরকাল উপর্য্যুপরি লোকসান দিয়া তিনি এখন শুধু নিঃস্ব নহেন, ঋণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বসুধারার চিহ্নগুলি যে রহিয়া গিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে কক্ষভিত্তিতে যে একটিবারও চূণ পড়ে নাই, সামান্য হইলেও তাহাও এই অস্বচ্ছলতার একটা নিদর্শন।

এক ছোঁড়া চাকর বাহিরে বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে সীতানাথের প্রতি আড়চক্ষে চাহিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, বুড়া নিশ্চয়ই তামাক চাহিবে, এবং তামাক সাজিতে গিয়া নিশ্চয়ই সেও দুটান টানিয়া লইবে। বেচারী নূতন তামাক খাইতে শিখিয়াছিল, ধূমপিপাসাটা তখন তাহার অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু সীতানাথের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্রই বলিলেন—"ওহে, বাবুকে একবার খবর দাও, নগাঁয়ের সীতেনাথ মুখুয্যে এসেছেন।"

আশাহত বালক এ অনুরোধে বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া নীরবে আগন্তুকের প্রতি একবার চাহিল। গম্ভীরভাবে কাস্তেখানি বেড়ার গায়ে ঝুলাইল। দড়ির তালটা ধীরে ধীরে গুটাইয়া ভাল যায়গায় রাখিল। তাহার পর অপ্রসন্নমুখে মন্থরপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনতিবিলম্বে হৃষীকেশ আধময়লা ধুতি পরিয়া, একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া, বাহির হইয়া আসিলেন। সীতানাথ দেখিলেন, বৈবাহিকের সে স্থূলবপু নাই, অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষু কোটরগত। দুইজনে নমস্কারের আদান প্রদান হইল, কোলাকুলি হইল, কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা হইল। হৃষীকেশের চক্ষু ছলছল; গোটাকত বড় বড় জলবিন্দু গণ্ড বহিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্রে পতিত হইল।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিয়া গেল। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ধূমপান করিলেন, কাহারও মুখে কথাটি নাই।

অবশেষে সীতানাথ বলিলেন—"ভাই, যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সেত আর ফিরিবে না, বৃথা আক্ষেপ করিয়া কি হইবে বল? মেয়েটিকে একবার আন দেখি।"

হৃষীকেশ উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিলেন। পশ্চাতে ঝি, তাহার কোলে ফরাসি ছিটের দোলাই জড়ান, মাতৃস্তনবঞ্চিত, শীর্ণকায় শিশুকন্যা। সে হাসিতেছে না, কাঁদিতেছে না, নিতান্তই নির্লিপ্তের মত একদিক পানে চাহিয়া আছে।

তাহার পিতামহ তাহার মুখ দেখিবার জন্য নগদ একটি আধুলি বাহির করিয়াছিলেন। কি ভাবিয়া আবার আধুলিটি রাখিয়া একটি টাকা বাহির করিলেন। মুখুয্যে মহাশয় ইহজীবনে এরূপ বদান্যতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচয় আর কখনও দেন নাই—এবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। টাকাটি দিয়া নাতিনীর মুখ দেখিলেন।

ঝি টাকাটি হাতে লইয়া অসন্তুষ্টের মত অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বলা বাহুল্য, মেয়ের আদর এখন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। কলেজের নব্যবাবু শ্বশুরালয়ে গিয়া, গিনি দিয়া প্রথমা কন্যার মুখ দেখিলে, পাড়ার লোক সেটাকে বাড়াবাড়ি বলিয়া আর হাস্য করে না। সুতরাং টাকাটি ঝির মনে ধরিবে কেন? সে ভাবিল "মর মিন্‌ষে, এত কষ্টের প্রথম মেয়েটি,—আহা, তাতে আবার মা-মরা,—একটু সোণা জুট্‌ল না মুখ দেখ্‌তে!"

ক্রমে অন্ধকার হইল। মুখোপাধ্যায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পূজার আসনে বসিবামাত্র শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বেহাইন, "ওগো মা আমার

কোথায় গেলিগো" বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত শোকার্ত্তরবে সন্ধ্যাদেবী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। হৃষীকেশের চক্ষু হইতেও ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সীতানাথ মূঢ়ের মত পূজার আসনে বসিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"হা নারায়ণ, কি করলে ?"

কান্না থামিলে সীতানাথ সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন। তাহার পর জলযোগে বসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা কে যেন টিপিয়া ধরিয়া থাকিল। যে কাযের জন্য এতখানি গঙ্গাপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ত এখন পর্য্যন্ত একটি কথাও বলা হইল না। বৈকাল হইতে কতবার বলি বলি করিয়া আর বলিতে পারেন নাই। শেষকালে স্থির করিলেন—"দূর হোক্ গে, কাল সকালেই বল্‌ব, রাত্রিটা কোন মতে কাটিয়ে দিই।"

আহারান্তে বৈঠকখানাতেই তাঁহার শয্যা প্রস্তুত হইল। হৃষীকেশ রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকথিত ভৃত্যবালক, সেই একপাশে কম্বল পাতিয়া শুইল।

দুশ্চিন্তায় সমস্তরাত্রি ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল না। যে কাযের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইবে কি হইবে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়াই রাত্রি কাটিল। তামাক সাজিতে সাজিতে চাকর ছোঁড়ার প্রাণান্ত হইল। রাত্রি তিনটার সময় যখন সীতানাথ তামাক সাজিবার জন্য আবার তাহাকে জাগাইলেন, তখন সে বলিল, "তামুক আর নেই ঠাকুর, সব ফুরিয়ে গিয়েছে।" বেগতিক দেখিয়া শেষবারে তামাক সাজিবার সময় সে বাকী তামাকটুকু জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্য্যোদ্ধার

সকাল হইলে দুর্গা দুর্গা বলিয়া সীতানাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূম পান করিতে করিতে সীতানাথ স্থির করিলেন এইবার বলি। মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সূচনাটা এইরূপ হইল।—

"বেয়াই মশাই—অদৃষ্ট ছাড়া ত আর পথ নেই, আমাদের যা অদৃষ্টে ছিল তা কে খণ্ডন কর্‌বে বল? আমার আর চার্‌টি বউ আছে, কিন্তু ছোট বউমা যেমন ছিলেন, তেমনটি কেউ নয়। আমার এত গুণের বউকে গিন্নী দেখে যেতে পান্‌নি সেই দুঃখই চিরকাল থাক্‌বে। মার আমার যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। তাঁর গুণে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত বশ হয়েছিল। বাড়ীতে রাঙী বলে একটা গাই আছে, এমনি বজ্জাৎ, তার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারে না, শিঙ পেতে গুঁতোতে আসে, কেবল ছোট বউমা কাছে গেলে সে কিছু বল্‌ত না। যায়ে যায়ে ঝগড়া কলহ, এ ত চিরদিন সকল সংসারে চলে আস্‌ছে, কিন্তু আমার অন্য বউরা, ছোট বউমাকে নিজেদের সহোদরা ভগ্নীর মত মনে কর্‌তেন। দুঃসংবাদটা শুনে বড় বউমা একবারে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি, জলস্পর্শ করেন নি। আজও বলেন, আমার পেটের সন্তান গেলে এতটা হত না।"

হৃষীকেশ চক্ষুর জলে মাটি ভিজাইতেছিলেন। কম্পিতস্বরে বলিলেন—"বেয়াই মশাই, থাক আর সে সব কথা কয়ে ফল কি, অন্য কথা বলুন।"

সীতানাথ চুপ করিলেন। তাঁহার ভূমিকাই তাঁহাকে মাঁটি করিয়া দিল। নীরবে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আবার এ কথা সে কথা পাঁচ কথায় কাটিল। এবার সীতানাথ নিজের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া ভূমিকামাত্র বর্জ্জন করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। শুনিতে এমন কাঠখোট্টা রকম ঠেকিল যে নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

কথাটা আর কিছুই নয়, বধূমাতার অলঙ্কার গুলির কথা। তাহাই বৃদ্ধ আদায় করিতে আসিয়াছেন।

প্রস্তাবটা শুনিয়া হৃষীকেশ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বৈবাহিকের আগমনসংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।—আর, এ ত জানা কথা। তবু তাঁহার মনে এক একবার দুরাশা উপস্থিত হইত, গহনাগুলি আটকাইবেন, দিবেন না। নাতিনীটি যদি বাঁচে—কুলীনের ঘরের মেয়ে, বাঁচিবারই ষোল আনা সম্ভাবনা—তবে তাঁহারই ঘাড়ে পড়িল। ঐ অলঙ্কারগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার বিবাহ দিবেন। দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়া তিনি যখন একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার ছেলেগুলাও কেহ মানুষের মত হয় নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে, কি করিয়া যে তাহারা সংসার চালাইবে, তাহাই তিনি মাঝে মাঝে ভাবিয়া আকুল হইতেন। এই সকল পাঁচ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অলঙ্কারগুলি রাখিবার দুরাশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ অশুভস্য কালহরণং, যত বিলম্ব হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। বলিলেন—"মুখুয্যে মশাই, সেই জিনিষগুলি আপনারই। তাহা যখন একবার আপনার পুত্রকে দান

করিয়াছি, তখন আর তাহার একরতি মাত্রও ফিরিয়া রাখিব না। তবে কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইতেছে, আপাততঃ আপনাকে দিতে পারিতেছি না।”

শুনিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। ভাবিলেন, বুঝি বেহাই অলঙ্কারগুলি কোথাও বন্ধক দিয়াছে। তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! বলিলেন—“কেন, এখন দিতে বাধা কি?”

হৃষীকেশ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“এই সদ্য শোকটা পাওয়া গিয়েছে, এখনও ছ মাস হয় নি। আর কিছু দিন যেতে দিন। বাক্স থেকে সে অলঙ্কার এখন বের করে কে বলুন? মেয়েদের কোথায় কি থাকে, কোথায় কি না থাকে, আমিত কিছুই জানি নে। গিন্নি সে কালরাত্রির পর থেকে সে ঘরেই আর ঢোকেন নি। তাঁর বড় আদরের শেষ মেয়েটি, কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারিনে। তার ঘরে পদার্পণ করেন না, তার কোন জিনিষটি ছুঁতে হলে কেঁদে আকুল হন। এমন অবস্থায় কি করে তাঁকে বলি, তোমার মেয়ের বাক্স খুলে গহনাগুলি বের করে দাও? শোকটা এখন বড্ড নতুন, কিছু দিন আর যেতে দিন।”

গহনা দেওয়ার বাধাস্বরূপ হৃষীকেশ কারণ যাহা দেখাইলেন, তাহা নিতান্তই সত্য;—তবে সকলের কাছে এ কারণ যথেষ্ট বলিয়া মনে না হইতে পারে। সীতানাথেরও মনে হইল না। একটু রাগ হইল। বলিলেন—

“ভাই, শোক আমার কি লাগে নি? তবে কি করবো? সংসার করতে গেলে শোক তাপ ত আছেই। এ থেকে কেউ নিস্তার পেলে এমন ত দেখলাম না,—তা সে রাজাই বল, বাদসাই বল, আর পথের ভিকারীই বল। তবু সংসারী লোককে দুদিনে তা ভুলে গিয়ে খেতে

শুভাদৃষ্ট। এরূপ ভক্তিবাহুল্যের সহিত পূজা সীতানাথ অনেককাল করেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আহারাদি শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলেন। বুড়ার আর দেরী সহে না। হৃষীকেশকে বলিলেন "ভাই, এইবার জিনিষ-গুলি নিয়ে এস, দুর্গা বলে সকাল সকাল যাত্রা করি।"

হৃষীকেশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বড় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সীতানাথ ভাবিলেন, সেই দিতেই হইবে, তবু কেমন যে কৃপণের স্বভাব, যতক্ষণ পারে ততক্ষণ দেরী করিতেছে। যাহা হউক, মনটার অবস্থা বেশ উৎফুল্ল থাকার দরুণ সীতানাথ গুণ্ গুণ্ করিয়া একটা রাগিণী ধরিলেন—

ছাড়ো মন বিষয়েরি ভাবনা অসার,
শুধু রাধানাথো পদো করো চিন্তা অনিবার।

হৃষীকেশকে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সীতানাথের গান সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"কি হল ?"

"হল না।"

"সে কি ?"

হৃষীকেশ ব্যাপারখানা বুঝাইলেন,—"মুখুয্যে মশাই, জিনিষগুলি আপনাকে দিতে প্রস্তুতই হয়েছিলাম। গিন্নীকে গিয়ে বলাতে প্রথম তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। শেষে বললেন—চাবি ত নেই। চাবি আমার মায়ের কাঁকালে ছিল, সে তাঁরই সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

কথাটা সীতানাথের বিশ্বাস হইল না। রাগিয়া বলিলেন—"সে আমি শুন্‌ব না। চাবি না থাকে বাক্স ভাঙ্গ। জিনিষ আমি না নিয়ে যাচ্ছি নে।"

হৃষীকেশ বলিলেন—"যদি না যান তবে বসে থাকুন। চাবি নেই, আমি কি করব? এই ত অবস্থা। এর ওপর কি কামার ডেকে এনে দমাদ্দম করে সিন্দুক ভাঙ্গান ভাল দেখায়, না সেটা করান আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়?"

সীতানাথ মুখ চোখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয় না। ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দেওয়াটাই তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয়। দেবে কি না দেবে সেটা খোলসা করে বল দেখি। যদি না দাও তবে পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়ে যাব, উচ্ছন্ন যাবে, তেরাত্তির পোয়াবে না।"

বৈবাহিকপ্রবরের মুখচোখের ভঙ্গিমা দেখিয়া হৃষীকেশ বড় অপমান বোধ করিলেন; মনে মনে ভারি ঘৃণা হইল। স্বয়ং গিয়া কামার ডাকিয়া আনিলেন। দোতালায় উপর তাহাকে লইয়া গিয়া সিন্দুক ভাঙ্গাইলেন। মেয়ের মা এই নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া মাটিতে লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈবাহিক গহনা লইয়া বিদায় হইলে, হৃষীকেশও শয্যাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সে দিন আর এই দম্পতির মুখে অন্নগ্রাস উঠিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুড়া বর

ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষরাজিবেষ্টিত নবগ্রাম। ভোর হইয়াছে। সকল পাখী এখনও প্রভাতী কলকূজন আরম্ভ করে নাই। একখানি ছেঁড়া বালাপোষ গায়ে দিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া বৃদ্ধ সীতানাথ ধীরে ধীরে স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিতেছেন। পূর্ব্বরাত্রির বৃষ্টিজল বৃক্ষপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া তাঁহার পাগড়ি ও বালাপোষ ভিজাইয়া দিতেছে।

ক্রমে তিনি নিজবাটীর সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজা বন্ধ। দুই পাশে দুইটি ইষ্টকনির্ম্মিত দেউড়ি বা বসিবার স্থান। তাহা বহুকাল সংস্কারের অভাবে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। দুই দিকে দুইটি কলিকাফুলের গাছ এক গা করিয়া ফুলের গহনা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষীণরুগ্নকণ্ঠে সীতানাথ ডাকিলেন—"নিতাই।" একবার, দুইবার, তিনবার ডাকাডাকির পর বাড়ীর ভিতর হইতে উত্তর পাওয়া গেল—"যাই গো।" নিতাই ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রভুর পানে চাহিয়া সে অবাক্। সপ্তাহের মধ্যে আকার প্রকার যেন একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে ছাতা নাই, লাঠি নাই, ব্যাগ নাই, এ বালাপোষ কোথা হইতে আসিল! ভাবিয়া নিতাই কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিতাই তাঁতির ছেলে, ভৃত্য বালক। এপ্রেন্টিসি করিতেছিল, মাহিনা পায় না, "প্রসাদ" পায় মাত্র। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে নিতাই, বাড়ীর সব ভাল?"

নিতাই বলিল—"ভাল। আপনার লাঠি আর ছাতা কই ?"

বৃদ্ধ অতি করুণভাবে নিতাইয়ের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। নিতাই বলিল—"ফেলে এসেছেন বুঝি ?" বৃদ্ধ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"হাঁ নিতাই, সে গেছে।"

পাকা বাঁশের লাঠিগাছটির উপর নিতাইয়ের অনেক দিন হইতে লোভ পড়িয়াছিল। একদিন সুযোগ পাইলে লাঠিখানি সে চুরি করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিবে, অনেক দিন হইতেই ইহা তাহার মনে মনে ছিল। সেই জন্য সে কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করিল। মনে করিল নিশ্চয়ই সেই মতিগঞ্জের বাড়ীর কোনও ছোঁড়া চাকরের কায, সেই লইয়াছে. লোভ সামলাইতে পারে নাই। কিন্তু ছাতাটাও লইল! সে ছাতো এমন ছেঁড়া ছিল যে তাহা মনিব তাহাকে বখ্‌সিস্ করিলেও নিতাই লইত কি না সন্দেহ। যদিও বা লইত, তবে তাহার বেতের শিকগুলি খুলিয়া লইয়া ধনুকের তীর করা চলিত মাত্র, সে ছাতা আর কোনও কাযে লাগিত না।

সীতানাথ একবারে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। নিতাই চকমকি ঠুকিয়া সোলায় আগুন ধরাইল। তামাক সাজিয়া কর্ত্তার হাতে দিল।

কর্ত্তা হুঁকাটি কলঙ্কধরা পিতলের বৈঠকের উপর রাখিয়া দিলেন। তাম্রকূটের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বিরাগ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। চক্ষু নত করিয়া মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন,—

"হা হা হা হা—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

ব্যাপার খানা দেখিয়া নিতাই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় বধূঠাকুরাণী তখন উঠিয়া বারান্দা মার্জ্জনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে

অনেক কষ্টে এবার বৃদ্ধ বলিলেন—"চাঁদবাড়ীর ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে।"

পুত্র রাগিয়া বলিল—"সে আবার কে? সে কি করে গহনার বাক্স নিলে? ছিনিয়ে নিলে? আপনি চুপ চাপ চলে এলেন, পুলিসের সাহায্য নিলেন না?"

"পুলিসে কি আমি যাই নি? পুলিসেও গিয়েছিলাম, থানার দারোগা ভূধর চাটুয্যের ভগ্নীপতি রে ভগ্নীপতি।"

"ভগ্নীপতিই হোক্ আর বাবাই হোক্। এত্তেলা দিলে ডাইরিতে তাকে লিখে নিতেই হবে, অনুসন্ধান করতেই হবে।"

"লিখে নেবে কি, উল্টো সে আমায় মিথ্যে নালিসের দায়ে জেলে দেবার ভয় দেখালে।"

কলিকাতায় যে মেসের বাসায় থাকিয়া শ্রীনিবাস লেখাপড়া করিতেন, সেই বাসায় আইন অধ্যয়নকারী একটি ছাত্র ছিল। তাহার মুখে শ্রীনিবাস মাঝে মাঝে আইন সম্পর্কীয় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাইতেন। সে অবধি শ্রীনিবাস নিজেকে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নগদ আট আনা খরচ করিয়া একখানি "মোক্তার গাইড্" পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। গ্রামের লোকের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, প্রায়ই শ্রীনিবাস কোন না কোন পক্ষের সহায়তা করিয়া পরামর্শ দান করেন। গম্ভীরভাবে পিতাকে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি হয়েছে, সব আদ্যোপান্ত খুলে বলুন, দেখি আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কি না।"

তখন বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই এক ঘণ্টা কাল ব্যাপী সকরুণ বক্তৃতার ভিতর হইতে সমস্ত হাহুতাশ, অশ্রুপাত, অনাবশ্যক মন্তব্য বাদ দিয়া সারাংশটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

নিতাই কর্ত্তার অবস্থা জানাইল। তিনি বলিলেন, বড়বাবুকে উঠাগে যা।

বড়বাবু সীতানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন? কোন বিপদ আপদ হয় নি ত?"

বৃদ্ধ লম্বিত মস্তক দুলাইয়া করুণস্বরে বলিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল, দিলে না?"

"দিয়েছিল রে দিয়েছিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

পিতা যদি আরও কিছু বলেন, এই আশায় শ্রীনিবাস তাঁহার মুখের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের মুখ হইতে হা হুতাশের অস্ফুটধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নির্গত হইল না।

অবশেষে শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবে কি হল? খোয়া গেল?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন—"হা হা হা হা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি হল, খুলেই বলুন না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে গেছে রে, নোকসান্ হয়ে গেছে।"

"কেমন করে গেল? চুরি গেছে?"

"না।"

"ডাকাতে নিয়েছে?"

"না।"

"তবে?"

বিবাহে রাজি করা যাইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, তাই শ্রীনিবাস বলিয়াছিলেন—"তবেই ত দেখ্‌ছি গোলযোগ।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ চেষ্টা করে, বলে কয়ে দেখ, নইলে এ বুড়ো বয়সে অতগুলি টাকার গহনার শোক আমি সহ্য করতে পার্‌ব না, আমি মারা যাব। ওকে বোলো বিবাহ না কর্‌লে পিতৃহত্যার পাপ ওকে লাগ্‌বে।"

অন্নদার চারিটি দাদা, অন্নদাকে পাকড়াও করিয়া আনিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া কত রকমে তাহাকে বুঝাইলেন; কত মিনতি করিলেন, তর্ক করিলেন, রাগ করিলেন, কিছুতেই অন্নদার মন টলিল না।

অন্নদার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণকে খোসামোদ করিয়া তাহাদের দ্বারায় অনুরোধ চলিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দারগ্রহণের বিরুদ্ধে অন্নদা যত প্রকার যুক্তির অবতারণা করিল, তাহার বন্ধুরা সেগুলি, যখন যেরূপ সুবিধা হইল, সুতর্ক বা বিতর্কের সাহায্যে একে একে খণ্ডন করিল। কাযের কথা ছাড়িয়া যখন ভাবের কথা আসিয়া পড়িল, তখন তাঁহারা বিজয়ীর মত অবজ্ঞাহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে শোকবিহ্বল মৃতপত্নীকের দ্বিতীয় দারগ্রহণের অজস্র উদাহরণ আনিয়া স্তূপীকৃত করিল। দেখ অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেল, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে লোটা কম্বল কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিল। দেখ অমুক স্ত্রীবিয়োগের পর এক জন যশস্বী কবি হইয়া পড়িল, বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া দেশসুদ্ধ সকলেই সমস্বরে বলিল, বাঙ্গালা ভাষায় একখানা কাব্য জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সেই আবার একটা আধটা নয়, দুই দুইটা বিবাহ করিল।

ইত্যাদি প্রকারের যুক্তিতর্ক সমরে অন্নদা শেষে পরাজয় স্বীকার করিল বটে, কিন্তু বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

এ দিকে আর সময় নাই। ভূধর চট্টোপাধ্যায় দশদিন মাত্র সময় দিয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ বিবাহের শেষ দিন। তাহার তিন দিন কাটিয়াছে, সপ্তাহ মাত্র বাকী।

ছেলে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন বাপ বলিল, তবে আমিই বিবাহ করিব। দু দুহাজার টাকার গহনা আমি কোন মতেই হাতছাড়া করিতে পারিব না, ইহাতে আমার কপালে যাহাই থাকুক।

এই সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইবা মাত্র একটা মহা হাসি টিটকারি পড়িয়া গেল। লোকে বলিল, গহনা হারাণ, নৌকা উল্টান সব ছল মাত্র। সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে দেখিয়া হারাইয়াছে বুড়ার মন, আর উল্টাইয়াছে, বুড়ার বুদ্ধিশুদ্ধি। কেহ বলিল বুড়াকে চেনা ভার, দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু হইয়াছে। কেহ বলিল, একখানা দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগলা বুড়ো" নাটক কিনিয়া উহাকে প্রেজেণ্ট কর! কেহ বলিল, বুড়ার প্রাণের ভিতরটা যে এমন করিয়া হামাগুড়ি দিতেছে তাহা ত আমরা জানিতাম না। একজন গান বাঁধিতে জানিত, সে বহুলোকের অনুরোধে এই উপলক্ষে একটা মজাদার গান বাঁধিয়া দিল।

যাঁহারা সমাজের বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের দুই একজন আসিয়া সীতানাথকে বলিলেন, "মুখুয্যে মশাই আপনি ত বিবাহ কর্‌তে যাচ্ছেন, তারা যদি আপনাকে মেয়ে না দেয়? আপনি কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হয়েছেন কি না, হঠাৎ মেয়ে দিতে সম্মত নাও হতে পারে।"

সীতানাথ বলিলেন—"ও পাজি যে বিবাহ কর্‌বে না তা আমি আগে থেকেই জান্‌তাম। ছেলে যদি বিবাহ না করে, তবে আমি বিবাহ কর্‌লেও অলঙ্কার দেবে বলেছে। পেল্লায় মেয়ে এত বড়,

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৌকা গুণ টানিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা বিপরীত দিকে মহাবেগে ছুটিয়া যায়। চন্দ্রবাটীর ঘাটে একখানা মাল বোঝাই প্রকাণ্ড ভড়ে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। গহনার বাক্স চাদর দিয়া সীতানাথের পিঠে বাঁধা ছিল। অচেতন অবস্থায় সীতানাথকে জল হইতে তুলিয়া ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে গৃহে লইয়া যায়। শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, কিন্তু গহনার বাক্স দিল না।

শ্রীনিবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনার কথা সে নিজমুখে স্বীকার করেছে ?"

"প্রথম স্বীকার করেনি। আমার যখন জ্ঞান হল তখন জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, আমার পিঠে যে একটা বাক্স বাঁধা ছিল, সেটা কোথায় ? বল্‌লে তা ত কই আমরা পাই নি। তখন আমি চীৎকার করে বল্‌লাম আমার সর্ব্বস্ব গেলরে, ব্রহ্মহত্যে কর্‌লে রে,—বলে আবার আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ফের যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি কোথা থেকে একটা ডাক্তার নিয়ে এসেছে,—ডাক্তারটি বল্‌লে তোমার কোনও ভাবনা নেই, তোমার বাক্স আছে। আমার সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে, নাড়ি দেখে ওষুধ দিলে, বলে গেল তোমার কোনও ভয় নেই, তিন দিনের মধ্যে তুমি সেরে উঠ্‌বে।"

শ্রীনিবাস উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তবে আদালতে নালিস করে ডাক্তারকে সাক্ষী মান্‌ব। কাণ ধরে ভূধর চাটুয্যের কাছ থেকে গহনা আদায় করে নেব না !"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সে দফাও রফা রে, সে দফাও রফা। ডাক্তারের কাছে কি যাই নি, ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলাম। ডাক্তার বল্‌লে গহনার কথা সে কিছুই জানে না। কেবল আমায় সান্ত্বনা কর্‌বার

জন্যে মিছে করে বলেছিল। আদালতে নালিস করলে আর কি হবে, ডাক্তার ঐ কথা বলে বস্‌বে।"

"তবে কি করে জান্‌লেন ভূধর চাটুয্যে নিয়েছে?"

"তার পরে ভূধর চাটুয্যে নিজেই বলেছে।"

"স্বীকার করলে নিয়েছে, অথচ দিলে না? বাঃ—বেশ লোক ত! তবে তার স্বীকার কর্‌বার উদ্দেশ্যটা কি? অস্বীকার করাই ত তার পক্ষে সুবিধে ছিল।"

"উদ্দেশ্য আছে রে উদ্দেশ্য আছে। বলে তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দাও। তা হলে ঐ গহনা গুলি সব পাবে। আমি গরীব, আমার মেয়ের বিয়ে হয় না। তোমার গহনা তোমার ঘরেই যাবে; পুরস্কারের স্বরূপ আমাকে কন্যা দায় থেকে উদ্ধার কর্‌বে।"

কথাটা শুনিয়া শ্রীনিবাস বলিলেন—"তবেই ত দেখ্‌ছি গোলযোগ।" বলিয়া অভ্যাসবশতঃ গুম্ফ প্রান্ত দন্তে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সীতানাথের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান্ অন্নদাচরণ। তিনি এল্, এ ফেল্ করা নব্যযুবক। মেজাজটা নিতান্তই সাহেবী ধরণের। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিস্কুট সহযোগে নিয়মিতরূপে চা পান করিয়া থাকেন। গ্রামের বালকদিগের মধ্যে বিদ্বান বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। চেহারাটি দিব্য,—রবীন্দ্রীয় কেশদাম তাঁহার কমনীয় মুখসৌন্দর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ করিয়া, "ভগ্নহৃদয়ের মহাশোকাশ্রু" নামধেয় একখানি চটি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। যতবার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বন্ধুসমাজে পত্নীবৎসল বলিয়া তাঁহার সম্মানের আর সীমা নাই। তাঁহাকে এ

অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয় নি, তাদের আর জাত থাকে না, যুবো বুড়োর বিচার কর্‌লে তাদের কি করে চল্‌বে ?”

পাড়ার লোকের গ্রামের লোকের যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। চারি ছেলে চারি বধূ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—“দেখ আমার বিবাহ কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে সোণার চাঁদ বউ ঘরে আনি।”

অন্নদা বেচারি কিয়ৎ পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই কথার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। শেষে অন্নদা চোখ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—“তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক্ কর্‌বে, তবে আমি বিবাগী হয়ে এক দিক্ পানে চলে যাব।” বড় বধূ রাগিয়া বলিলেন—“ঢের দেখেছি ঢের দেখেছি ঠাকুরপো, এই বয়সে কত দেখ্‌লাম, বাঁচি ত আরও কত দেখ্‌বো। এখন এ রকম কর্‌ছ, কিন্তু শেষ রক্ষে হলে হয়।”

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বাকী। সীতানাথ টাকা কড়ি লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই নিজে বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্রা করিলে পর বাড়ীতে নূতন করিয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একবারে খড়্গহস্ত। প্রায় দশ বৎসর কাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে;—ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার,—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই,—লোকেও সে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধূ ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ

নোলকপর' মূর্ত্তিমতী উপদ্রবরূপিণী একটা কচি মেয়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই যন্ত্রণাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদাকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন—"অন্থ ভাই লক্ষীটি, এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোণার সংসার ছারেখারে যায়।"

অন্নদা হঠাৎ বলিল—"দেখ বউদিদি, আমি একটা মৎলব স্থির করেছি। শুন্‌লাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজার খানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি সেই টাকা ভূধর চাটুয্যেকে দিয়ে বলি আপনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌লাম, মনোমত সুপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তারা দিতে পারে। তারা যে অধার্ম্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই ত গহনাগুলির কথা অস্বীকার কর্‌তে পার্‌ত।"

কথাটা সকলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামর্শ মন্দ নহে। চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

প্রাণের দায়;—পরিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ করিয়া, হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় অন্নদার নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে রওনা হইল।

অর্থাভাবে আজও বিবাহ হয় নি, তাদের আর জাত থাকে না, যুবো বুড়োর বিচার করলে তাদের কি করে চল্‌বে ?”

পাড়ার লোকের গ্রামের লোকের যতই আমোদ হউক, বাড়ীর লোকের মাথায় এ কথা শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। চারি ছেলে চারি বধূ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে নানা প্রকারে বুড়াকে বুঝাইতে লাগিল।

সীতানাথ বলিলেন—“দেখ আমার বিবাহ কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। তোমরা অন্নদাকে রাজি কর, আমি ছেলের বিবাহ দিয়ে সোণার চাঁদ বউ ঘরে আনি।”

অন্নদা বেচারি কিয়ৎ পরিমাণে রেহাই পাইয়াছিল, এই কথার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। শেষে অন্নদা চোখ মুখ লাল করিয়া রাগিয়া বলিল—“তোমরা যদি আমাকে এমন করে দিক্‌ কর্‌বে, তবে আমি বিবাগী হয়ে এক দিক্‌ পানে চলে যাব।” বড় বধূ রাগিয়া বলিলেন—“ঢের দেখেছি ঢের দেখেছি ঠাকুরপো, এই বয়সে কত দেখ্‌লাম, বাঁচি ত আরও কত দেখ্‌বো। এখন এ রকম কর্‌ছ, কিন্তু শেষ রক্ষে হলে হয়।”

২৪শে শ্রাবণ। বিবাহের আর পাঁচদিন মাত্র বাকী। সীতানাথ টাকা কড়ি লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বলিয়া গেলেন, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া সেইখান হইতেই নিজে বিবাহ করিতে যাইবেন।

বৃদ্ধ যাত্রা করিলে পর বাড়ীতে নূতন করিয়া মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। ছোটবড় সকলেই অন্নদার প্রতি একবারে খড়্গহস্ত। প্রায় দশ বৎসর কাল গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে;—ছেলে মেয়ে নাতি পুতি ভরা সংসার,—সীতানাথ আর দারপরিগ্রহ করেন নাই,—লোকেও সে পরামর্শ দেয় নাই। আজ দশবৎসরকাল বড়বধূ ঘরের গৃহিণী। হঠাৎ

নোলকপর' মূর্ত্তিমতী উপদ্রবরূপিণী একটা কচি মেয়ে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গৃহস্থালীর শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবে, এ কল্পনা মাত্র নিতান্তই যন্ত্রণাদায়ক হইল। বড়বধূ আবার কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদাকে মিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন—"অনু ভাই লক্ষ্মীটি, এখনও সময় আছে, এখনও বিবাহ কর, নইলে সোণার সংসার ছারেখারে যায়।"

অন্নদা হঠাৎ বলিল—"দেখ বউদিদি, আমি একটা মৎলব স্থির করেছি। শুন্‌লাম তারা বড় গরীব, তাই মেয়েটির বিয়ে হয় না। তোমরা কোন রকমে হাজার খানেক টাকা আমাকে সংগ্রহ করে দাও, আমি সেই টাকা ভূধর চাটুয্যেকে দিয়ে বলি আপনি ব্রাহ্মণ, কন্যাদায়গ্রস্ত, কিঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌লাম, মনোমত সুপাত্র এনে মেয়ের বিবাহ দিন। আমার গহনাগুলি ফিরিয়ে দিন। তা তারা দিতে পারে। তারা যে অধার্ম্মিক নয়, তাদের ব্যবহারে জানা যাচ্ছে। অনায়াসেই ত গহনাগুলির কথা অস্বীকার কর্‌তে পার্‌ত।"

কথাটা সকলে মিলিয়া তোলাপাড়া করিয়া বলিল, হাঁ এ পরামর্শ মন্দ নহে। চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি?

প্রাণের দায়;—পরিবারস্থ সকলের মধ্যে চাঁদা করিয়া, কিছু ঋণ করিয়া, হাজার টাকা জমা হইল। সকালে সীতানাথ রেলপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় অন্নদার নৌকা চন্দ্রবাটী অভিমুখে রওনা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একখানি পত্র

চন্দ্রবাটী,
২৭শে শ্রাবণ।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু

সংখ্যাতীত প্রণামান্তে নিবেদন,

আপনি কলিকাতায় রওনা হইবার পরদিবস আমি কার্য্যগতিকে চন্দ্রবাটী গ্রামে উপস্থিত হই। প্রথমেই মহাশয়ের জীবনদাতা বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূধরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত মহাশয় পরম সজ্জনব্যক্তি;—যারপরনাই আদর অভ্যর্থনায় আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহারই গৃহে অতিথি।

আমার পরিচয় পাইয়া গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন বিজ্ঞব্যক্তি আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন—"বাপু হে, শুনিতেছি নাকি তুমি এই ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?" আমি সবিনয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে আমি নহি, পরন্তু আমার পূজনীয় পিতৃদেব উক্তা বালিকা-টির পাণিপীড়ন করিতে অভিলাষী। কথাটা শুনিয়া বিজ্ঞলোকটি থতমত খাইয়া গেলেন। মনে করিলেন বুঝি আমি তাঁহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছি। অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া বিজ্ঞভদ্রলোকটি বলিলেন—"সর্ব্বনাশ, তোমার পিতাঠাকুর যেন এমন কার্য্য না করেন। ও মেয়েটির জাতিকুলের ঠিকানা নাই। ওটি

কুড়ানো মেয়ে। বারো তেরো বৎসর পূর্ব্বে যেবার মহাবারুণীযোগে ত্রিবেণীতে লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, সেই বৎসর সপরিবারে সেখানে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া চট্টোপাধ্যায় ঐ মেয়েকে কুড়াইয়া পায়। ও মেয়ের বয়স তখন বছর দুই আন্দাজ। নিঃসন্তান বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মেয়েটিকে কন্যার মত প্রতিপালন করিয়াছে। অনেকবার ও মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধও হইয়াছিল, কিন্তু পাছে কোনও সৎকুলীন ব্যক্তির জাতিনাশ হয়, এই আশঙ্কায় আমরা প্রতিবারেই বরপক্ষীয়গণকে সাবধান করিয়া দিয়াছি ;—তোমাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলাম।"

মহাবারুণীযোগের সময় ত্রিবেণীর ঘাটে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েটিকে একবার দেখিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলাম, আমার পিতাঠাকুর যখন আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন, তখন মেয়েটিকে একবার দেখা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে যথাসাধ্য বসন ভূষণে সাজাইয়া আমার সম্মুখীন করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। মুখখানি অবিকল আমাদের পরলোকগতা ছোটবধূর মত।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটির কোনও স্থায়ী রকমের ব্যাধি আছে কি না। তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই কিছু স্বীকার করেন না। অনেক জেরা করিয়া বাহির করিলাম যে, মাঝে মাঝে মেয়ের বুকে অম্লশূলের মত একটা বেদনা দেখা যায়, দুই দিন কখনও বা তিন দিন বুক যায় বুক যায় শব্দ,—তাহার পর ভাল হইয়া যায়। বৎসরে এরূপ দুই একবার হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই বিশ্বাসে পরিণত হইল। মেয়েটি আমার শ্যালিকা। হিসাব করিয়া দেখিলাম, দ্বাদশ বৎসর

পূর্ব্বেই আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী মেয়েটিকে ত্রিবেণীর ঘাটে হারাইয়া আসেন। তখন তাহার বয়স দুই বৎসর মাত্র। সপ্তাহ ধরিয়া ত্রিবেণীর চতুর্দ্দিকে অনেক নিস্ফল অনুসন্ধান হয়। মেয়েটির গায়ে অনেক সোণার গহনা ছিল, এই নিমিত্ত সকলে সিদ্ধান্ত করেন যে গহনার লোভে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। এ সমস্ত ইতিহাস আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। অম্লশূলের ব্যারামটা—উহাও একটা প্রধান কথা। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর উহা আছে, আমার স্ত্রীর ছিল, আমার শ্যালকগণও অল্পাধিক পরিমাণে ঐ পীড়াক্রান্ত।

যাহা হউক আমি এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াই শ্বশুর মহাশয়কে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করি। অদ্য প্রভাতে তিনি আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। মেয়েটি যে তাঁহারই, সে বিষয়ে শ্বশ্রূদেবীর আর সংশয়মাত্র নাই।

অতঃপর আপনি যদি কন্যাটিকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে কতকটা সম্পর্কবিরুদ্ধ হয়। এই কারণেও বটে, আর মহাশয়কে এই বয়সে একটা গলগ্রহ করিয়া দিয়া (বিশেষতঃ কন্যাটি বয়স্থা) কষ্টে ফেলা উপযুক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় না ভাবিয়া, আমিই অগত্যা তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। অতএব আপনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সত্বর আগমন করিবেন। বাড়ীতে দাদামহাশয়গণকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। নিবেদনমিতি।

শ্রীত
ন্নদাচরণ দেবশর্ম্মা।

পুনশ্চ

যদি সময় থাকে তবে আসিবার পূর্ব্বে একবার গ
পুস্তকের দোকানে উপস্থিত হইয়া মত্রচিত "ভ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
নামক কাব্যখানির সমস্ত অবিক্রীত খণ্ডগুলি সং হৃদয়ের মহাশোকাশ্রু"
চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানি পত্র লিখিয়া এই সং আনয়ন করিবেন।
দিলাম, আপনার

প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের কোনও কারণ থাকিবে না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমি যদি "আত্মজীবন চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করি, তবে তিনি সে পুস্তক নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। এই অলিখিত পুস্তকখানি অতীব মনোরম ও কৌতুকাবহ হইবার সম্ভাবনা। ইতি। শ্রীঅন্নদা।

পুঃ—২

ভূধর চট্টোপাধ্যায় যে আমার প্রথমা পত্নীর অলঙ্কারের কথা বলিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। পাছে মহাশয় সে গুলির অপ্রাপ্তিতে নিরাশা-দুঃখ অনুভব করেন, তাই এখন অবধি বলিয়া রাখিলাম। আমাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া তিনি এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মিথ্যাচরণের জন্য আমি তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মুখুয্যে মহাশয় সম্বিত পাইয়া যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাক্স কোথায়—আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম ও সত্য বলিয়াছিলাম কোন বাক্স পাই নাই। তাহার পর ডাক্তার আসে, এবং পরামর্শ দেয় ও কথা বলিও না, পীড়া বাড়িবে; বলিও বাক্স আছে; উহাঁকে ভাল হইতে দাও। আমিও মনে করিলাম এই সুযোগে মেয়েটিকে পার করিবার চেষ্টা করি। বাপু হে আমার মেয়ের কিনারা হইতেছিল না। তাই দুইটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। তা সে মিথ্যা কতক্ষণ টিকিত? বিবাহ হইলেই সমস্ত প্রকাশ হইত। তখন ত আর তোমরা মেয়ে ফিরিয়া দিতে পারিতে না।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যতই বিনয়ী ও অতিথিবৎসল হউন, নীতিজ্ঞান তাঁহার অতি শোচনীয়। এরূপ শিথিলনীতি মনুষ্য যে আমার শ্বশুর হইলেন না, ইহাতে আমি নিজেকে নিজে অভিনন্দন করিতেছি। ইতি

শ্রীঅঃ।

কাজির বিচার

জগদ্বিখ্যাত আরবোপন্যাসের নায়ক বোগ্দাদাধিপতি হারুণ আল রশীদ একদিন সিংহাসনে বসিয়া পাত্র মিত্র সভাসদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা ও পুত্রবধূ এই দুইয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কাহাকে অধিক ভালবাসে ?"

সভাসদ্গণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে সকলে অধিক ভালবাসে, সুতরাং পুত্রবধূকেও সমধিক ভালবাসিবার কথা। অন্যেরা প্রতিবাদ করিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে, সুতরাং কন্যাকেই সকলে অধিক ভালবাসিবে। কেহ বলিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে হইলেও ঘরে থাকে, কন্যা পরের ঘরে চলিয়া যায়, অতএব পুত্রবধূর প্রতিই স্নেহ গাঢ়তর হয়। অপরেরা ঠিক এই যুক্তিতেই উক্তমত খণ্ডন করিয়া বলিলেন, যে সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাহার প্রতি ততটা স্নেহোদ্রেক হয় না ; যে দূরে থাকে, সেই অধিক স্নেহের অধিকারিণী হয়। এইরূপে বাদানুবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না।

এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ সভাসদ্ এতাবৎকাল নীরবে বসিয়া ছিলেন। খালিফ্ তাঁহাকে বলিলেন—"মৌলবী সাহেব আপনি কেন স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন না ?" বৃদ্ধ, খালিফের এই প্রকার উক্তিতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া বিনয় নম্র বচনে কহিলেন—"হে ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদীয় ধর্ম্মের রক্ষক, স্ত্রীলোকেরা যে পুত্রবধূ অপেক্ষা কন্যাকে অধিক ভালবাসে, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি গল্প জানি, অনুমতি হইলে নিবেদন

করিতে পারি।” খালিফের অনুমতিক্রমে প্রবীণ মৌলবী এইরূপ গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে এক নগরে এক বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার এক পুত্র আর এক কন্যা ছিল। এই কন্যা ও পুত্রবধূটি একই সময়ে আসন্ন-প্রসবা হইলেন। পুত্রবধূর নাম ওয়াজিহন (সুন্দরী) এবং কন্যার নাম জহূরণ (প্রকাশমানা) ছিল। এক রাত্রে একই সময়ে ওয়াজিহন ও জহূরণ দুইজনেরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তখনও ধাত্রী আসিয়া পৌছে নাই। বিধবা দেখিল পুত্রবধূ ওয়াজিহনের পুত্র সন্তান এবং কন্যা জহূরণের কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। ইহা বিধবার সহ্য হইল না। সে ওয়াজিহনের পুত্রকে জহূরণের সূতিকাগৃহে স্থাপন করিয়া. দৌহিত্রীকে আনিয়া পুত্র-বধূর নিকট রাখিয়া দিল। বাড়ীতে আর জনপ্রাণীও ছিল না ;—প্রসূতিরা গতচেতন ছিলেন ; একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ এ বিনিময় ব্যাপারের সাক্ষী রহিল না।

দুই বৎসর অতীত হইল। ওয়াজিহন কন্যাকে এবং জহূরণ পুত্রকে লালন পালন করিতেছেন ;—কাহারও মনে অনুমাত্র সন্দেহেরও সঞ্চার হয় নাই।

একদিন সায়ংকালে ওয়াজিহন স্বীয় কক্ষে নামাজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার পালিত শিশুকন্যাটি কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। জহূরণের পুত্রটি নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা হইলে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শঙ্কার ভাব প্রত্যেক মাতৃহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাবৎ জীব জগতে মাতৃস্নেহের একটা প্রবাহ বহিয়া যায়।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সেই প্রার্থনা-পরায়ণা জননীর হৃদয়ে সেই মাতৃস্নেহ প্লাবিত সন্ধ্যাকালে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার

হইল। তাঁহার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। কে যেন তাঁহার কাণে বলিয়া দিল—"এ সন্তান তোমারই।"

সেই অবধি তিনি অতি নিপুণতা ও সাবধানতার সহিত সেই বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং সঞ্চালনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ বালকের সমস্তই আশ্চর্য্যরূপ মিলিতে লাগিল। একদিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট এ কথা বলিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইলেন—"বাঁদি, যদি বারদিগর (দ্বিতীয়বার) ও কথা মুখ হইতে বাহির করিবি, তবে তোর জিহ্বাটা জ্বলন্ত লৌহ দিয়া পোড়াইয়া দিব।" এইরূপ ব্যবহারের পর, ওয়াজিহনের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার গুণবতী শাশুড়ীই সেই সন্দিগ্ধ অপকার্য্যের কর্ত্রী! অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই নগরের কাজির নিকট বিচার প্রার্থিনী হইলেন।

কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কোন সাক্ষী সাবুদ আছে?"

ওয়াজিহন বলিলেন—"আমার সাক্ষী স্বর্গে ঈশ্বর এবং মর্ত্ত্যে আমার এই মাতৃহৃদয়।" কাজি মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া এই মোকর্দ্দমার কিনারা করিবেন? দুই চারি দিনের মধ্যে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ (নাম করিলে গোস্তাকি হইবে) তদানীন্তন বোগ্দাদাধিপতির কর্ণেও একথা পৌছিল। তিনিও অপর সকলের ন্যায় সমুৎসুক হইয়া কাজির বিচার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই তিন মাস অতীত হইয়া গেল তবুও মোকর্দ্দমার কিছুই হইল না। অবশেষে খালিফ্ হুকুম দিলেন, তিন মাসের মধ্যে যদি কাজি বিচার সমাধা করিতে না পারেন, তবে তিনি সপরিবারে নির্ব্বাসিত হইবেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাজি সাহেব তারপর নাই দুশ্চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে ভাবিলেন আমার নির্ব্বাসন ত হইবেই, অতএব সে অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এখন হইতেই ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করি। যদি ঈশ্বর দয়া করেন—যদি কোন উপায় স্থির করিতে পারি—তবেই ফিরিব, নতুবা মক্কায় গিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করিব। এইরূপে কাজি গৃহত্যাগ করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, পর্ব্বত পার হইয়া, নদী পার হইয়া, জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিলেন। অষ্টাদশ দিবসের পর সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সেই গৃহস্থের একখানি মাত্র ঘর, তাহাতেই সে সপরিবারে শয়ন করিত। অতিথিকে বলিল—"মহাশয় আপনি যদি ঐ গোশালায় রাত্রি যাপন করিতে প্রস্তুত হন, তবে অবস্থিতি করুন।" কাজি স্বীকৃত হইলেন।

পথশ্রমে তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। গৃহস্থ প্রদত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া অবিলম্বেই নিদ্রিত হইলেন। অনেক রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভাগ্য মনুষ্যের মত তিনিও সেই ঘোর অন্ধকারময়ী স্তব্ধ রজনীতে স্তব্ধভাবে আপনার অদৃষ্টান্ধকারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জন কতক অস্ত্রধারী দস্যু সেই গোশালায় প্রবেশ করিল। দুইটি গাভী এবং তাহাদের দুইটি বৎস বাঁধা ছিল—দস্যুরা একটি গাভী এবং একটি বৎসকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত গাভী ও বৎস অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। গাভীটি "হা বৎস" এবং বৎসটি "হা মাতা" বলিয়া রোদন করিতেছিল। কাজি বিদ্যাবলে পশুপক্ষীদিগের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তিনি এই ক্রন্দন ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে না

পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন, গাভীটি বলিতেছে—"বাছা তোর মা গিয়াছে; আমার বৎস গিয়াছে; আয় তুই আমার সন্তান হইয়া থাক, আমি তোর মা হইয়া সান্ত্বনা লাভ করি।" বৎসটি বলিল—"মা, তুমি আমায় খাওয়াইবে কি? তোমার বৎস স্ত্রী জাতীয় ছিল; আমি পুরুষ; তোমার অল্প পরিমিত স্তনদুগ্ধে কেমন করিয়া আমার ক্ষুধা নিবারণ হইবে?"

এই কথা শুনিতেই কাজি সাহেবের মস্তিষ্কে একটি সত্যের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। ভাবিলেন ঠিক কথা। ঈশ্বর স্ত্রী জাতিকে দুর্ব্বল এবং পুরুষ জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়াছেন। উভয়ের দেহ পুষ্টির জন্য সমান আহার কখনও প্রয়োজন হইতে পারে না। যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় তাহাও এই অপূর্ব্ব কৌশলে সৃষ্ট বিশ্বজগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পুং-বৎস মাতা গাভী এবং স্ত্রী-বৎস মাতা গাভীর স্তন্য পরিমাণ সমান নহে।

এতদিনে সে মোকর্দ্দমার কিনারা হইল। কাজি প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় ঈশ্বর ও মহম্মদকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রফুল্ল মনে দেশে ফিরিলেন। বোগদাদে রাজসন্নিধানে সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিনে দেশময় এ কথা প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল। খালিফ্ কাজিকে আজ্ঞা করিলেন— "তুমি বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী প্রভৃতি সমস্ত লইয়া এই রাজধানীতে আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে কাজি রাজসভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত গণ্য মান্য লোক—আমির, ওমরাহগণ উপস্থিত হইয়াছেন, বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল।

কাজি পূর্ব্ব হইতে প্রায় একশত চতুষ্পদ পশু রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে গুলি সভাপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। খালিফ্

কহিলেন--"এ সব কি হইবে ?" কাজি কহিলেন, "এ সকল সাক্ষী-শ্রেণী ভুক্ত।"

সকলে একান্ত কৌতূহলের সহিত বিচার প্রাণালী দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে বাদিনী তাঁহার মোকর্দ্দমার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। প্রতিবাদিনী দোষ অস্বীকার করিল। তখন বৃদ্ধা ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। সে বলিল—"সন্তান দুইটি ভূমিষ্ঠ হইবার বোধ হয় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রতিবেশীনীরা সাক্ষ্য দিল—"আমরা সন্তান জন্মের রাত্রি প্রভাত হইলে দুইজনেরই সূতিকাগারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ওয়াজিহনের কোলে কন্যা এবং জহুরণের কোলে পুত্র সন্তানই দেখিয়াছিলাম।"

ইহার পর কাজি বলিলেন—"এখন বাক্‌শক্তি সম্পন্ন সাক্ষীদিগের পরীক্ষা শেষ হইল; এইবার সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত সাক্ষীগুলির পরীক্ষা লওয়া যাইতেছে;—মাননীয় সভাসদবর্গ এবং সর্ব্বসাধারণ মনোযোগ করুন।"

পূর্ব্ব কথিত পশুপাল হইতে একটি পুং বৎসযুক্ত এবং স্ত্রী বৎসযুক্ত গাভী আনা হইল, বৎস দুইটি সমবয়স্ক। দুইটি সমভার রৌপ্য পাত্রে গাভী দুইটির দুগ্ধ দোহন করণান্তর তুলাদণ্ডে পরিমিত করা হইল। সর্ব্বসাধারণ প্রত্যক্ষ করিল, পুং বৎসযুক্ত গাভীটির দুগ্ধ অধিক হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হরিণ প্রভৃতি বহু বহু পশু মাতার পরীক্ষা লওয়া হইল এবং প্রত্যেক বারেই ফল পূর্ব্বানুরূপ হইল।

পরীক্ষা শেষ হইলে কাজি বলিতে লাগিলেন—"হে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সভাসদ্‌গণ, আপনারা জানেন, ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিকে বলবত্তর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারণে সর্ব্ব-

জীবের আদিম খাদ্য ভাণ্ডারে তিনি পুরুষের জন্য অধিক এবং স্ত্রীজাতির জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প খাদ্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহাও আপনারা প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে (ওয়াজিহন ও জহূরণকে দেখাইয়া) এই স্ত্রীলোক দুইটির স্তনদুগ্ধ এইরূপে তুলনা করিয়া দেখা যাউক, যাহার দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হইবে, তাহাকেই পুত্র সন্তানের মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে। কেমন, এ প্রকার নিষ্পত্তিতে আপনাদের সকলের সম্মতি আছে ত?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"আছে।"

বলা বাহুল্য ওয়াজিহনের দুগ্ধই গুরুতর হইল। ওয়াজিহন সভা সমক্ষে আপনার পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। জহূরণ্‌কে তাঁহার কন্যা প্রত্যর্পিত হইল।

খালিফ্ এই বিচার পদ্ধতি দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মণিহার মোচন করিয়া কাজি সাহেবের গলে পরাইয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে রাজধানীর প্রধান কাজির (চীফ্ জষ্টিস্) সম্মান সূচক পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

দণ্ড স্বরূপ সেই শাশুড়ীকে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত এক জন-হীন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইল।

প্রপিতামহ রোহিতের স্কন্ধে, পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্কটকুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাড়া নাড়িতেছে। এইরূপ জলবাসে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া এক দিন আমাকে স্বীয় কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্দমের আচ্ছাদন রাখিয়া গেলেন; বোধ হয় আশা ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটি প্রৌঢ়া দাসী তীরে বসিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপ ধৌত করণান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে. তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, সুতরাং গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে ক্রমে আমি বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট স্বরূপ কেমন করিয়া তোমার হাতে আসিয়া পড়িলাম, সে কথায় আর কায নাই; বিশেষতঃ; উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক দুই বৎসরের শিশু কর্ত্তৃক তাহার মাতার অজ্ঞাতে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু হায় হায়! তাহার পর যে বিপদ ঘটিয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই বলিতে হয়। তুমি যখন গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন মুখনল গড়াইবার জন্য স্বর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভগ্নাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তখনি আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! তাঁহার পর সেইসদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার দিতে দিতে যখন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলাস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তখন উঃ—

আমি বলিলাম —"ভাই! আর কায নাই ; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন? আমার দোষ কি ?

মুখনল বলিল,—"তোমার আর দোষ কি ? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিও।"

কাটা মুণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বোগ্‌দাদের বাদসাহ হারুণ-অল-রশিদ একজন ভুবন-বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে, তাঁহার বংশে আলি মোহম্মদ নামক একজন বাদসাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, দেশে মোহম্মদীয় ধর্ম্ম আর পূর্ব্বের ন্যায় নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইতেছে না। দেশের অনেক লোক প্রতিমা-পূজক হইয়া উঠিতেছে, নানাবিধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া বাদশাহ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্থির করিলেন, তিনিও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ প্রাতঃস্মরণীয় হারুণ-অল-রশিদের ন্যায় তেব্‌দিল অর্থাৎ ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করিবেন এবং ধর্ম্মচ্যুত, ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। রাজ্যের কোথায় কোন্ ব্যক্তি খাইতে পাইতেছে না, সমস্ত নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহারও প্রতিবিধান করিবেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি নানা-প্রকার ছদ্মবেশে প্রতি রজনীতে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কোনও দিন ফকীরের বেশ, কোনও দিন খাজা অর্থাৎ সওদাগরের বেশ, কোনও দিন আমির ওমরাহের বেশ—ফল কথা তাঁহার ছদ্মবেশ এতই গোপনীয় ছিল যে, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। কেবল তাঁহার দুই চারিজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও অনুচর সে বিষয় অবগত ছিল।

ইতি মধ্যে রাজ্যে প্রবল অসন্তোষ উপস্থিত হইল, এমন কি বিদ্রোহ হয় হয়। তখন বাদসাহ মনে করিলেন, এখন আমার এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক যে, আমার নিজ বিশ্বস্ত মন্ত্রীগণও কিছুই জানিতে না পারে। তাহাদের নিজের মনের অবস্থা কিরূপ, তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক।

ছদ্মবেশের পোষাক প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন দরজিকে নিযুক্ত করিতেন। এবার কোনও মন্ত্রীকে কিছু না বলিয়া মনসুরি নামক তাঁহার অতি বিশ্বস্ত গোলামকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন, "সহরে গিয়া কোনও একজন দরজিকে লইয়া আইস। গভীর রাত্রি হইলে তাহাকে আনিবে। এরূপ সাবধানে আনিবে যে, সে দরজিও যেন না জানিতে পারে যে, সে কোথায় আসিতেছে।"

গোলাম নত হইয়া বলিল—"বেশ আস্তান। প্রভুর আদেশ এইক্ষণেই পালন করিব।"

এই বলিয়া মনসুরি বিদায় লইল। সন্ধ্যা হইলে বেজেস্তান অর্থাৎ সহরের যে বাজারে বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়, তথায় যাইয়া একজন সামান্য দরজির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র দুর্গন্ধময় গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি সামান্য দোকানে গিয়া দেখিল, এক বৃদ্ধ দরজি বসিয়া একটা পুরাতন কোট মেরামত করিতেছে। দরজির দোকানে মৃত্তিকার প্রদীপে আলো জ্বলিতেছে, তাহার চক্ষুতে চশমা লাগানো। দেখিয়া মনসুরি ভাবিল—"এই ঠিক লোক পাইয়াছি।"

দোকানে উঠিয়া মনসুরি বলিল—"খলিফা সাহেব! সেলাম আলেকুম।"

দরজি তখন নিজকার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "আলেকুম সেলাম, কি চান আপনি?"

মনসুর কহিল—"আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম আবদুল্লা, কিন্তু লোকে আমাকে বাবাদল বলিয়া ডাকে।"

"আপনি কি দরজি ?"

"হাঁ, আমি দরজির কার্য্যও করি এবং মাছুয়া বাজারে যে ক্ষুদ্র মসজিদ্ আছে, সেখানে মুয়েজ্জিনের কার্য্যও করিয়া থাকি। আপনার কি হুকুম?"

"বাবাদল সাহেব, একটা পোষাক প্রস্তত করিতে পারিবে ?"

"কেন পারিব না ? অবশ্য পারিব।"

"অনেক পয়সা পাইবে।"

"উত্তম কথা।"

মনসুরি তখন বলিল—"কিন্তু একটা কায তোমাকে করিতে হইবে। যেখানে তোমাকে পোষাকের মাপ লইতে হইবে, সে অতি গোপনীয় স্থান। আমি রাত্রিতে তোমার চখে রুমাল বাঁধিয়া সেখানে লইয়া যাইব। রাজি আছ ?"

দরজি তখন বলিল—"তাইত! এ যে বড় বিষম কথা। আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভয় হয়। আচ্ছা, তবে যদি আমাকে ভালরূপে বখ্‌সিস দাও, আমি সম্মত আছি। বেশী পয়সা পাইলে আমি স্বয়ং ইব্লিশ অর্থাৎ সয়তানের জন্যও পোষাক প্রস্তত করিয়া দিতে পারি।"

মনসুরি বলিল—"তবে এই লও" বলিয়া দরজির হস্তে দুইটি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিল।

একবারে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা গরীব দরজি জীবনেও কোন দিন পায় নাই, মুদ্রা পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল—"কখন যাইতে হইবে ?"

মনস্থরি কহিল—"রাত্রি বারোটার সময় এই দোকানে থাকিও, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া মনস্থার প্রস্থান করিল।

বাবাদল তখন নিজের স্ত্রীকে এই সুসংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া, দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গেল।

তাহার স্ত্রীর নাম দিলফেরেব। সেও দরজির মতই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর নিকট এই সুসংবাদ শুনিয়া এবং স্বর্ণমুদ্রা দুইটি পাইয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। সেই রাত্রিতে তাহারা গরম গরম কাবাব কিনিয়া আহার করিল। কিছু আঙ্গুর ও মিষ্টান্নও আনিয়া ভোজন করিল। ভোজনান্তে উত্তম দুই পেয়ালা কাফি প্রস্তুত করিয়া দুইজনে পান করিতে করিতে মনের সুখে গল্প করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন বারোটা বাজিল, বাবাদল তখন নিজ দোকানে গিয়া দর্শন দিল। মনস্থরিও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিনা বাক্যব্যয়ে মনস্থরি তখন বাবাদলের চক্ষুতে রুমাল বাঁধিল। তাহার পর, নানা পথ দিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, একটি পশ্চাতের দ্বার দিয়া তাহাকে রাজবাটীতে প্রবেশ করাইল। সুলতানের একটি গোপনীয় কামরায় লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া দিল।

বাবাদল চক্ষু খুলিলে দেখিল, একটি সুন্দর সুসজ্জিত কামরা, কিন্তু

সেখানে একটি মাত্র ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। মনসুরি বলিল—"এখানে থাক, আমি এখনই আসিতেছি"—বলিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে শালের রুমালে জড়ান একটি পদার্থ লইয়া মনসুরি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এই দেখ, একটি ফকিরের পোষাক। এখন দেখিয়া বল, কয় দিনে এরূপ একটী পোষাক তৈয়ারি করিতে পারিবে?" বলিয়া মনসুরি প্রস্থান করিল।

দরজি তখন সেই পোষাকটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা শেষে, সেটিকে আবার শালের রুমাল খানিতে জড়াইয়া রাখিয়া দিল। মনসুরির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে একজন উন্নতকায় উত্তম পোষাকপরা লোক আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গরীব দরজির প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া, শালের রুমালে বাঁধা সেই বাণ্ডিলটি উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বেচারা দরজি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। নীরবে বসিয়া কেবল চিন্তা করিতে লাগিল।

সেই সময় আবার দরজা খুলিল, অন্য একজন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহারও হস্তে শালের রুমালে জড়ানো একটি বাণ্ডিল। প্রবেশ করিয়া সে ব্যক্তি অত্যন্ত নত হইয়া দরজিকে বারম্বার সেলাম করিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সেই বাণ্ডিলটি দরজির পদতলে রাখিয়া, মৃত্তিকা চুম্বন-পূর্ব্বক সে ব্যক্তিও প্রস্থান করিল।

ইহা দেখিয়া দরজি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ সব কি? আমাকে এত সেলাম করেই বা কেন; কোথায় আসিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা; কি বিপদই না জানি হইবে।"

ইতিমধ্যে মনস্থরি আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, "তবে বাণ্ডিল উঠাও—বল কয়দিনে এরূপ পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিবে ?"

বারদল বলিল, "তিন দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া দিব"। বাণ্ডিল উঠাইয়া লইল। মনস্থরি দরজির চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, এবং নানাপথ ঘুরাইয়া, তাহার দোকানে পৌছাইয়া দিল। চক্ষু হইতে রুমাল খুলিয়া বলিল—"তিন দিন পরে আবার আসিব। যদি পোষাকটি প্রস্তুত পাই, তবে আর দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া পোষাক লইয়া যাইব"—বলিয়া মনস্থরি প্রস্থান করিল।

বাবদল তখন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিল। দিলফেরেব স্বামীর জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বাবদলকে দেখিয়া বলিল, "কি হইল ?"

বাবদল বলিল, "নমুনা লইয়া আসিয়াছি, কিছুই না, কেবল একটা সামান্য ফকীরের পোষাক তৈয়ারি করিতে হইবে। তৈয়ারি হইলে আরও দুই মোহর দিবে বলিয়াছে।"

দিলফেরেব বলিল, "কিরূপ নমুনা দেখি ?"

দরজি বলিল, "এখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, শয়ন করা যাউক। কল্য প্রভাতে দেখাইব।"

দিলফেরেব বলিল, "না, এখনই দেখাও। আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। না দেখিলে রাত্রে আমার নিদ্রা হইবে না।" এ কথা বলিয়া দিলফেরেব নিজেই বাণ্ডিলটি খুলিতে লাগিল। খুলিবামাত্র তাহা হইতে ফকীরের পোষাক বাহির হইল না, বাহির হইল একটা কাটা মুণ্ড! টাট্‌কা কাটা একটা মানুষের মুণ্ড রুমাল হইতে পড়িয়া ঘরের মেঝেতে গড়াইতে লাগিল। বৃদ্ধ দরজি ও তাহার স্ত্রী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মুণ্ড দেখিয়াই বুড়া বুড়ি ভয়ে হস্ত দ্বারা নিজ নিজ

চক্ষু আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর চক্ষু খুলিয়া পরস্পরের প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে বুড়ির বড় রাগ হইল। দাঁত মুখ খিচাইয়া স্বামীকে বলিল, "হতভাগা বুড়া! খুব কায আনিয়াছিস্। এইবার বড় লোক হইবি! রাত পোহাইলে পুলিশ আসিয়া হাতে দড়ি দিয়া লইয়া যাইবে। ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে। তখন খুব বড়লোক হইবি!"

বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আল্লা সেল্লা! বাবা সেল্লা! তাহার মা জাহান্নমে যাউক, তাহার বাপ জাহান্নমে যাউক, যে আমার উপর এই মহা বিপদ নিক্ষেপ করিয়াছে। যখনই শুনিলাম, চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তখনই ভাবিয়াছিলাম যে, তাহাদের মৎলব ভাল নয়। আল্লা! আল্লা! এখন কি করি? সে পাজির বাড়ীও চিনিতে পারিব না যে গিয়া কাটা মুণ্ড ফিরাইয়া দিব। দিলফেরেব! এখন কি করা যায়?"

বৃদ্ধা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল,—"যেমন করিয়াই হউক, এ কাটা মুণ্ডটাকে এখনি কোথাও সরাইতে হইবে। নহিলে প্রভাত হইলেই সর্ব্বনাশ।"

দরজি বলিল, "প্রভাত হইতে আর দেরী কি? রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোথায় এটাকে ফেলা যায়?"

বৃদ্ধা আবার কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "এক কায কর। আমাদের বাড়ীর পাশে যে হাসান রুটিওয়ালা রহিয়াছে, সে ভোরে উঠিয়া রুটি প্রস্তুত করিবে বলিয়া রোজ রাত্রিতে তুন্দুরায় ময়দা ভরিয়া চুল্লীর মুখের কাছে রাখিয়া দেয়। একটা তুন্দুরাতে এই মুণ্ডটা ভরিয়া তাহার চুল্লীর কাছে রাখিয়া আইস; সে ভোরে উঠিয়া আগুন জ্বালিয়া অন্য তুন্দুরাসহ

এটাকেও ভিতরে ভরিয়া দিবে, তাহা হইলেই মুণ্ডটা অনেক জলিয়া যাইবে, আর কেহ চিনিতে পারিবে না।"

বাবাদল বলিল, "বাহবা দিলফেরেব! সুন্দর উপায় বলিয়াছ। তবে এখনই তাহাই কর।"

বুড়ি তখনই গিয়া হাসান রুটিওয়ালার চুল্লীর মুখের কাছে তুন্দুরায় ভরিয়া মুণ্ডটা রাখিয়া আসিল। সে ফিরিয়া আসিলে, দরজি উত্তমরূপে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন দুইজনে শয্যায় শয়ন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "যাহা হউক, এই দামী শালের রুমালখানা ত আমাদের লাভ হইয়া গেল!"

রাত্রি শেষ হইলে হাসান রুটিওয়ালা উঠিয়া নিজ পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "মামুদ!—ওরে মামুদ! ওঠ। আগুন জাল্।"

তখন পিতাপুত্রে বাহির হইয়া আসিল। কাঠ, খড়, শুক্‌না পাতা প্রভৃতি নানা দাহ্য দ্রব্য চুল্লীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া অগ্নি দিল।

একটা কুক্কুর রুটির টুক্‌রা টাক্‌রা খাইবার জন্য দোকানের নীচে রাস্তায় সর্ব্বদাই বসিয়া থাকিত। সেই কুক্কুরটা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার করে আর মধ্যে মধ্যে নাক তুলিয়া যেন কি শুঁকিতে থাকে।

হাসান বলিল, "মামুদ! দেখ ত, কুকুরটা অমন করে কেন?" মামুদ একটা কাঠ লইয়া কুকুরকে তাড়াইতে গেল, কিন্তু কুকুরটা এক লম্ফে দোকানে উঠিয়া একটা তুন্দুরায় টান দিল। হাসান ও মামুদ মহাক্রোধে কুকুরকে মারিতে যাইতেছিল, এমন সময় কুকুরের টানা-টানিতে তুন্দুরার মুখ খুলিয়া গিয়া কাটামুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া হাসান বলিল, "আল্লা আল্লা! এ কোন্ শয়তানের কার্য্য? কি সর্ব্বনাশ! কে খুন করিয়া এ মাথা এখানে রাখিয়া গেল?

কি সৌভাগ্য যে কুকুরটা বুঝিতে পারিয়াছিল, নহিলে আমাদের চুলী অপবিত্র হইয়া যাইত। আল্লা খুব বাঁচাইয়াছেন। এখন এ মুণ্ডটা কি করা যায়? এটাকে এখানে দেখিলে লোকে ত আমাদিগকেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবে! শেষ কি ফাঁসি যাইব নাকি?”

মামুদ বলিল, “বাবা! এটাত সরাইতে হইতেছে। এখন প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই, কি করা যায়?”

হাসান বলিল. “আমাদের দোকানের পাশে যে কিওর আলি নাপিতের দোকান আছে, সেখানেই এটাকে রাখিয়া আয়। কিওর আলি এখনি দোকান খুলিবে, তাহার এক চক্ষু অন্ধ, সে তোকে দেখিতে পাইবে না, এই বেলা যা।”

ইতিমধ্যে কিওর আলি আসিয়া আপনার দোকান খুলিল। তখনও ভাল আলো হয় নাই। মামুদ আস্তে আস্তে গিয়া দেখিল, কিওর আলি পার্শ্বের ঘরে গিয়া জল গরম করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মামুদ তখন একটা বাঁশ মুণ্ডের গলার ভিতর ঢুকাইয়া, সেটাকে একখানা কুশীর উপর খাড়া করিয়া দিল। খানকতক তোয়ালিয়া কুশীর আসে পাশে জড়াইয়া দিল। এইরূপ রাখিয়া মামুদ আস্তে আস্তে পলায়ন করিল।

জল গরম করিয়া কিওর আলি দোকানে প্রবেশ করিল। একে অন্ধকার, তাহাতে এক চক্ষু নাই, কিওর আলি ভাবিল, কোনও খরিদ্দার মাথা কামাইবার জন্য আসিয়া বসিয়াছে। তাই সে বলিল, “সেলাম আলেকুম ভাই! আজ যে এত সকালে আসিয়াছ?” এই বলিয়া আপন মনে একটা টিনের পাত্রে একটু গরম জল ঢালিল, সাবান লইল, ক্ষুরখানি চোখাইয়া, খরিদ্দারের নিকট আসিয়া. সাবান জল মাখাইবার জন্য মাথাটায় হাত দিল। মাথা তৎক্ষণাৎ কুশী হইতে মেঝেতে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া নাপিত ভয়ে এক লম্ফে দোকান হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। নামিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল, তখনও রাস্তায় কোন লোক চলাচল করিতেছে না। তখন আবার আস্তে আস্তে দোকানে উঠিয়া, মুণ্ডটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। আপন মনে বলিল, "এ যে দেখিতেছ শুধুই মাথা. দেহটা তবে কোথায় গেল?" পরে মুণ্ডটাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আঁ্যা! তুই কোথা হইতে আসিলি? আমাকে ফাঁসাইবার চেষ্টা? আচ্ছা আচ্ছা, আমার একটা মাত্র চক্ষু বলিয়া মনে করিস্ না যে, আমি বড় নিরীহ ব্যক্তি। তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেছি। আমার দোকানের পাশে ইয়ানাকি নামক গ্রীসদেশীয় একজন কাবাবচি আছে, সে তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী জু কাফেরগণের জন্য কাবাব তৈয়ারী করে। কাবাবের জন্য সে যে সকল মাংস কাটিয়া রাখিয়াছে, তোকে তাহারই মধ্যে ফেলিয়া আসি, কাবাবচি আসিয়া অন্য মাংসের সঙ্গে তোকেও কাটিয়া কুটিয়া কাবাব বানাইয়া ফেলিবে। মরুক কাফের বেটারা মনুষ্য-মাংসের কাবাব খাইয়া।"

ইয়ানাকির কাবাবের দোকান ছিল, সরবত প্রভৃতি নানাবিধ পানীয় দ্রব্যও সে বিক্রয় করিত। আর গোপনে বিক্রয় করিত মদ্য। কিওর আলি মাঝে মাঝে গোপনে ইয়ানাকির দোকানে গিয়া মদ্য পান করিয়া আসিত। কাটা মুণ্ডটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া, পশ্চাতে লইয়া কিওর আলি ইয়ানকির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইয়ানাকি বলিল, "আদাব আরজ মিঞা! আজ এত ভোরেই তৃষ্ণা পাইয়াছে নাকি?"

কিওর আলি বলিল, "আদাব আরজ! হাঁ এখন বেশী নয়, এই এক ছটাক আন্দাজ দোয়াস্তা, একটু বেশী সরবত মিশাইয়া আনিয়া দাওত, গলাটা বড় শুকাইয়াছে।"

ইয়ানাকি তখন হাসিতে হাসিতে পাশের ঘরে মদ্য মিশ্রিত সরবত প্রস্তুত করিতে প্রবেশ করিল। কিওর আলি এই সুযোগে মাংসের ঝুড়ির ভিতর কাটা মুণ্ডটা লুকাইয়া রাখিল। পরে ইয়ানাকি আসিলে, সরবত পান করিয়া বলিল, "গরমাগরম খানিকটা কাবাব তৈয়ারি করিয়া আমার দোকানে পাঠাইয়া দাও ত, বড় ক্ষুধা হইয়াছে।" এই বলিয়া কাবাবচিকে পয়সা দিয়া কিওর আলি প্রস্থান করিল। মনে ভাবিয়াছিল, কাবাব পাঠাইয়া দিলে, তাহা ফেলিয়া দিলেই চলিবে। ঐ ঝুড়ির মাংস হইতেই কাবাব প্রস্তুত করিবে ত? কিছু পয়সা নষ্ট হইল, কিন্তু একটা মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইলাম।

এদিকে কিওর আলি চলিয়া গেলে, ইয়ানাকি তাহার কাবাবের জন্য এক টুক্‌রা মাংস ঝুড়ি হইতে খুঁজিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "তাজা মাংস দিতেছি না। মুসলমানের পক্ষে বাসি মাংসই যথেষ্ট।" এই বলিয়া এক টুকরা বাসি মাংস অন্বেষণ করিতে করিতে, কাটা মুণ্ড বাহির হইয়া পড়িল।

ইয়ানাকি তখন আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া বলিল,—"সর্ব্বনাশ! এ কি? এটা কোথা হইতে আসিল? কাহার মুণ্ড? দেখিতেছি মুসলমানের মুণ্ড। বেশ হইয়াছে। এইরূপ সব মুসলমানের মুণ্ড আমি কাটিতে পারি, তবে বড় সুখ হয়। মুসলমানেরা আমাদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে। ইচ্ছা করে সব মুসলমানের মুণ্ড কাটিয়া কাবাব বানাই।"

কিন্তু পরক্ষণেই ইয়ানাকির মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে মনে বলিল, "এ ত খুন হইয়াছে দেখিতেছি। কে আমার শত্রু আছে, খুনটা আমার ঘাড়েই চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু এখন এ মুণ্ডটা লইয়া কি করি? কোথায় ফেলি?"

আল্লা—এ ত কাফেরের মস্তক নয়, এ যে আমাদের সেনাপতি আগা সাহেবের মুণ্ড। কে তাঁহাকে খুন করিল? খুন করিয়া আবার বিধর্ম্মী জু-র পদতলে মুণ্ডটি রাখিয়া গিয়াছে? এত অপমান!" বলিয়া মহা-ক্রোধে সিপাহী ছুটিয়া গিয়া নিজের দলের সমস্ত সিপাহীকে সংবাদ দিল।

এই আগা সাহেব কিছুদিন হইতে বাদশাহের কোপ-নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ সন্দেহ করিতেন, সেনাপতি ভিতরে ভিতরে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই সৈন্যগণ কেহ কেহ বলিল, "নিশ্চয়ই বাদশাহের হুকুমে আমাদের আগা সাহেবকে হত্যা করা হইয়াছে।" কেহ বা বলিল—"তাহা হইলে বাদশাহ মুণ্ডটা গোপনে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন, ওরূপ করিয়া বিধর্ম্মী জু-র পদতলে ফেলিয়া অপমান করিবেন কেন? ইহা নিশ্চয়ই জু-গণের কায। মার তাহাদের।"

বলিতে বলিতে সিপাহীগণ ছুটিয়া ঘটনাস্থলে আসিল। আগা সাহেবের মস্তক দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত শোক করিতে লাগিল এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জু জাতিকে যেখানে দেখিতে পাইল সেই খানেই প্রহার করিতে লাগিল। সহরে ভয়ানক শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হইল। জু-গণ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু বাস্তবিক জু-গণ আগা সাহেবকে হত্যা করে নাই। যে রাত্রে বাবাদল স্থলতানের নিকট নীত হইয়াছিল, সে রাত্রেই স্থলতান একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে হুকুম দিয়াছিলেন—"যাও আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া আমায় আনিয়া দাও।"

যে সময় বাবাদল স্থলতানের গোপন কামরায় বসিয়া ছিল, সেই সময়েই আগা সাহেবের মাথা কাটিয়া সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যের ফিরিবার কথা।

ইয়ানাকি চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল, “ঠিক হইয়াছে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত সেই জু-টার মৃতদেহ পথের ধারে পড়িয়া আছে, সেইখানেই এটা রাখিয়া আসি।”

তৎকালে মুসলমান রাজ্যে যদি রাজদণ্ডে কোনও ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদ হইত, তবে তাহার দেহ তিন দিন অবধি রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইত। উদ্দেশ্য, ইহা দেখিয়া সকলে ভয় পাইবে, কেহ আর সেরূপ গুরুতর অপরাধ করিতে সাহসী হইবে না।

তখন মাত্র প্রভাত হইয়াছে। রাজপথে লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই। ইয়ানাকি সেই কাটা মুণ্ডটা কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া কিছু দূরে পতিত সেই জু-র মৃতদেহের নিকটে গেল। সে ব্যক্তির শিরশ্ছেদ হইয়াছিল। সেই দেহের পা ছুইটার মধ্যস্থানে কাটা মুণ্ড রাখিয়া পলাইয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমে রৌদ্র উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইল। যে পথে জু-র মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সেই পথে লোক গিয়া দেখিল, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, একটা মানুষের ছুইটা মাথা, একটা উপরে একটা পায়ের নিকট।

এই সংবাদ সহরে প্রচার হওয়া মাত্র দলে দলে লোক দেখিতে ছুটিল। ক্রমে তাহাদের সঙ্গে একজন সিপাহীও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে পায়ের নিকট মুণ্ডটা দেখিয়া বলিল, “আল্লা, আল্লা, ইয়া

এ দিকে, পাছে মনস্থরি জানিতে পারে যে, বাদসাহ কি ছদ্মবেশে এবার নগর ভ্রমণ করিবেন তাই বাদসাহ মনস্থরির চক্ষেও ধূলা দিবার জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া ছলেন। মনস্থরি বাবাদলকে ফকিরের বেশ আনিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মনস্থরি জানিবে, বাদসাহ ফকীরের বেশে রাত্রি ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই বাদসাহ স্বয়ং আসিয়া বাবাদলের নিকট হইতে সে শাল মোড়া বাণ্ডিল উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই শালে একটা সওদাগরের বেশ জড়াইয়া বাবাদলকে দিবেন, তাহা হইলে মনস্থরিও জানিতে পারিবে না। বাদসাহ বাণ্ডিলটা লইয়া গেলে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আগা সাহেবের মাথা আনিতে গিয়াছিল। একে সে কামরায় আলোক অতি ক্ষীণ ছিল, তাহাতে বাদসাহের গোপন কামরায় অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাই সে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভাবিয়াছিল, ইনিই বাদশাহ, বোধ হয় বাহিরে যাইবেন বলিয়া দরজির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাই সেই বাণ্ডিলটি বাবাদলের পায়ের কাছে রাখিয়া, নত হইয়া সেলাম ও ভূমি চুম্বন করিয়াছিল।

এ দিকে সেই রাত্রে মনস্থরি বাবাদলকে লইয়া চলিয়া গেলে পর, বাদশাহ সেই কামরায় সওদাগরের পরিচ্ছদ সহ প্রবেশ করিলেন। দরজি ও মনস্থরিকে না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

তখন একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহাকে আগা সাহেবের মুণ্ড কাটিয়া আনিতে হুকুম দিয়াছিলাম, সে ফিরিয়াছে ?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হাঁ প্রভু, সে ফিরিয়াছে।"

বাদশাহ বলিলেন, "তাহাকে ডাকিয়া আন।"

সে ব্যক্তি আসিলে বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার্য্য শেষ হইয়াছে ?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ দুনিয়ার মালেক, কার্য্য শেষ করিয়া ত মুণ্ডটা হুজুরের পদপ্রান্তে রাখিয়া গিয়াছি।"

বাদশাহ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কখন?"

ভৃত্য বলিল. "এই অল্পক্ষণ হইল, প্রভু দরজির ছদ্মবেশ পরিয়া গোপন কামরায় বসিয়াছিলেন, তখন দিয়া গেলাম।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে বাদশাহ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন একটা মহা ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভৃত্যগণের সম্মুখে কোনও রূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে মনসুরি ফিরিয়া আসিল। তখন বাদাশাহ তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শেষে আজ্ঞা দিলেন, "যাও এখনি যেখানে পাও দরজিকে ধরিয়া কাটামুণ্ড ফিরাইয়া আন, নহিলে মহা অনর্থপাত হইবে।"

আজ্ঞা পাইয়া মনসুরি ছুটিল, কিন্তু সে দরজির দোকানই দেখিয়াছিল, তাহার বাড়ী কোথায় জানিত না। রাত্রিতে বেজেস্তানের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। এই রূপে ক্রমে রজনী প্রভাত হইল।

তখন মনসুরি শুনিল, কিছু দূরে ভাঙ্গা গলায় এক ব্যক্তি এক মসজিদ হইতে সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী মুসলমানগণকে প্রাতঃকালীন নামাজ করিতে আহ্বান করিতেছে। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মনসুরি সেই দিকে গেল। দেখিল বাবাদল দুই কাণের পশ্চাতে হাত দিয়া ফুকারিতেছে— "লা ইলাহা ইল্লাল্লা মোহম্মদর্ রসুলাল্লা।"

মনসুরি তখন তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই বাবাদলের চীৎকার বন্ধ হইয়া গেল। মনসুরিকে লক্ষ্য

করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"ওহে তুমি কিরূপ লোক? এক জন গরীবের উপর এমন করিয়াই কি অত্যাচার করিতে হয়? খুব পোষাকের নমুনা দিয়াছিলে। কেন, সে কাটা মুণ্ডটা সওগাদ করিবার জন্য কি আর কোনও লোক পাও নাই! পোষাক তৈয়ারি এই ভাবেই হয় বটে। তোমার সে প্রভুটি কে বল ত? সে একজন মুসলমানকে হত্যা করিলই বা কি জন্য? তোমার প্রভু নিশ্চয়ই একজন বজ্জাৎ কাফের, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মনসুরি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল,—"বৃদ্ধ! সাবধান, তুই কাহাকে গালি দিতেছিস্ জানিস্?"

বৃদ্ধ একটু ভয় পাইয়া বলিল,—"কেন, কে সে?"

মনসুরি বলিল,—"তিনি শাহানশাহ বাদশাহ বোগদাদের অধিপতি।"

ইহা শুনিয়া বাবাদল কাঁপিতে লাগিল। বলিল,—"মাফ্ করুন, মাফ্ করুন। না জানিয়া আমি দুনিয়ার মালেক বাদশাহকে গালি দিয়াছি, মাফ্ করুন।" বলিতে বলিতে নিজের দুই কর্ণ মর্দ্দন করিতে করিতে বাবাদল জানু পাতিয়া ভূমিতে বসিল।

মনসুরি জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কাটামুণ্ড কোথায়?"

বৃদ্ধ বলিল,—"আমার বাড়ীতে নাই।"

"কোথায় তবে?"

"সেটা এতক্ষণ আগুনের মধ্যে পাক হইতেছে।"

মনসুরি বলিল,—"পাক হইতেছে? খাইবি না কি? কি হইয়াছে, শীঘ্র বল।"

বৃদ্ধ তখন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। মনসুরি শুনিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া হাসান রুটিওয়ালার দোকানে যাইল।

অনেক পীড়াপীড়ি করাতে হাসান স্বীকার করিল, সে তাহা নাপিতের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছে।

মনস্থরি, হাসান ও বাবাদল তিনজনে তখন নাপিতের দোকানে গেল। নাপিত প্রথমে ভয়ে কিছুই স্বীকার করিল না। অবশেষে সে সকল কথা বলিল।

চারিজনে তখন কাবাবচি ইয়ানাকির দোকানে উপস্থিত হইল। যে সময় সিপাহীরা সকল বিধর্ম্মীগণকে প্রহার করিতেছিল, সেই সময়েই ইয়ানাকি প্রাণভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। স্থতরাং ইয়া-নাকির দেখা পাওয়া গেল না।

এই সময় মনস্থরি রাস্তার কিছু দূরে গোল শুনিয়া সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল আগা সাহেবের কাটা মুণ্ড সেই খানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

তখন মনস্থরি আর কাল বিলম্ব না করিয়া বাদশাহের নিকট গিয়া সকল কথা বলিল।

বাদশাহ দেখিলেন, সৈন্যগণ ক্ষেপিয়া রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তখন তিনি হুকুম দিলেন, আগা সাহেবের মুণ্ড আনিয়া মহা সমারোহে তাহার কবর দাও। আগা সাহেবের সিপাহীগণকে পাঁচ পাঁচ মোহর বখসিস্ কর।

মহা সমারোহে আগা সাহেবের মুণ্ড সমাধিস্থ হইল। সিপাহীদের মনোমত এক ব্যক্তিকে বাদশাহ আগার পদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃ-পর রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। বাদশাহের হুকুম অনুসারে মনস্থরি গিয়া বাবাদল দরজিকে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আসিল। বুড়া দরজির আর কোনও কষ্ট রহিল না। *

---

* ইংরাজি হইতে গৃহীত।

পত্নীহারা

চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে একটি স্থন্দর ত্রিতল অট্টালিকা। তাহার একটি স্থসজ্জিত কক্ষে সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী শ্রীমতী স্থনীতিবালা বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখখানি অতি স্থন্দর। চোখে এখনও বালিকাস্থলভ চপলতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। স্নান সমাপ্ত হইয়াছে; চুল এখনও ভাল শুকায় নাই, তাই সেই গুলি খোলা অবস্থায় পিঠের কাপড়ের উপর পড়িয়া আছে। জানালা দিয়া গঙ্গার বায়ু আসিয়া সে গুলি শুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, নয়টা বাজিয়া গেল। কাব্য আর সেই স্থন্দরী পাঠিকার মন তেমন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে পদশব্দের আভাষমাত্র কাণে আসিলেই তিনি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। গঙ্গার ঘাটে বিস্তর স্নানার্থীর সমাগম হইয়াছে, স্থনীতি মাঝে মাঝে গবাক্ষপথে তাহাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই মানসিক চঞ্চলতা শীঘ্রই বিদূরিত হইল। একখানি দৈনিক সংবাদপত্র হাতে করিয়া সহাস্যমুখে স্থনীতির স্বামী প্রবেশ করিলেন।

স্থনীতির স্বামীটি সম্পূর্ণভাবে স্থনীতির উপযুক্ত। বিধাতা যোগ্যকে যোগ্যের সহিতই যোজনা করিয়াছেন;—ইহার অপেক্ষা স্থবোধচন্দ্রের আর বেশী বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কবিতাপুস্তকখানি পার্শ্বস্থ টেবিলের উপর ফেলিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অত হাসি কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিলেন—"সহ্য হয় না নাকি?"

"না।"

"কেন?"

"তুমি বাইরে থেকে হাস্‌তে হাস্‌তে এসেছ। তা ত হবে না। আমার কাছে এসে আমাকে দেখে তবে তুমি হাস্‌বে।"

"তুমি কি শুধু ঘরে আছ? তুমি কি বাইরে নেই?"

সুনীতি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, পরাজয় স্বীকার কর্‌লাম। 'রাজন্! তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।' এখন ব্যাপারখানা কি, বল দেখি শুনি।"

"দেখ্‌বে আবার শুন্‌বে?"

"চালাকি রাখ। কাগজে তোমার বয়ের সুখ্যাতি বেরিয়েছে না কি?"

"আমার বউয়ের?"

"কি জ্বালা! তোমার কেতাবের গো মশাই কেতাবের। তোমার ফুলহারের সুখ্যাতি করে কাগজে কেউ সমালোচনা করেছে বুঝি?"

"যদি বলি তাই!"

"তবে আমি রাগ কর্‌ব।"

"অপরাধ?"

"তোমার বউ যখন তোমার বয়ের সুখ্যাতি করেছে, তখন আর কারু প্রশংসা তোমাকে স্পর্শ কর্‌বে কেন?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল—"তবে তা নয়।"

"তবে কি?"

"আন্দাজ কর।"

সুনীতি তাহার সেই হাসিমাখা চক্ষু দুইটি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দুই তিন বার ঢোক গিলিয়া শেষকালে বলিল—"বুঝেছি।"

"কি বল দেখি?"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিল—"বল্‌ব কেন?"

সুবোধ বলিল—"না তোমায় বল্‌তেই হবে।"

সুনীতি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"ইস্‌! হুকুম নাকি?"

"নয়ত কি?"

"বটে! জাননা 'আমি রাণী, তুমি মোর প্রজা'।"

"তবে তোমার সখীদের ডাক। আমায় ফুলপাশে বেঁধে ফেলুক্‌। দুটো গান শুনে নিই।"—বলিয়া সুবোধ সুর করিয়া আরম্ভ করিল—"যদি আসে তবে কেন যে-এ-এ-তে চায়।"

সুনীতি রাগ করিয়া বলিল—"রঙ্গ রাখ। কি হয়েছে বল।"

"তুমি কি আন্দাজ করেছ সেইটে আগে বল।"

"সে আমি বল্‌ব না। তুমি বল চাই নাই বল।"

সুবোধ বলিলেন—"না, সে আমি শুন্‌ব না। তোমায় বল্‌তেই হবে।"

সুনীতি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"নাঃ—যদি না মেলে, তবে তুমি ভারি হাস্‌বে।"

"হাস্‌লামই বা?"

"আমি যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে যাব।"

"হলেই বা?"

"আমার চক্ষু যে ছল্‌ছল্‌ কর্‌বে।"

"তোমার চোখে একটি ওষুধ দিয়ে সে ছল্‌ছল্‌ ভাব ভাল করে দেব।"

এই বলিয়া সুবোধ স্নেহভরে প্রিয়তমার চক্ষু দুটিতে দুটি চুম্বন মুদ্রিত করিল।

সুনীতি বলিল—"একি, রোগ না হতেই ওষুধ!"

সুবোধ হাসিয়া উত্তর করিল—"Prevention is better than cure"—সুনীতি অল্প ইংরাজি জানিত।

সুনীতি বলিল—"ধন্যবাদ, ডাক্তার মশাই।"

"শুধু ধন্যবাদে ডাক্তার সন্তুষ্ট হয় না, ভিজিট্‌ চাই"—বলিয়া ডাক্তার মহাশয় রোগিণীর ওষ্ঠাধর হইতে ভিজিট্‌ আদায় করিয়া লইলেন।

তখন সুবোধ সুনীতির স্কন্ধে হস্তযুগল অর্পণ করিয়া বলিল—"আন্দাজটা তুমি কি করেছ, বল সত্যি। আমার ভারী কৌতূহল হচ্চে।"

সুনীতি বলিল—"বিলক্ষণ, নিজের কথা যা বল্‌বার আছে তা বল্‌বেন না, আমায় খালি খালি জেরা কর্‌বেন। ভারী মজার লোক ত! তুমি বল আর না বল, আমি সে কথা বল্‌ছিনে।"

সুবোধের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে সুনীতি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। শেষে সুবোধ বলিল—"আচ্ছা, আমিই আগে বলি; কিন্তু তুমি বল্‌বে বল?"

"বল্‌ব।"

"আমার শুনে শুনে যদি বল যে আমিও তাই মনে করেছিলাম?"

"আচ্ছা, আমি কাগজে লিখে রাখি। বলা হলে তুমি খুলে দেখো।"

সুনীতি হাসিতে হাসিতে একখানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিল। লিখিয়া বলিল—"বল এইবার।"

সুবোধ বলিল—"আজ সন্ধেবেলা বহুকাল পরে আবার ষ্টারে চন্দ্রশেখর। অনেকদিন থেকে তোমার চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখ্‌বার সাধ, আজ দুজনে যাই চল।"

শুনিয়া সুনীতি ভারি খুসী। লিখিত কাগজ খানি হাতে লইয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা, এতে কি লিখেছি এইবার তুমি আন্দাজ কর।"

"বাঃ সে কথা ত ছিল না।"

"নাই বা ছিল, তবু বল না।"

"আমি যদি আন্দাজ করি, তবে কি আন্দাজ কর্‌লাম সেটা ফের্‌ তোমায় আন্দাজ করে বল্‌তে হবে কিন্তু।"

"বেশ; আমিও তোমায় আবার সেটা আন্দাজ করাব। তা হলে আন্দাজ কর্‌তে কর্‌তে চিরটা জীবন কেটে যাক্‌ আর কি!—আচ্ছা, তুমি আমায় যে রকম খুসী করেছ, তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই দেখ।"

সুবোধ কাগজ খুলিল। তাহাতে লেখা আছে—"হিজি বিজি কি লিখি ছাই আমি ত কিছুই আন্দাজ করিতে পারিতেছি না। তোমার মনে কৌতূহল সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

পড়িয়া সুবোধ হাসিয়া উঠিল। বলিল—"তুমি ভারি দুষ্টু।"

"কি সাজা দেবে?"

"সাজা দেব? সাজা দিয়েছি! আসল কথা এখনও বলিনি! তোমাকে মেম সাজাব।"

"সে আবার কি কথা!"

সুবোধ বলিল—"না, সত্যি। অনেক দিন থেকে আমার সাধ, মেমের পোষাকে তোমাকে কেমন দেখায় দেখ্‌ব। তোমার জন্যে

একটা পোষাক আনিয়ে রেখেছি। থিয়েটরে যাব, দুজনে আলাদা আলাদা বসে দেখ্‌লে কি সুখ হয়? বক্স রিজার্ভ করে দুজনে একত্র বস্‌তে হবে। পোড়া বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে ত সে হবার যো নেই—দুজনে সাহেব মেম সেজে যাই চল।"

সুনীতি বলিল—"আ সর্ব্বনাশ! সে আমি পার্‌ব না। হাজার লোকের সমুখে কি আমি বেরুতে পারি?"

"ছদ্মবেশে আর লজ্জা কি? যে তোমাকে দেখ্‌বে সে ত আর তোমাকে তুমি বলে চিন্‌তে পার্‌বে না! তোমাকে সকলে খাঁটি বিলিতি মেম মনে কর্‌বে, আমাকে বরং ট্যাস্ ফিরিঙ্গির মত দেখাবে। সাহেবরা হিংসেতে ফেটে মর্‌বে আর ভাব্‌বে বিধাতা

বানর গলে দিল মোতিম হার।"

সুনীতি বলিল—"যাও যাও—ভারি ঠাট্টা শিখেছ। তোমার আর পাগলামি কর্‌তে হবে না। সে সব হবে টবে না।"

অনেক মিনতি, অনেক সাধাসাধি, অনেক মান অভিমানের পর সুনীতি বলিল, "আচ্ছা ঘরে পরে দেখি কেমন দেখায়, তার পরে বল্‌ব।"

আহারাদির পর সুবোধ দুইটা তোরঙ্গ শয়নকক্ষে আনাইয়া লইল। সে দুইটার ভিতর সুনীতি ও সুবোধের দুই সুট সাহেবী পরিচ্ছদ।

সুনীতি বলিল—"তুমি আগে সাহেব সাজ।" সুবোধ বলিল—"আমার সাহেবী বেশ তুমি কখনও দেখনি নাকি?" সুনীতি বলিল—"না, তবু সাজ। দেখে আমার ভরসা হোক্।"

সুবোধ সাহেব সাজিল। এইবার সুনীতির পালা। সুনীতি অনেক মেম দেখিয়াছিল বটে, এবং মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছুদিন লেখাপড়াও শিখিয়াছিল, কিন্তু কোথায় কি পরিতে হয়, তাহা অত লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক তথাপি পাশের ঘরে গিয়া আন্দাজি এক রক

করিয়া পরিয়া আসিল। যাহা কিছু ভুল চুক ছিল, সুবোধও আন্দাজে সংশোধন করিয়া দিল।

সুনীতির সজ্জা সম্পূর্ণ হইলে, সুবোধ সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল—"গুড্ মর্ণিং মেমসাহেব।"

সুনীতি হাসিয়া আকুল। সেও বলিল—"গুড্ মর্ণিং সাহেব।"

তাহার পর দুই জনে দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সোণার হলকরা ফ্রেমে আঁটা প্রশস্ত মুকুর ভিত্তিগাত্রে লম্বিত ছিল। তাহাতে সুনীতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া সুবোধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুনীতিও হি হি করিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। মানুষকে যেমন ভূতে পায়, আজ সকালে তেমনি এই দুইটা প্রাণীকে যেন হাসিতে পাইয়াছে। সুনীতি হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"এ বেশে আমি বাইরে যেতে পার্ব না তুমি যাই বল। ঝি চাকরেরাই বা কি মনে কর্বে!"

সুবোধ বলিল—"এক কায করা যাবে। বাড়ী থেকে শাড়ী পরে বেরুবে। ট্রেণে পোষাক বদ্লে নিলেই হবে। একটা কামরা রিজার্ভ করে নেব এখন।"

সুনীতি বলিল —"সে পরামর্শ মন্দ নয়। কিন্তু আমার ভারি লজ্জা কর্‌চে। কায নেই আমার থিয়েটারে গিয়ে, যেমন আছি তেমনি থাকি।"

সুবোধ স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল—"আমার এত দিনের সাধ তুমি পূর্ণ কর্বে না?

* * * * * *

* * * * * *

দুই ঘণ্টা পরে হুগলি ষ্টেশনে আসিয়া সুনীতি ও সুবোধ রিজার্ভ করা সেকেণ্ড ক্লাস কক্ষে আরোহণ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সুবোধ গৃহ হইতেই সাহেবী পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। গাড়ী ছাড়িবা মাত্র সুনীতিকে সে স্বহস্তে বিবি সাজাইয়া দিল। কেবল জুতার লেস্ সুনীতি নিজে বাঁধিল, সুবোধকে কিছুতেই বাঁধিয়া দিতে দিল না। সুনীতির শাড়ী ও বাহুল্য অলঙ্কারাদি তোরঙ্গে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সেখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ী। প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিয়া থামিয়া চলিতেছে। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সুনীতি স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহিরে দৃশ্য অবলোকন করে, ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলেই পলাইয়া ও-কোণে গিয়া বসে, সুবোধ কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। গাড়ীর ছাদে যেখানে লণ্ঠনের গহ্বর সেখানে চারিপাশে চারিখানা আর্শির টুকরা আঁটা আছে, সেই আর্শিতে সুনীতি নিজের প্রতিবিম্ব দেখে আর সুবোধের পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে। এক একবার বলে—"খুব সঙ সাজালে যা হোক্—মাগো—মাগো! এতও তোমার আসে!"

যখন হাওড়ায় আসিয়া গাড়ী থামিল, তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে থিয়েটর আরম্ভ হইবে।

সুবোধ সুনীতির হাত ধরিয়া চলিল, একটা কুলী তোরঙ্গটা মাথায় লইয়া অগ্রসর হইল। সুবোধ সুনীতির পানে চাহে আর হাসে। সুনীতির কপালে ঘর্ম্ম; মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলে বেলায় যা জুতা পায়ে দিয়াছিল, জুতা পায়ে দিয়া চলিতে পারিবে কেন? দুই পা তিন পা চলিয়াই হোঁচট্ খাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

সুবোধ গাড়ী ভাড়া করিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতে হইবে?" সুবোধ বলিল "ষ্টার থিয়েটার, হাতিবাগান।"

সুনীতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, সুবোধ বাহিরে দাঁড়াইয়াই তাহাকে বলিল—"তোরঙ্গটা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে, থিয়েটারের বাইরে গাড়ীতে পড়ে থাক্‌বে, যদি কেউ উঠিয়ে নিয়ে যায়, কিম্বা গাড়ো-

য়ানটাও নিয়ে চম্পট দিতে পারে, ভিতরে ঢের জিনিষ রয়েছে, ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রেখে আসি।"

স্থনীতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। স্থবোধ কুলীটাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

স্থবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া গাড়োয়ান হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহা জানে হোগা হুজুর?" স্থবোধ মুখ ফিরাইয়া বলিল—"হাতিবাগান - ষ্টার থিয়েটার।"

স্থবোধ গিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধান করিল, ষ্টেশন মাষ্টার নাই। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতেই ষ্টেশন মাষ্টার আসিল। সে বলিল—"প্যাসেঞ্জারগণের জিনিষ পত্র আমি রাখি না, হেড্ পার্শেল্ ক্লার্কের কাছে যান, চারি আনা ফি লাগিবে, রসিদ পাইবেন।"

স্থতরাং স্থবোধ হেড্ পার্শেল্ ক্লার্কের সন্ধানে চলিল। অনেক কষ্টে তবে তাহাকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইল। তিনি একটি বাঙ্গালী বাবু—চক্ষু দেখিলে মনে হয় বিলক্ষণ অহিফেন সেবন করা অভ্যাস আছে।

অত্যন্ত ধীরভাবে সে ব্যক্তি স্থবোধের প্রস্তাব শ্রবণ করিল। শেষে বলিল—"চারি আনা লাগিবে।" এই বলিয়া রসিদের বহি বাহির করিল। পেন্সিলটা খুঁজিতে কিয়ৎক্ষণ গেল। পেন্সিল যদি মিলিল, তবে কার্ব্বণ কাগজ আর পাওয়া যায় না।

এ দেরাজ সে দেরাজ, এ আলমারি সে আলমারি বহু অনুসন্ধানেও যখন কালা কাগজ পাওয়া গেল না, তখন স্থবোধ বলিল—"মহাশয়! আমার সময় নাই, না হয় হাতেই লিখিয়া দেন না।"

স্থবোধের অঙ্গে ইংরাজ-বেশ ছিল, স্থতরাং অনুরোধটা উপেক্ষিত হইল না।

রসিদ লইয়া কুলীকে বিদায় দিয়া, সুবোধ তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, যেখানে সুনীতির গাড়ী ছিল, সেখানে নাই।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীখানা বিঘূর্ণিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সুবোধ তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া ভাবিল, এইখানে কোথাও গাড়ী নিশ্চয়ই সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টেশনের অঙ্গনে তখনও বহুসংখ্যক গাড়ী দণ্ডায়মান। সুবোধ প্রত্যেক গাড়ীর কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সেই গাড়ীর নম্বরটা কেন দেখিয়া রাখে নাই, কেন এমন মূর্খতা করিল, এই ভাবিয়া নিজ বুদ্ধিকে অত্যন্ত ধিক্কার দিতে লাগিল।

কিন্তু অনুশোচনার সময় নাই। ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে। একে একে গাড়িগুলিও বাহির হইয়া যাইতেছে। সহসা একটা কথা সুবোধের মনে হইল। যখন গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাইতে হইবে, তখন সে বলিয়াছিল ষ্টার থিয়েটার। গাড়োয়ান সুনীতিকে লইয়া যদি ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া থাকে?

এই কথাটা মনে হইবামাত্র সুবোধ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টার থিয়েটারে ছুটিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়াছে। সে যখন কুলি সঙ্গে করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট বাক্স রাখিতে গেল, তখন ত গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যায় নাই। মেমসাহেবেরা একাকীও ভ্রমণ করিয়া থাকেন, গাড়োয়ান কোনও সংশয় না করিয়া আপন মনে হাঁকাইয়া গিয়াছে আর কি। সুনীতি কি আর মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে পারিয়াছে! এই ঘটনায় সে ভয়ে বিস্ময়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া কাঁপিতেছে—হয়ত কাঁদিতেছে,—নয়ত মূর্চ্ছা গিয়াছে।

"মেম সাহেব ভিতর মে তামাসা দেখ রহিহেঁ।" শুনিয়া সুবোধ ভারি নিরাশ হইল। ভাবিল তবে এ ত সুনীতি নহে। সুনীতি হইলে সে কখনও গাড়ী ত্যাগ করিয়া টিকিট কিনিয়া থিয়েটরের ভিতর প্রবেশ করিত না। তাহা একান্তই অসম্ভব। তথাপি ভাবিল—একবার দেখা যাউক।

ভিড় ঠেলিয়া ফাটক পার হইয়া সুবোধে থিয়েটারের অঙ্গনের ভিতর প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি টিকিট বিক্রয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইংরাজিবেশধারিণী কোনও বঙ্গমহিলা টিকিট ক্রয় করিয়াছেন কি?"

সে ব্যক্তির নাম ভবচরণ; বলিল—"মহাশয়, কত লোক টিকিট লইয়াছে, এই ভীড়ে কি কাহারও মুখের পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছি! তবে মনে হইতেছে যেন একজন লইয়াছেন।"

সুবোধ লোকটার হাতে এক খানা নোট দিয়া বলিল, "মহাশয় একবার বাহিরে আসুন।"

ভবচরণ সসম্ভ্রমে বাহির হইয়া আসিল। ঔৎসুক্যের সহিত বলিল—"কি মহাশয়?" সুবোধ বলিল—"আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। আপনাদের কোনও লোক দিয়া একবার সেই মহিলাটিকে সংবাদ দিতে হবে। যদি আমার কার্য্য সফল হয়, তবে আর একখানি নোট দিব।"

ভবচরণ হাসিয়া বলিল—"তা মহাশয় নিশ্চয়ই করিব। একজন ভদ্রলোকের যদি উপকার করিতে পারি, তবে তা না করিব কেন? আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনি আসিতেছি।"

– বলিয়া ভবচরণ একটু অভূতপূর্ব্ব রকম আচরণ করিল। একটা গোলযোগের ব্যাপার সন্দেহ করিয়া, থিয়েটারের কোন ঝিকে ডাকিয়া-

ষ্টার থিয়েটরের সম্মুখে গাড়ী পৌছিল। মহা সমারোহে চন্দ্রশেখরের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। জনতা অত্যন্ত অধিক। বহুলোক স্থানাভাবে টিকিট পাইতেছে না, ফিরিয়া যাইতেছে।

সুবোধ লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। দণ্ডায়মান সমস্ত গাড়ীগুলি একে একে অন্বেষণ করিল। কোনও খানিতে সুনীতি নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ হইবার উপক্রম হইল।

ফিরিবার সময় প্রত্যেক গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুম্ কোই মেমসাহেবকো লায়া ?" সকলেই বলিল—"না।" একজন বলিল—"হাঁ হুজুর লায়া।"

সুবোধের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। মনে হইল এইবার যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়াছি। ঘোড়া দুইটা দেখিল, গাড়োয়ানের পানে চাহিল, ঠিক যেন সেই ঘোড়া ও সেই গাড়োয়ান বলিয়াই মনে হইল।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সমস্ত ঘটিয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে সুবোধ গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—"কাঁহাসে লায়া ? হাওড়া ষ্টেশন সে ?"

"হাঁ হুজুর, হাওড়া ষ্টেশন সে লায়া।"

"হাম্‌কো দেখা থা ?"

কোচবাক্সে বসিয়া, মুখ ঝুঁকাইয়া সেই অল্পালোকে গাড়োয়ান সুবোধের মুখ নিরীক্ষণ করিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"হাঁ হুজুর, আপ্‌কো মাফিক্ একঠো সাহেবকো তো দেখা থা।"

সুবোধ তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল—"মেম সাহেব কীধর গিয়া ?"

তাহার দ্বারা উপরে সুবোধের বার্ত্তা না পাঠাইয়া, ইহা নির্ব্বিবাদে হাসিল করা কোন ঝির কর্ম্ম নয় মনে করিয়া, সে পশ্চাৎ দিক দিয়া থিয়েটরের সাজঘরে উপস্থিত হইল। দেখিল তাহার পরিচিতা রোহিণী নাম্নী নটী দলনী বেগমের পরিচ্ছদ পরিয়া চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছে।

তাহাকে গিয়া চুপি চুপি বলিল—"একটা কায করবে ?"

"কি ?"

ভবচরণ সংক্ষেপে ব্যাপার খানা রোহিণীকে বুঝাইয়া দিল। রোহিণী বলিল—"কি দেবে ?"

"একটা কোর্ ক্রাউন হুইস্কি।"

"আরে রামঃ—গলা জ্বলে। গ্রীন্ শীল্।"

"আচ্ছা তাই, এস তবে।"

বেগমের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ না করিয়া বাহিরে যাওয়া চলে না ; অথচ ছাড়িলে, আবার পরিতে অনেক কষ্ট ও সময় নষ্ট হইবে. সুতরাং রোহিণী একখানা বিলাতী শালে আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া, চটি জুতা পায়ে দিয়া ভবচরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভবচরণ সুবোধ বাবুকে দেখাইয়া বলিল—"এঁরি কথা বল্‌ছিলাম।"

সুবোধ কার্ডকেস হইতে নিজের একখানি কার্ড বাহির করিয়া রোহিণীর হাতে দিল। বলিল—"যদি কোনও ইংরাজি বেশধারিণী বঙ্গ-মহিলাকে ভিতরে দেখেন, তবে এই কার্ড দেখিয়ে অনুগ্রহ করে তাঁকে ডেকে আন্‌বেন।"

রোহিণী সুবোধের পানে চাহিয়া একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিল। কার্ড-খানি লইয়া, হেলিয়া হুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিল।

সুবোধ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে রোহিণী কার্ডখানি হাতে করিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল—"ভিতরে ইংরাজিবেশধারিণী আপনার কোনও মহিলা নেই। একজন আছেন তিনি আপনার আত্মীয়তা অস্বীকার করলেন।"

সুবোধ কোন কথা না বলিয়া ম্লানমুখে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী তাহার সঙ্গীকে বলিল—"আজ ভাল বিপদে ফেলেছিলে ভাই। একটা গ্রীণশীলের লোভে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! খুঁজে খুঁজে ইংরাজিবেশধারিণী মহিলার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লাম—'আপনার স্বামী বাইরে অপেক্ষা কর্ছেন আপনি শীঘ্র আসুন।' বলে কার্ড দেখালাম। মাগী কার্ডখানা ছুঁড়ে আমার গায়ে ফেলে দিলে। চটে লাল। আমাকে মারে আর কি!"

"তুমি কোন্ সাহসে বল্লে—'তোমার স্বামী বাইরে অপেক্ষা কর্ছেন'? স্বামী কি অন্য কেউ কি করে জান্‌লে?"

"নিশ্চয় স্বামী। দেখ্‌ছ না, লোকটা মণিহারা ফণি হয়ে বেড়াচ্চে। স্বাধীনতাওয়ালা আলোকপ্রাপ্ত লোক। স্ত্রীটি হারিয়ে বসে আছেন। অমৃত বোনকে বল্‌ব এখন, ভারি একটা মজার নতুন প্রহসন হবে।"

সুবোধ অঙ্গনের বাহিরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল। এমন বিপদে সে ইহজন্মে আর কখনও পড়ে নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল এ সকল কি সত্য. না স্বপ্ন দেখিতেছি। যদি ইহা স্বপ্ন হইয়া যায়. যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি যে এ সব কিছু নহে, সুনীতি আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা হইলে কি সুখ, কি আনন্দ হয়! সুবোধের দুইটি চক্ষু জলপূর্ণ হইল। মনে মনে বলিল—সুনীতি, কোথায় তুমি, কি অবস্থায় রহিয়াছ, কোন দস্যুহস্তে, কি মহাবিপদে তুমি পতিত হইয়াছ, আমি ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। হাওড়া

ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্ম্মে স্থনীতির সেই লজ্জারক্তিম মুখখানি কেবলই স্থবোধের মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হায় হায় আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিলাম!

কিন্তু এমন ভাবে কালক্ষেপ করিয়া কি ফল হইবে। স্থবোধ মনে করিল, আর একবার হাওড়ায় গিয়া অনুসন্ধান করি. যদি সে গাড়ীখানা এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়া থাকে। যে গাড়ী স্থবোধ হাওড়া হইতে ভাড়া করিয়া আসিয়াছিল, তাহা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। স্থবোধ তাহাতে আরোহণ করিয়া হাওড়ায় যাইতে কহিল।

ষ্টেশনে পৌছিয়া স্থবোধ দেখিল, অঙ্গন বহু শকটে পরিপূর্ণ। পঞ্জাব ডাকগাড়ী ছাড়িবার সময় উপস্থিত। হতবুদ্ধির মত সকল গাড়ীগুলির কাছে এক একবার দাঁড়াইল, কেমন করিয়া সে গাড়ী চিনিয়া বাহির করিবে!

ডাকগাড়ী ছাড়িয়া গেল। স্থবোধ একটা মৎলব স্থির করিয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে গিয়া বলিল—"মহাশয় আপনার সমস্ত কুলিকে যদি দয়া করিয়া একত্র করেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হই। বৈকালের ট্রেণে যে ব্যক্তি আমার তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, তাহাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

ষ্টেশন মাষ্টার গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন--"মহাশয়, জি, আর, পুলিসকে আবেদন করুন।"

চলিল স্থবোধ রেলওয়ে পুলিসের দারোগার সন্ধানে। দারোগা সাহেব মুসলমান, চারপাই পাতিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার সমীপে স্থবোধ উপস্থিত হইয়া আপনার "আবেদন" জানাইল।

প্রথমে ত দারোগা সাহেব কথা কাণেই তোলেন না। অবস্থা বুঝিয়া; প্রাণের দায়ে, স্থবোধ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ দক্ষিণান্ত করিল।

তখন দারোগা সাহেব সতেজে উঠিয়া বসিলেন। রাইটার কনেষ্টবলকে হুকুম দিলেন—"বোলাও সব শালা কুলী লোগ্‌কো।"

পুলিসের হাঁকডাকে ষ্টেশন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দলে দলে বহু কুলী আসিয়া সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্রমে যে ব্যক্তি সুবোধের তোরঙ্গ নামাইয়াছিল, সে উপস্থিত হইল। সুবোধ তাহাকে চিনিল। জিজ্ঞাসা করিল—"বিকালের ট্রেণে নামিয়া, যে গাড়ী আমি ভাড়া করিয়াছিলাম, সে গাড়ীর গাড়োয়ানকে তুমি চেন কি?"

সে ব্যক্তি বলিল—"চিনি বৈ কি হুজুর, তার নাম রহিমবক্স।"

"রহিমবক্সের আড্ডা কোথায় জান?"

"যোড়াসাঁকো।"

"সেখানে আমাকে লইয়া যাইতে পার? ভাল করিয়া বখ্‌শিশ্‌ দিব।"

বখ্‌শিশের নাম শুনিয়া কুলিপুঙ্গব অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিল—"চলুন না হুজুর। এখনি যাইতেছি।"

কুলী সুবোধের সঙ্গে চলিল। পুলিসের সেই রাইটার কনেষ্টবল অর্থাৎ "মুন্সীজি" সুবোধের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—"বাবু-সাহেব।"

সুবোধ বলিল—"বখ্‌শিশ?"

সে ব্যক্তি গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"বাবুজি, আমি চাপরাশি না দারোয়ান যে বখশিশ দিবেন? তবে পাণ খাইবার জন্য যদি কিছু দেন ত আলবৎ লইতে পারি।"

সুবোধ মনে মনে বলিল—"বাধিত করিতে পার।" সুবোধের মন তখন অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। টাকার প্রতি মায়া মমতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। ঠন্‌ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া মুন্সি বলিল—"বন্দিগি বাবু সাহেব।"

"হুজুর ভবানীপুর।"

"কোন স্থান ?"

"ছক্কর বেড়িয়া।"

সুবোধের দেহে প্রাণ আসিল। ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া সুবোধের ভায়রাভাই অবিনাশচন্দ্রের বাড়ী। সুনীতি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়াছেন। আর কোনও ভাবনা নাই। তবু সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল—"কত নম্বর ?"

"নম্বর ত মনে নাই হুজুর।" বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে লোকটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কান্না দেখিয়া সুবোধ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কুলীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কাঁদে কেন ?"

কুলী জিজ্ঞাসা করিল—"রহিম! কাঁদিস্ কেন রে? ভয় কি তোর ?"

রহিম কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল—"ভয় আবার কি ? বেশী দারু পিলেই আমার কান্না পায়। মনে হয় যেন আমার বিবি মরে গেছে।"

শুনিয়া সুবোধ মনে মনে হাসিল। "বিবি"র বিরহে মানুষের অন্তরে যে কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহা সে এতক্ষণে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

সুবোধ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা দুজনে এই পাঁচ পাঁচ টাকা বখ্‌শিশ্ নাও।"

পর মুহূর্ত্তেই সুবোধের গাড়ী ভবানীপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। রাত্রি তখন এগারোটা। শীতল নৈশ বায়ু তাহার ললাটের ঘর্ম্ম অপনোদন করিয়া দিল। সুবোধ মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব লঘুতা

কুলীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া সুবোধ যোড়াসাঁকোর এক অন্ধকার গলিতে উপস্থিত হইল। পথে বরাবর শঙ্কা করিতে করিতে আসিয়াছিল, হয়ত গাড়োয়ানের দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হইল। গাড়ী আছে। গাড়োয়ান পার্শ্বে খাটিয়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে।

কুলী তাহাকে জাগাইল—"রহিম—ও রহিম—ওঠ্ ওঠ্।" রহিম ঘুমের ঘোরে বলিল—"আজ আর আমি ভাড়া যাব না। আজ দাও মেরে নিয়েছি।"

শুনিয়া সুবোধের মনটা ছনাৎ করিয়া উঠিল। ভাবিল কি অমঙ্গলের কথাই শুনিব না জানি!

কুলী তাহাকে আশ্বাস দিল—"ওঠ্ ভাড়া যেতে হবে না। শীঘ্র ওঠ্।"

রহিম কোন মতে উঠিল। মুখে ভয়ানক মদের গন্ধ। বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল কিছুই বোঝা গেল না। বকিতে বকিতে আবার ধপাস্ করিয়া খাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

কুলী তখন গাড়ীর জলন্ত লণ্ঠনটা খুলিয়া আনিয়া সুবোধের মুখে আলোক ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল—"এঁকে চিন্‌তে পারিস্?"

সুবোধকে দেখিবা মাত্র গাড়োয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটি যোড় করিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে বলিল—"হুজুর আপনার মেমসাহেব আমাকে আজ দশ টাকা বখ্‌শিশ্ দিয়েছেন।"

সুবোধ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মেমসাহেবকে কোথায় রেখে এসেছিস্?"

গাড়োয়ানের মাথার ঠিক ছিল না। একে মদের প্রভাব, তাহার উপর একদমে দশ টাকা লাভ করিয়াছে! কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। ভাবিয়া, পূর্ব্ববৎ করুণস্বরে বলিল—

অনুভব করিল। বারম্বার অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—"এ কি মুক্তি, এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ হৃদয় মাঝারে!"

চক্রবেড়িয়া রোডে অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে সুবোধের গাড়ী দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া, মুক্ত দুয়ারে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। একেবারে অবিনাশচন্দ্রের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। কেরোসিনের ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। অবিনাশ চন্দ্র বিছানায় আড় হইয়া শুইয়া। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুবোধ রুদ্ধ-শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—"সুনীতি?"

অবিনাশচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিলেন—"সুনীতি কি?"

"সুনীতি এসেছে?"

অবিনাশচন্দ্র আবার হাই তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"কোথা থেকে নেশা করে এলে? বিভুল বকৃচ যে হে!"

সুবোধ হতাশ হইয়া নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এই সময় তাহার শ্যালিকা সুমতি প্রবেশ করিলেন। সুবোধকে দেখিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো সাহেব! চন্দ্রশেখর অভিনয়টা কেমন দেখ্‌লে?"

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিলেন—"আচ্ছা পাগল! পেটে এক মিনিট কথা থাকে না? আমি ভায়াকে একটু চান্‌কে নিচ্ছিলুম।"

সুবোধ বলিল—"খুব লোক যা হোক্! এ সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে!"

মহা হাসি পড়িয়া গেল। সুমতি ও অবিনাশচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া সুনীতির দুর্গতির ইতিহাসটা বিবৃত করিলেন। সুবোধ কুলির সঙ্গে ষ্টেশন মাষ্টারের সন্ধানে প্রস্থান করিলেই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া একেবারে ষ্টার থিয়েটরে হাজির। গাড়ীও ছুটিল, সুনীতিও

কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। থিয়েটরের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া গাড়োয়ান আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। গাড়োয়ানকে দেখিবা মাত্র সাহসে ভর করিয়া সুনীতি বলিল—"চল্ আবার ষ্টেশনে চল্। আমার স্বামীকে ফেলিয়া আসিলি কেন?" গাড়োয়ান আবার হাওড়া ষ্টেশনে যায়। অনেক খুঁজিয়া সুবোধকে পাইল না। তখন কি ভাগ্যিস্ সুনীতির বুদ্ধি যোগাইল। এখানকার ঠিকানা বলিয়া দিল। দশ টাকা বখ্শিশ্ কবুল করিল। আমরা ত মেম সাহেবকে দেখিয়া চিনিতেই পারি না। শেষকালে সুমতি উপসংহার করিলেন— "আহা মরি কিবে ছিরিই বেরিয়েছিল! সে বেশ আর সে অবস্থা দেখে হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব ভেবে ঠিক কর্‌তে পারিনি। যদি থিয়েটরে বক্সে নিয়ে যাবারই সাধ. তবে অমন কিম্ভূতকিমাকার না সাজিয়ে পূজোর সময় সখ করে যে নতুন পোষাক তৈরি করিয়েছ তাই পরালেই ত হ'ত। সেও শাড়ী হোক্, কিন্তু এ কালের ছাঁদের. কত সুন্দর। যে সব মেয়েরা বাইরে বেরোন তাঁরা ত ঐ পরে বেরোন, তাঁরা ত আর গাউন পর্‌তে যান না। এ বুদ্ধিটুকু তোমার ঘটে কেন জোটে নি?"

সুবোধ মহা অপ্রতিভ হইয়া ভাবিল—"তাই ত।"

বৃত্তান্ত শেষ হইলে সুমতি সুবোধকে ডাকিল—"এখন এস সাহেব মশাই! তোমার বিবির সঙ্গে দেখা কর্‌বে এস। সে ত এসে অবধি জল গেলাসটি অবধি খায় নি, কেঁদে কেঁদে মর্‌ছে। এই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। তাকে উঠাইগে চল। তোমার অবস্থাটা কি হয়েছিল বল্‌বে এস।"

ভুল-ভাঙ্গা

আজকাল শ্বাশুড়ীকে নিন্দা করা বধূদের একটা ফাসান্ হইয়াছে। নাটকে, নভেলে পর্য্যন্ত শ্বাশুড়ী বেচারীদের পরিত্রাণ নাই। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"মূর্খেরে তুষিবে তার মত কদাচারে"—গ্রন্থকারেরা কি এই মহাজন-বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ করেন? নবীনা পাঠিকাদের তুষ্টিসাধন ব্যতীত বাঙ্গালা বহি বিক্রয় হইবার আর উপায় নাই বুঝি?

আমি শ্বাশুড়ীদের হইয়া ওকালতী করিতে বসিয়াছি, তাই যেন তোমরা পাঁচজনে আমাকে বুড়ি মাগী বলিয়া গালি দিও না। আমার বয়স এখনও কুড়ি পার হয় নাই, সুতরাং তোমরা কোনও মতেই আমাকে বুড়ি বলিতে পারিবে না।—আমার শ্বাশুড়ীর মত এমন শ্বাশুড়ী কলিকালে হয় না। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তোমরা যদি তাহা করিতে, তবে তোমাদের শ্বাশুড়ী—থাক্ আর অপ্রিয় সত্য কথাটা বলিব না—আমার গল্পটা শ্বাশুড়ীকে শুনাইয়া তাঁহার মতটাই না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

কলিকাতার নিকট বরাহনগরে আমার পিত্রালয়। আমরা দুই বোন্. তিন ভাই। আমিই সবার ছোট. মায়ের কোলের মেয়েটি বলিয়া ছেলে বেলায় মা বাপের আদর একটু বেশী পরিমাণেই পাইয়াছিলাম। আহা, আমার সে বাবাই বা কোথা গেলেন, আমার

সে মা-ই বা কোথায় গেলেন! দাদারা এখন ঠাকুর দেবতাদের আশীর্ব্বাদে চিরজীবি হইয়া বাঁচিয়া থাকুন, তাহা হইলেই সব।

মা বাপের আদরে সোহাগে আমার শৈশব কাটিতেছিল। যখন আমি ছয় বৎসরের কি সাত বৎসরের হইয়াছি, তখন বাবা আমাকে একখানি প্রথমভাগ আনিয়া দিলেন। আমি সমস্ত দিনে অ আ ক খ সব চিনিয়া ফেলিলাম। যে দেখিল সেই আশ্চর্য্য হইল, যে শুনিল সেই অবিশ্বাস করিল। আমার বুদ্ধি আর স্মরণশক্তি দেখিয়া ছোট দাদা বলিলেন,—"হরি! আমি তোকে পড়াব আয়।" বলিয়া রাখি, আমার নাম শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী।

দাদার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এক খানি দুই খানি করিয়া প্রাথমিক বহিগুলি শেষ করিলাম। যখন রামায়ণ, মহাভারত, আরব্যোপন্যাস পড়িতে লাগিলাম, তখন আমার বয়স নয় বৎসর কি জোর দশ বৎসর।

আমার এই দাদাটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। গুরুনিন্দা করিতে নাই—কিছু বলিতে চাহি না;—ইনি আমার সর্ব্বনাশের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমার নিতান্ত জোর কপাল, তাই আমি ভাসিয়া গিয়াও ফিরিতে পারিয়াছি।

আমি তখন খুব ছোট ছিলাম,—লোকের মুখে গল্প শোনা,—দাদা কলিকাতার কলেজে পড়িতেন, হঠাৎ একদিন একজন আসিয়া সংবাদ দিল,—"তোমাদের চিত্তরঞ্জন (দাদার নাম চিত্তরঞ্জন) ব্রহ্মজ্ঞানী হবে,—সমস্ত ঠিক হয়েছে,—এই ১১ই মাঘ তার দীক্ষা।"—এই সংবাদে আমার পিতামাতার মাথায় বজ্রপাত হইল। তাঁহারা সকলে হাঁ হাঁ করিয়া কলিকাতায় দাদার বাসায় গিয়া পড়িলেন। কান্নাকাটি করিয়া, আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, দাদাকে বাড়ীতে আনা হইল।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কে দাদাকে পরাজিত করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে একযোড়া অধ্যাপক আমদানী করা হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মদ্বেষী যত কিছু পুস্তক-পুস্তিকা ছিল, সে সব কলিকাতা হইতে আসিল। ক্রমে দাদা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম হইতে না পাইয়া ক্রমে কর্ণেল্ অল্‌কটের শিষ্য হইয়া পড়িলেন। দাদা বড় বড় নখ রাখিলেন, বড় বড় চুল রাখিলেন; মাছ মাংস ছাড়িলেন, আতপ চাউল ধরিলেন;—এমন কি সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া আর জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না। যখন দাদা আমায় লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইলেন, তখন তিনি ঘোর থিয়জফিষ্ট্। মনে আছে, বিবাহ করিবার জন্য মা কত সাধ্যসাধনা করিতেন,—দাদা বলিতেন,—"মহাত্মাগণের ইচ্ছা নয় যে আমি বিবাহ করে সংসারজালে জড়ীভূত হয়ে পড়ি।" গ্রামের যুবক-দিগের মধ্যে দাদার একটি ভক্ত-সম্প্রদায় ছিল, তাহারা গোপনে যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইত, হিমালয়ের গুহায় শত সহস্র বৎসর বয়স্ক মহাত্মারা আছেন, তাঁহারা দাদাকে মাঝে মাঝে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন।

দাদার উপর আমার ভক্তি এত বেশী ছিল যে, তিনি বলিলে আমি মরিতে পর্য্যন্ত পারিতাম। দাদা যখন একান্তে বসিয়া আমাকে পড়াইতেন, তখন মুগ্ধনেত্রে আমি তাঁহার প্রতিভায় সমুজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম। এমন দাদার সহোদরা ভগ্নী আমি,—নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। দাদা আমাকে উপদেশ দিতেন, বিশ্বজগৎ মায়ারচনা, সংসার কারাগার, আত্মীয় পরিজনের প্রতি স্নেহভালবাসা জীবের মুক্তির প্রধানতম অন্তরায়। দাদা নিজের উপদেশবাক্য রামায়ণ মহাভারত খুলিয়া সপ্রমাণ করিতেন।

যখন আমি এগারো বৎসরে পড়িলাম, তখন দারুণ শোক পাইলাম। ছয় দিনের জ্বর-বিকারে বাবা গেলেন;—ছুইটি মাসও পোহাইল না,

সতীলক্ষ্মী মা-ও স্বামীর পদানুসরণ করিলেন। দুই মাসের মধ্যে বাপ মা দুই হারাণো ;—যাহার এমন হইয়াছে সেই জানে। দাদা না থাকিলে কি সেই বয়সে সে শোক আমি সহ্য করিতে পারিতাম! দাদা এই সময়ে আমাকে গীতা পড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত জানিতাম না, তবু শ্লোকগুলি মুখস্থ করিতাম। বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িতাম। দাদা টীকা টিপ্পনী করিয়া বুঝাইয়া বুঝাইয়া দিতেন। শোকদগ্ধ হৃদয়ে গীতার শ্লোকগুলি যেন অমৃতসিঞ্চন করিত।

যখন বারো বৎসরের হইলাম, তখন আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা উঠিল। বড় দাদা মেজ দাদা সপরিবারে বিদেশে থাকিতেন,—তাঁহারা ছোট দাদাকে চিঠির উপর চিঠি লিখিতে লাগিলেন—হরির বিবাহের বন্দোবস্ত কর, আর বিলম্ব করিও না।

দাদাকে প্রার্থনা জানাইলাম, আমি বিবাহ করিব না ; ধর্ম্মালোচনায় কুমারী-জীবন যাপন করিব।

দাদা না-হুঁ-না-হুঁ ভাবে কিছুদিন কাটাইলেন। শেষে যখন বড় দাদারা তাঁহাকে কড়া কড়া চিঠি ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন তখন দাদা পাত্র সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। আমাকে বুঝাইলেন, বিবাহ করিলেই যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব নাশ হইয়া যায় তাহার কিছু মানে নাই। বরং সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই বেশী প্রশংসার বিষয়।

দাদা যখন এ কথা বলিলেন, তখন আমি বিশ্বাস করিব না কেন? বলিলাম—আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

[illegible]কটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া একটা স্থির হইল। পাত্র জামালপুর রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করেন। প্রথম পক্ষের বিবাহ বটে ;—কিন্তু

একটু বয়স হইয়াছে। বৎসর পঁচিশের কম নহে। তিনি স্বয়ং আমাকে দেখিতে আসিবেন লিখিলেন।

কালো গর্ণেটের কোট পরিয়া, সোণার চেন ঝুলাইয়া, বার্নিশ করা জুতা পায়ে দিয়া, টেরি কাটিয়া, সুগন্ধি মাখিয়া, রূপা-বাঁধান ছড়ি হাতে করিয়া একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিলেন, আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লেখা পড়া করি জিজ্ঞাসা করিলেন;—আমার লজ্জাও নাই, সরমও নাই, দ্বিধাও নাই, সঙ্কোচও নাই,—মুখ মাটির দিকে না নামাইয়া তাঁহার পানে নির্ভীক নেত্রপাত করিয়া স্পষ্ট কথায় চটপট্ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে বাড়ীর লোকের কাছে আমাকে ভর্ৎসনা শুনিতে হইল। সবাই বলিল—"তোর কি ভয়, লজ্জা কিছুই নেই? লেখা পড়া শিখেছিস্ বলেই কি অমন বাহাদুরী না কর্‌লেই নয়?" আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, পাত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা যাহা দিব তাহাতেই রাজি। ফল-কথা আমাকে বিবাহ না করিয়া ছাড়িবেন না।

ভাবিলাম তা না ছাড়ুন। বিবাহ যখন আমাকে করিতেই হইবে, তখন আর কথা কি! রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিলাম।

শ্রীরামপুরের নিকট আমার শ্বশুরবাড়ী। আমার স্বামী একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। আমি নববধূ,—নববধূর যেরূপ লজ্জা সরম থাকা আবশ্যক, আমার সেরূপ নাই দেখিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিল। শাশুড়ী বলিলেন—"আহা, তা হোক্—ছেলে মানুষ—খুনি হলেই সব হবে এখন।" আমার সম্বন্ধে কে কি বলিল, কে কি না

বলিল. তাহা আমি গ্রাহ্যই করিতাম না; নিজের পড়া শুনা লইয়াই থাকিতাম। পড়া শুনার জন্যও কিছু কিছু বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছিল। সপ্তাহকাল ছিলাম। স্বামী আমার মন ভুলাইবার জন্য প্রতিরাত্রেই কিছু-না-কিছু নূতন জিনিষ উপহার দিতেন। নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ। আমি লইতাম—কিন্তু মনে মনে হাসিতাম। আমি বুঝিয়াছিলাম. পৃথিবী অসার, ইহলোকের সুখ দুঃখ কিছুই সত্য নহে,—আমি দুইটা ফুলের তোড়া অথবা দুই শিশি গন্ধ লইয়া কি করিব? তবু লইতাম;—স্বামীর মনে বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? স্বামী আমাকে আদরে সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ঠিক ভাল লাগিত না বলিতে পারি না। জনকজননীর জীবিত কালে আদর সোহাগ আমার প্রচুর পরিমাণেই ছিল, দুই বৎসর যাবৎ আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। স্বামীর আদর শুষ্কহৃদয়ে নববর্ষার জলবিন্দুর মত বোধ হইত। কিন্তু বড় ভয় করিত। নির্জ্জনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম, "হে দয়াময় প্রভু, যেন সংসারের মায়াকুহকে ভুলিয়া যাই না, রক্ষা করিও।"—বধূজনোচিত লজ্জার অভাবে অন্যের কাছে নিন্দাভাজন হইতাম বটে, কিন্তু স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন বুঝিতে পারিতাম। একে তিনি একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন,—তাহার উপর আবার কাঁচিয়া ছেলেমানুষ সাজিয়া যে কচি খুকীটির লজ্জা ভাঙ্গাইতে হইল না, ইহাতে তিনি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সাতদিন শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া আমি পিত্রালয়ে ফিরিলাম। স্বামী আমার সঙ্গে "যোড়ে" আসিলেন। বাড়ীর লোকে তাঁহাকে লইয়া কত আমোদ প্রমোদ করিল। তাঁহার ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, তিনি চলে ফিরিলেন। যাত্রা করিবার সময় দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতেছে। আমাকে বলিয়া গেলেন—"চিঠি লিখো।"

বিবাহের পর প্রায় তিন বৎসর কাল আমি বরাহনগরে রহিলাম। পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে স্বামী আসিতেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একটা না একটা বিঘ্নবশতঃ হয় নাই। একবার সব ঠিকঠাক;—শেষ মুহূর্ত্তে পত্র আসিল সাহেব তাঁহাকে ছুটি দিল না। আর একবার যাইবার সময় আমার পীড়া উপস্থিত হইল। আরও একবার ঐ রকম কি একটা ব্যাঘাত হয়।

এই তিন বৎসরে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। প্রথম দাদার বিবাহ। দ্বিতীয়, আমাদের উভয়ের গুরুলাভ।

এই সময়ে দাদা শাস্ত্রচর্চ্চার অবসরে মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন সেখানে একজন গুপ্ত বিদ্যায় পারদর্শী পরম জ্ঞানীপুরুষের দর্শন পাইয়াছেন, সেখানে উপদেশার্থে গমন করেন। দাদা যাহাই শিখুন, ভবিষ্যতে একদিন আমিও তাঁহার সেই বিদ্যার অধিকারিণী হইব, এই আশায় উৎফুল্ল হইতাম। দাদা সেখানে কি শিখিয়াছিলেন না শিখিয়াছিলেন সে পরিচয়লাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তাঁহার উপদেষ্টা স্বীয় পঞ্চদশবর্ষীয়া ভগ্নীটিকে দাদার গলায় বাঁধিয়া দিলেন;—দাদা বিবাহ করিলেন। আত্মীয়-স্বজন ইহাতে সকলেই সুখী। দাদার বয়স তখন প্রায় ত্রিংশবর্ষ। দাদা বলিলেন—"মহাত্মাগণ এত দিনে আমার বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন।" যাহা হউক, বিবাহ করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় দাদার আগ্রহ বাড়িল বই কমিল না। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে নিত্য নূতন গ্রন্থাদি বোম্বাই ও কাশী হইতে আসিতে লাগিল। আমি ক্রমে উপযুক্ত হইতেছি বিবেচনা করিয়া দাদা আমাকেও যোগের দুই চারিটি জিনিষ শিখাইতে লাগিলেন। লেখা পড়া আমি যত শীঘ্র

শিখিয়াছিলাম, এগুলি কিন্তু তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। একদিন দাদা রাগ করিয়া বলিলেন—"তোর কর্ম্ম নয়,—তোর মন চঞ্চল হয়েছে।"

আমার মুখ শুকাইয়া গেল। ধরা পড়িলাম। বাস্তবিকই ইদানীং আমার মনে চাঞ্চল্য আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে একখানি হাসিমাখা স্নেহভরা মুখ মনে পড়িয়া দেহমন অবশ করিয়া দিত।

সে দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিলাম আর প্রার্থনা করিলাম। হা জগদীশ, এত শিখিলাম, এত সাধনা করিলাম, আমার সব ব্যর্থ হইবে? ফিরিতে হইবে জানিলে, এ পথে কে পদার্পণ করিত! আমি কি এখন সব ছাড়িয়া, বেশবিন্যাস করিয়া, নাটক পড়িয়া, স্বামীকে প্রণয়-পত্র লিখিয়া দিন কাটাইতে পারিব? বাসুদেব! কুরুক্ষেত্রে তুমি পাণ্ডবদিগকে জয়শ্রী দান করিয়াছিলে, আমার এই মানসক্ষেত্রে আসিয়া বরাভয় মূর্ত্তিতে দর্শন দাও—আমি মোহরূপ দুর্য্যোধনকে সংহার করি। তুমি জগতের স্বামী,—তুমি আমারও স্বামী;—তোমার ভাবনা ছাড়া আর কাহারও ভাবনা আমার মনে যেন প্রবেশ করিতে না পারে।

ইহার পর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যোগচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলাম। অজপাসাধন, ষট্‌চক্র, নাদ ও মুদ্রার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিল। কিন্তু মনের সেই গুপ্ত চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে কৃতকার্য্য হইলাম না। সে ভাবনাকে যত বলিতাম—আসিও না, তত সে আসিয়া মনের দুয়ারে মাথা কুটাকুটি করিত। তথাপি আমি কিছু কিছু শিখিলাম।

এই সময় একদিন গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী দাদার সেই বন্ধু—আপাততঃ শ্যালক—তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে আসিয়া দর্শন দিলেন। গুরুদেব উন্নত ললাট গৌরবর্ণ বৃদ্ধ পুরুষ, সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটা ব্রহ্মচর্য্যের

জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসরের কম হইবে না। চক্ষে ও ওষ্ঠাধরে প্রশান্ত হাস্যরেখা দেদীপ্যমান।

তাঁহার সঙ্গে দুই তিন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া দাদা আমাকে বলিলেন—"হরি, আমরা ইঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করি আয়; সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত,—এমন গুরুলাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।"

উপযুক্ত দিনে আমরা ভাই বোনে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলাম। এতদিন আমি ইষ্টদেবতাবিহীন ছিলাম; ইষ্টদেবতা পাইয়া এইবার সাধনার সুবিধা হইল। ত্রিসন্ধ্যা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। পূজার ধূম দেখে কে! কিছুদিন পরে গুরুদেব কলিকাতায় গেলেন। দাদা তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া সম্মত করিয়া বহুব্যয়ে সাহেব-বাড়ীতে তাঁহার ছবি তোলান হইল। সেই ছবি বহু-ব্যয়ে বাঁধাইয়া দাদা স্বয়ং একখানি রাখিলেন, আমাকে একখানি দিলেন। পূজাকালে সেখানিকেও রীতিমত পূজা করিতাম। বেশ দিন কাটিতে লাগিল।

আশ্বিন মাসে আমার স্বামী দাদাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—ছুটিতে আসিয়া বিজয়া-দশমীর দিন আমায় লইয়া যাইবেন। শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া কেমন করিয়া পড়াশুনা হইবে, পূজার্চ্চনাই বা কেমন করিয়া হইবে? বড় ভাবনা হইল। যাহা হউক, ইহার জন্য পূর্ব্বাবধিই প্রস্তুত ছিলাম। ভাবনা যাদৃশীর্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীঃ। তবে আমার বিঘ্নাশঙ্কা কোথায়? নির্দ্দিষ্ট দিনে দাদার চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রুহীন চক্ষে স্বামীর সহিত গাড়িতে উঠিলাম। দাদাকে অনেক করিয়া বলিয়া গেলাম, যদি গুরুদেব আসেন তবে—অবশ্য অবশ্য আমাকে গিয়া লইয়া আসিও।

আমার স্বামী আমাকে লইয়া একেবারে জামালপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্বশ্রূদেবী মিষ্ট কথায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে স্থানে আমাদের বাসা, তাহাকে বৈদ্যপাড়া বলে। জানালা খুলিলে আধমাইল দূরে পাহাড় দেখা যায়। বৈদ্যপাড়ায় সবই বাঙ্গালী ;—শুনিলাম জামালপুরময় সবই বাঙ্গালী। হিন্দুস্থানীর সংখ্যা জামালপুরে মুষ্টিমেয়। হিন্দুস্থানী যত, তাহারা সব জামাল-পুরের বাহিরে আশেপাশে পল্লীগ্রামে থাকে। জামালপুরে সমস্তই আফিসের বাবু। নয়টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত জামালপুরসুদ্ধ বাবু আফিসে আবদ্ধ থাকেন, সুতরাং ঐ সময়ের জন্য জামালপুরটা স্ত্রীলোকের রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত প্রকাশ্য রাজপথ অতিক্রম করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়। প্রয়োজন হইলে দল বাঁধিয়া এপাড়া ওপাড়া করাও চলে। এইটি জামালপুরের স্ত্রীসমাজের বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের বাহিরে আর কোথাও স্ত্রীলোকদের এ সুযোগ নাই। অন্যের পক্ষে ইহা যতই সুবিধা-জনক হউক, আমার মহা বিপদ হইল। পাড়ার লোকে দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। আমার সম্বন্ধে যে সব সমা-লোচনা হইতে লাগিল, সেগুলা তাহারা আমার অসাক্ষাতে করার শিষ্টাচার পর্য্যন্ত দেখাইল না। আমি অসঙ্কোচে সরলভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতাম, প্রতিফলস্বরূপ কেহ আমাকে বেহায়া বলিত, কেহ বলিত দেমাকে, কেহ বলিত কিছু। ক্রমে ক্রমে আমার বিরক্তি ধরিয়া গেল। আমার পড়াশুনা পূজার্চ্চনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহারা আসিলেই আমি লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িতাম। হাজার ডাকাডাকি করিলেও উত্তর দিতাম না। তাহারা আমার প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া আমার ঘর ছাড়িয়া

যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না, তাহা হইলে ত বাঁচিতাম। কখনও বারান্দায় কখনও উঠানে পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা পাকাইত। তাহারা চলিয়া না গেলে আর আমি বিছানা ছাড়িতাম না। শ্বাশুড়ী মাঝে মাঝে আমাকে বলিতেন—"বাছা, ওরা সব তোমায় দেখ্‌তে আসে, তুমি গাথাঠারোপনা করে বিছানায় পড়ে থাক, ওঠ না, কথা কও না, দেখ্‌তে কি সেটা ভাল হয়? ভারি সবাই নিন্দে করে।" মাকে আমি কিছু বলিতাম না, ভাবিতাম ভাল হয় না ত হয় না। নিন্দা করে ত করে। এরূপ অলস নিন্দার ভয়ে কি আমি ভীত হইব? তাহা হইলে আমি ঐ শত সহস্র সাধারণ স্ত্রীলোকের সাগরে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া যাই না কেন? তাহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সমস্ত দিন আমার পূজা ও শাস্ত্রচর্চ্চা কিছুই হইত না;—রাত্রে আমাকে সে সব করিতে হইত। রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত জাগিতাম। সুতরাং দিবানিদ্রা ভিন্ন উপায় ছিল না।

প্রতিবেশিনীরা আমার বিরুদ্ধে আমার শ্বাশুড়ীর নিকট নানা প্রকার অভিযোগ করিয়া আমার বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। আমি যে তাহাদের সঙ্গে সংস্রব মাত্র রাখিতে স্বীকৃত হইলাম না, ইহাই তাহাদের চক্ষে আমাকে মহা অপরাধে অপরাধিনী করিল। তাহারা যত আমার অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিল, আমি তত তাহাদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলাম।

নানা কারণে আমি লোকের বিরাগভাজন হইতে লাগিলাম। আমার শ্বাশুড়ীর নিকট তাহারা শুনিয়াছিল যে আমি সর্ব্বদা পড়াশুনা করি। দুই চারিজন নবীনা, নাটক নভেলের দুরাশায়, আমার সঙ্গে ভাব করিল। একজন আসিয়া একদিন বলিল,—"বউ, তোমায়

কাছে নাকি সব অনেক ভাল ভাল বই আছে, কি কি বই দেখাও না ভাই।"

আমি মনে মনে হাসিয়া বাক্স হইতে দুই চারিখানি বহি বাহির করিয়া দেখাইলাম। বইগুলি সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল—"এই বই তুমি পড় ?''

আমি বলিলাম—"পড়্‌বার জন্যেই ত এনেছি।"

"এ যে শাস্ত্র।"

"শাস্ত্র কি পড়্‌তে নেই ?"

"পড় ভাই। আমরা মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানুষ।"—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি কি পুরুষমানুষ নাকি ?'' বলিয়া বহি তুলিয়া রাখিলাম। ঐ যে একটু হাসিলাম, তাহাতেই বোধ হয় সখী মনে করিলেন, আমি তাঁহাকে অপমান করিলাম। যাহা হউক তিনি অভিমানে গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার সঙ্গে যাহাদের আলাপ হইত, বারান্তরে দেখা হইলে তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিতাম না। কে অত মনে করিয়া রাখে বাবু! ইহাও আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার করিল। কেহ কেহ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত—"তা হোক্ বড় মানুষের মেয়ে, তাই বলে' কি অমনিই কর্‌তে হয় ? আমি কি ওঁর দ্বারস্থ হতে গিয়েছিলাম যে আমাকে চিন্‌তেই পার্‌লেন না ?"

এই সকল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আমি আবশ্যক বোধ করিতাম না। তাহারাও তিল তিল করিয়া আমার শ্বাশুড়ীর মন বিষাক্ত করিয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল।

শাশুড়ী আমায় মাঝে মাঝে একটু আধটু ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিল। কিন্তু আমি তাঁহার

ভর্ৎসনায় দুঃখিত বা বিরক্ত হইতাম না; বোধ হয় সেই কারণে তাঁহার ক্রোধও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে চলিল।

নিজমুখে নিজদোষের কথা বলিতেছি, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। মনের ভাব যেমন যেমনটি হইয়াছিল, তেমনি বলিয়া যাইতেছি। আমার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া যেন তোমরা আমাকে ভুল বুঝিও না;—যেন মনে করিও না যে আমার ভাবখানা—দেখ দেখি আমি কেমন বাহাদুরী করিয়াছিলাম। আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন মনে হইত বুঝি ভারি বীরত্ব করিতেছি। আমার শাশুড়ী বালবিধবা। চিরদিন পাঁচটার সংসারে খাটিয়া খাটিয়া পরের মন যোগাইতে যোগাইতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। কেবল ছেলেটিকে মানুষ করিবার জন্যই না? সেই ছেলের বউ আসিল—কত সাধের বউ—তিনি মনে ভারি আশা করিয়াছিলেন, বধূর হাতে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, বসিয়া আপনার হরিনাম করিবেন। বধূ যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পূজা করিবে আর গীতা মুখস্থ করিবে, আর সমস্ত দিন লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অনেক দিন হইতে প্রথা আছে, ছেলে বিবাহ করিতে যাইবার সময় মা জিজ্ঞাসা করেন—

"বাবা তুমি কোথায় যাইতেছ?"

ছেলে বলে—

"মা আমি তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি।"

স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় একালের বধূগণের গুণকীর্ত্তন করিবার সময় বলেন যে, ঐ উত্তর পরিবর্ত্তন করিয়া এখন বলা উচিত—"মা তোমার মুগুর আনিতে যাইতেছি।"—আমার শাশুড়ীর পক্ষে আমি

ঠিক মুগুর হই নাই বটে, কিন্তু দাসী যে হই নাই তাহা নিঃসন্দেহ। বরং তিনিই দাসীর মত আমার সেবা করিতেন। লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কত দিন হয়ত দাই আসে নাই, আমার ছাড়া-কাপড় পর্য্যন্ত মাকে কাচিতে হইয়াছে। আমি কি যে ভাবিতাম, কি অহঙ্কারে যে মত্ত থাকিতাম, তাহা বলিতে পারি না। শ্বাশুড়ী যে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন, তাহার জন্য তাঁহার আর দোষ কি? তিনি যতই ভালমানুষ হউন, রক্ত মাংসের শরীর ত বটে।

শুধু শ্বাশুড়ীকে নহে, স্বামীকেও আমি জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলাম। প্রথম প্রথম আমার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তিনি হাসিতেন। আমি আসিয়া পূজার জন্য একটা আলাহিদা ঘর দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। অগত্যা আমার শয়ন ঘরের একটি কোণে আসন বিছাইয়া আলো জ্বালিয়া পূজা করিতে বসিতাম। গুরুদেবের বাঁধান ছবিখানি পেরেকে টাঙ্গান থাকিত। প্রথম প্রথম একদিনের কথা মনে পড়িতেছে, রাত্রে আহারান্তে স্বামী নিকটস্থ মেসের বাসায় গল্প করিতে গিয়াছিলেন। আমি যথাসময়ে শয়নগৃহে গিয়া পূজার আসনে বসিলাম। প্রথমে গুরুদেবের ছবি নামাইয়া পূজা করিলাম। তাহার পর চৈতন্যভাগবত খুলিয়া বসিলাম। এমন সময় স্বামী আসিলেন। আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলাম—"জুতো পায়ে দিয়ে আমার পূজোর এত কাছে এস কেন?"

"আসিলে কেন" না বলিয়া বলিলাম—"এস কেন?"—যেন পাঁচ দিন আসিয়াছেন!

স্বামী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"ওঃ,"—বলিয়া জুতা ছাড়িয়া আসিলেন।

তোমরা আমার স্পর্দ্ধাখানা দেখিলে? তাঁহার সেই জুতা, তাহা লইয়া পূজা না করিয়া বলিলাম কি না জুতা পায়ে দিয়া আমার পূজার অত কাছে এস কেন!

যাহা হউক, জুতা ছাড়িয়া আমার স্বামী একটা কি বিছাইয়া আমার কাছে বসিলেন। আমার হাতখানি ধরিয়া সোহাগস্বরে বলিলেন—"আর লেখাপড়া করতে হবে না—চল।"

আমি বলিলাম—"না না, তুমি শোওগে, আমার এখন অনেক কায বাকী আছে।"

"যা বাকী আছে তা কাল হবে। আজ ঢের হয়েছে, চল।"

আমি নীরবে ঘাড় নাড়িলাম।

তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, তবে একটা পাণ এনে দাও।"

আমি বলিলাম—"ঐ টেবিলের উপর ডিপেতে আছে, উঠে নাও না।"

স্বামী বলিলেন—"তুমি দিতে পার না?"

কি করি, উঠিলাম। পাণ আনিয়া হাতে দিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি আপনি হাতে করে খাব না। তুমি খাইয়ে দাও।"

ভাল বিপদ! হাত এঁটো হইয়া গেল। বামহস্তে করিয়া কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া হাত ধুইয়া ফেলিলাম। আবার চৈতন্যভাগবতে মন দিলাম। স্বামী বসিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম—"তুমি কতক্ষণ বসে থাকবে? আমার অনেক রাত্রি হবে, আফিস থেকে খেটে খুটে এসেছ, যাও শোওগে।"

তিনি বলিলেন—"তোমাহীন শয্যায় আমি শোব না। আমি এই খানে শুই" এই বলিয়া আমার কোলে মাথা দিয়া সটান্ শুইয়া পড়িলেন।

আমি বহি বন্ধ করিলাম। তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। সে দিনের সে মুখ আমি কখনও ভুলিব না। শরতের আকাশে যেমন

মেঘ ও রৌদ্র পরস্পরকে শীকার করিয়া ফিরে * তাঁহার মুখেও তেমনি অভিমান ও কৌতুক পরস্পরকে শীকার করিয়া ফিরিতেছিল। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে কেমন একটা দুর্ব্বলতা আসিল, আমি মুখ নত করিয়া———। বুঝিলে? তোমরা হইলে পারিতে? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই আমি লজ্জা সরমের ধার ধারি না।

সেদিনকার মত পূজাপাঠ বন্ধ করিতে হইল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনুশোচনায় কাটিল। ভাঙ্গা চোরা ছিন্ন ভিন্ন কতই স্বপ্ন দেখিলাম; একবার যেন দেখিলাম, গুরুদেব ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যেন কঠোরস্বরে বলিলেন—"এই তোর নিষ্ঠা!"

পরদিন প্রাতে জাগিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবার অবধি মনকে দৃঢ় করিব। এমন করিয়া সংসারের স্নেহ-প্রেমে আকৃষ্ট হইলে চলিবে না। যতটুকু নহিলে নয়, ততটুকু সংসারকে দিব। বাকী সব শাস্ত্রের ও দেবতার।

তাহার পর হইতে স্বামী ডাকিতে আসিলে আর অমন গলিয়া যাইতাম না। প্রায়ই দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতাম। কতদিন নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়াছেন, আর আমি গীতার গূঢ়ার্থ বুঝিতে প্রাণপাত করিয়াছি।

ক্রমে ক্রমে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমায় কিন্তু একটি দিনও একটি উচ্চ কথা বলেন নাই। আমার জন্য বন্ধুসমাজেও তাঁহাকে বিদ্রূপ সহিতে হইত কি কম? কেহ বলিত—"ওহে, স্ত্রীকে

* দোহাই রবি বাবু! আপনার চুরি করি নাই। আমাদের ছাদ হইতেও এক দিন আমরা এইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

গুরু করে মন্তোর নাও।" কেহ বলিত—"ওহে, তোমার ভাবনা কিহে! রোজ একটু একটু করে স্ত্রীর চরণামৃত খেও—শরীর নীরোগ হবে।" কেহ বলিত—"ওহে! আফিসে বেরুবার সময় তোমার পুণ্যবতী স্ত্রীকে প্রণাম করে বেরিও, কাযে ভুলচুক হবে না। চাই কি হঠাৎ পাঁচজনকে ডিঙ্গিয়ে প্রোমোশনও পেয়ে যেতে পার।"

ছয় মাস আমি শ্বশুরবাড়ীতে রহিলাম, ছয় মাসে শাশুড়ীকে ও স্বামীকে তিক্ত-বিরক্ত করিয়া তুলিলাম। ইদানীং স্বামী দারুণ অভিমানে আর আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। লোকে আমার শাশুড়ীকে বলিতে লাগিল, "ও বউকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ও আপনার পূজো অর্চ্চনা করুক, তুমি ছেলের আবার বিয়ে দাও।" মা প্রথম প্রথম সে কথা কাণে তুলিতেন না। কিন্তু আমি পাড়ার যাহাকে তাহাকে বলিতে লাগিলাম, আমার স্বামী স্বচ্ছন্দে পুনর্ব্বার বিবাহ করুন, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যথাকালে তাহারা এ কথা আমার শাশুড়ীর কাণে তুলিল। তিনি তাঁহার ছেলের শুষ্কমুখ দেখিয়া, পরামর্শদায়িনীদের মতে মত দিলেন। মধ্যে মধ্যে মাতা পুত্রে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল দেখিলাম। সব বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কিছুই দুঃখ হইল না। স্বামীকে আমার সাধনার বিঘ্নস্বরূপ মনে হইত। তিনি যেন আমার মূর্ত্তিমান প্রলোভন,—আমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার জন্য সংসার-সুখের নিষিদ্ধ ফল হাতে করিয়া আহ্বান করিতেছেন। ভাবিলাম, করুন না বিবাহ, করিয়া সুখী হউন, আমি উঁহার পথের কণ্টক, উনিও আমার বিঘ্ন। আমি দাদার কাছে চলিয়া যাইব। চিরজীবন দুই ভাই বোনে আপনাদের সাধন ভজন লইয়া থাকিব।

একদিন রবিবারে ও ঘরে বসিয়া মাতাপুত্রে কথাবার্ত্তা হইতেছিল,

আমি বাহির দিয়া যাইতেছিলাম। হটাৎ আমার কাণে গেল—আমার স্বামী বলিতেছেন—"শেষকালে যদি ও আবার খোরপোষের দাবী করে, —আমার এই ত অবস্থা, কোথা থেকে দু দুটো স্ত্রীকে প্রতিপালন কর্‌ব?" বলিয়া স্বামী চুপ করিলেন, শ্বাশুড়ীও নীরব হইলেন। এ কথা কি কথাবার্ত্তার উপসংহার তাহা আমি বুঝিলাম। একটু যেন আনন্দ হইল। ভাবিলাম স্বামীর যাহা বাধা তাহা আমি স্বহস্তে ছিন্ন করিব। রীতিমত দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিব যে, আমি স্বামী চাহি না, স্বতঃ কিংবা পরতঃ কখনও তাঁহার নিকট ভরণপোষণের দাবী করিব না। স্বামীতে আমার সমস্ত অধিকার আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলাম। তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারী হউন।

কালামুখী আমি—আনন্দে গর্ব্বে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। পার্থ যখন কুরুক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে, আমার সেইরূপ আনন্দ হইল। আমি যেন প্রলোভনমোহাদির বিরুদ্ধে মানসিক মহাসংগ্রামে জয়লাভ করিলাম। মনে হইল, যেন আমার গুরুদেব, আমার ইষ্টদেব আমার পানে প্রসন্ন হাস্যমুখে চাহিয়া রহিয়াছেন।

আমার সে দুর্ব্বুদ্ধির কথা আনুপূর্ব্বিক লিখিতে লজ্জা করিতেছে। তোমরা আমায় যদি ক্ষমা কর, তবে এই স্থানটা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া যাই। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিলাম। দলিলে লেখাপড়া করিয়া দিলাম। টেলিগ্রাফ্ করিয়া দাদাকে আনাইলাম।

আমার এরূপ আচরণের পর আমার প্রতি আমার স্বামীর মনের ভাব কিরূপ হইল বল দেখি?—অন্য স্বামী হইলে আর অতঃপর আমার মুখদর্শন করিতেন না। কিন্তু আমার স্বামী আমায় কত

বুঝাইলেন—বলিলেন,—"হরি! এখনও মতি পরিবর্ত্তন কর। বড় ভুল কর্‌ছ।"

আমি তখন ভাবে মত্ত। তাঁহার এই অনন্যসুলভ সহৃদয় উদারতা আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যাইবার সময় তিনি বলিয়া দিলেন—"বলে রাখ্‌ছি, যদি কখনও বিপদে পড়, তবে আমাকে সংবাদ দিতে সঙ্কোচ কোরো না।"

দাদার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। তাঁহার নিকট কৃত কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ প্রশংসা ও উৎসাহ পাইব আশা করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই পাইলাম না। তিনি যেন কিছু অপ্রসন্ন। গাড়ীতে যতক্ষণ দুইজনে ছিলাম, ততক্ষণ তিনি বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—"হরি! কাযটা ভাল কর্‌লে না।"

শুনিয়া আমার কান্না পাইতে লাগিল। দাদার মুখে এই কথা? কিন্তু কে আমায় এ পথের পথিক করিল? লক্ষকোটি বঙ্গরমণীর জীবনের স্রোত যে পথে প্রবাহিত, আমার জীবনের স্রোত সে পথে বাহিতে দিল না কে? তিনি আমার জীবনে হস্তক্ষেপ না করিলে, এই ভর্ৎসনার সুযোগ ত পাইতেন না।

আমার চোখে জল দেখিয়া দাদা আমায় সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন। যে উৎসাহের কথা আশা করিয়াছিলাম, তাহা দিয়া আমাকে সুস্থ করিলেন। ভবিষ্যতে আমরা কোন পথে চলিব, কি করিব, কি পড়িব, এই সমস্ত আলোচনার অবতারণা করিয়া আমার প্রাণে মধুবৃষ্টি করিলেন।

বাড়ী আসিয়া রীতিমত পূজার্চ্চনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিলাম। প্রথমটা দাদাও খুব উৎসাহ দেখাইলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে সে উৎসাহ ক্ষীণ হইয়া আসিত। আমি যেমন সমানে ছুটিতাম, তিনি তেমন

পারিতেন না। তিনি যেন খানিক ছুটিতেন, খানিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। আমার কথা স্বতন্ত্র;—আমি এখন স্বাধীনজীবন যাপন করিতেছিলাম, আমার স্বামী নাই, কোনও বন্ধন নাই, আমি বন-বিহঙ্গীর মত যেমন দ্রুত উড়িতেছিলাম, দাদা তেমন পারিবেন কেন? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া। একটু ছুটিয়াই হাঁফাইয়া পড়িতেন। আমি একদিন সুযোগ দেখিয়া বলিলাম,—"দাদা! তোমার কর্ম্ম নয়, তোমার মন চঞ্চল হয়েছে।"

তোমরা বুঝিতে পারিলে ত, আমি কেমন মজার প্রতিশোধটি লইলাম? দাদাও একদিন আমাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। সে দিন আমার সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়াছিল। দাদার মুখে চক্ষে সে ভাবের লেশমাত্র না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। যেন ভাবটা, এ আপদ চুকিলেই বাঁচি। হায় মহাত্মাগণ! কেন তোমরা দাদাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলে?

ছোটবউ শুধু দাদার বিঘ্ন জন্মাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, সুযোগ পাইলেই আমারও পথরোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। দাদার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার গতির খর্ব্বতা করিয়াছিলেন, আমাকে নিকটে পাইলেই, যথাস্থানে বসিয়া আমারও পৃষ্ঠে চাবুক হাঁকাইতেন। উপমার খাতিরে কথাটা যেমন লঘুভাবে বলিলাম, তাহা নয়। পরের মুখে অনেক কথা শুনিতে পাইতাম;—একদিন স্বকর্ণে শুনিলাম—তাঁহার একটি প্রিয় সখীকে বলিতেছেন—"এমন ত কখনও শত জন্মেও শুনি নি।"

ছোটবউয়ের সখী বলিলেন—"আমার ত বিশ্বাস হয় না ভাই যে ও ইচ্ছে করে স্বামী ত্যাগ করে এসেছে। বোধ করি ওর স্বভাব চরিত্র দেখে স্বামী দূর করে' তাড়িয়ে দিয়ে থাক্‌বে।"

বলা বাহুল্য এ কথা আমি কাণে তুলিলাম না ; কিন্তু একদিন আরও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অশ্রাব্য কথা শুনিলাম। সে দিন আমার সহনাতীত হইল।

তাহার পর গুরুদেব দর্শন দিলেন। তিনি আমার স্বামীগৃহত্যাগের কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন—"মা তুমি যে জীবন নির্ব্বাচন করিলে, তাহা একান্ত কঠিন। এ সমুদ্রে যখন ডুব দিলে, তখন গভীরতর গভীর-তম প্রদেশে নামিতে হইবে, নহিলে রত্ন মিলিবে না। শুধু শীকারার্থী হাঙ্গর-কুম্ভীরের দংশনে প্রাণান্ত হইবে। প্রথম অবস্থায় পদে পদে বিপদ।"

তিনি আমাদের বাড়ীতে রহিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে শিখাইবার ভার লইলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়া ফেলিয়া-ছিলাম। সমস্ত দিন এত পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিলাম যে, কলেজের আসন্নপরীক্ষাভীত ছেলেরাও তত পারে না। গুরুদেব আমাকে অধ্যাপনা করিতে করিতে আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। দাদার কাছে আমার প্রশংসা আর তাঁহার ফুরাইত না।

কিন্তু ছোটবউ আমার উপর বড় উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। আমার অদৃষ্টটা বড় মন্দ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিলাম, যেখানেই যাইব, সেইখানেই পরিবারে ঘোর অশান্তির ঝড় বহিবে! দাদা ভালমানুষ, বধূর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না। বধূ তাঁহাকে কি মন্ত্রে কি ঔষধিতে বশীভূত করিয়াছিল বলিতে পারি না, —যেন তাঁহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। দাদার আচার দেখিয়া মনে মনে ভারি ঘৃণা হইত; তাঁহার উপর সেই পূর্ব্বকার ভক্তি আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলাম না। ক্রমে ক্রমে আমার পড়াশুনা পূজার্চ্চনার বিশেষ ব্যাঘাত হইতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে দিবারাত্রি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"বিপদের কাণ্ডারি হরি, আমার কি দুই কূল যাইবে!"

একদিন গুরুদেব আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন—"দেখ, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির বড়ই বিঘ্ন হইতেছে। এ অবস্থায় সংসারাশ্রমে থাকাও ঠিক নয়। আমি বলি কি, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল। জব্বলপুরের নিকট পাহাড়ে নর্ম্মদা নদীর তীরে আমার কুটীর আছে। সেখানে তোমাকে কন্যাবৎ পালন করিব, শিক্ষা দীক্ষার পরম সুযোগ হইবে।"

আমি সম্মত হইলাম। একদিন গভীর রাত্রে, পিতৃতুল্য ঋষিতুল্য গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলাম। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই, গুরুদেবের নিষেধ ছিল। গুরুদেব স্বহস্তে পত্র লিখিয়া সব কথা জানাইয়া শয্যার উপর রাখিয়া গেলেন।

অনেক পথ চলিয়া রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। সে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যাবাস দৃষ্ট হইল না। একটা বিপুল-দেহ বটবৃক্ষ ছিল, তাহার মূলে বসিয়া দুইজনে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। গুরুদেব তাঁহার পোঁটলা হইতে সন্ন্যাসীর উপযোগী গৈরিক বস্ত্রাদি বাহির করিলেন। আমাকে বলিলেন—"বাছা, তুমি এইগুলি পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীবেশ ধারণ কর, নহিলে পথে বিপদ ঘটিতে পারে।"

বলিয়া তিনি আড়ালে সরিয়া গেলেন। আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যসীপুরুষ সাজিলাম। পথে পদার্পণ করিয়াই এই ছলনা! মনটা যেন বিমর্ষ হইল; কিন্তু গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, তখন আর কথা কি?

গুরুদেব শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে আমার পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি ভস্মীভূত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কাঁচি দিয়া আমার চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলাম। গায়ে মাথায়

বিভূতি মাখিলাম। সেই বেশে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার মা যদি আসিয়া আমাকে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনিও চিনিতে পারিতেন না।

সমস্ত দিন পথ চলিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে একস্থানে আসিয়া রেল পাইলাম। রেলে চড়িয়া তৃতীয়দিনে কাশীধামে পৌঁছিলাম।

কাশীতে পাঁচ সাত দিন কাটিল। সমস্ত দিবাভাগ ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কত আনন্দ!

কাশী হইতে প্রয়াগ। প্রয়াগেও কয়েক দিন কাটিল। প্রয়াগ হইতে জব্বলপুরে গমন করিলাম।

জব্বলপুরে নামিয়া গুরুদেবের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কি সুন্দর পার্ব্বতীয় দৃশ্য। কোথাও কোথাও জঙ্গল। দুই একটা বন্যজন্তু বাহির হইয়া চকিতের মধ্যে আবার বনে প্রবেশ করিতেছে। আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনও পর্ব্বতারোহণ করি নাই। পর্ব্বতারোহণ করিতে অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কলনাদিনী নৃত্যপরা নর্ম্মদার তীরে গুরুদেবের আশ্রম গৃহ। সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকটি মহাবলী শালতরু দণ্ডায়মান। পাথরের গাঁথা তিনটি শ্রীহীন কক্ষ। পাহাড়ীরা আসিয়া গুরুদেবকে ও আমাকে ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল! আমি নীরব রহিলাম, গুরুদেব সস্মিতমুখে আশীর্ব্বচন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা তৃণসংগ্রহ করিয়া আনিল। দুইটি কক্ষে আমরা দুইটি শয্যা প্রস্তুত করিলাম। কেহ কেহ বনজাত ফলমূল আনিয়া দিল। একজনকে পল্লী হইতে তণ্ডুলাদি কিনিয়া আনিতে পাঠান গেল।

কয়েকদিন পড়াশুনা পূজার্চ্চনা বেশ চলিল। চারিদিকে যেন শান্তির রাজ্য; কোলাহল নাই, সংসারের শতপ্রকার বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই। সাধন ভজনের পক্ষে এই উপযুক্ত স্থান বটে। কিন্তু এইবার আমি এই আখ্যায়িকার চরম সঙ্কটস্থানে আসিয়াছি। আমার জীবনের গতি ভিন্ন

দিকে কেমন করিয়া ফিরিল, এইবার তাহাই বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

এখন মনে হইতেছে বটে, যাহা হইয়াছিল তাহা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু তখন স্বর্গ আর মর্ত্ত্য রসাতলের মত অন্ধকার ও ভুজঙ্গমসঙ্কুল মনে হইয়াছিল। আমি ফিরিলাম, কিন্তু কি নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া ফিরিলাম! স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি কল্পনায় যে পুণ্যময় প্রভাময় স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, একদিন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধুলায় মিশিয়া গেল। যে গুরুকে দেবতাজ্ঞানে এতদিন পূজা করিলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার ভিতর হইতে পাপের ক্ষুধাশীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

তোমরা স্তম্ভিত হইয়াছ? স্তম্ভিত হইবার কথা বটে। মানুষকে কখনও বিশ্বাস করিও না। যে যত বড় জ্ঞানী, যত বড় ধার্ম্মিক, যত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হউক, বিশ্বাস করিও না। পুরাণে যে মহামহা ঋষি-তপস্বীর পদস্খলনের বর্ণনা আছে, তাহার এক কণিকামাত্র অতিরঞ্জন নহে। যখন আমার পিত্রালয়ে গুরুদেব সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা ধরিয়া আমার অন্তরে জ্ঞানামৃত সঞ্চার করিতেন, আমি কি জানিতাম যে, আমি ততক্ষণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে কুবাসনার বিষকীটের সঞ্চার করিতেছি? তিনি যখন আমাকে বলিলেন,—"বৎসে, এখানে তোমার সাধন ভজনাদির ব্যাঘাত হইতেছে, আমার সঙ্গে আমার আশ্রমে চল", তখন যদি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম, তবে, সুপ্তিভঙ্গে শয্যাশিয়রে সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, আমি কি সেইরূপ চমকিত হইতাম না? আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি; আমার যাহা হইয়াছে তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার অবস্থাটা স্মরণ করিলে চক্ষে জল আসে। সারা জীবনের তপস্যা তিনি

আমার পায়ে ঢালিয়া দিলেন! মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তাঁহার এই দুর্দ্দশার জন্য আমিই আংশিকরূপে দায়ী কি না। আমার কি দোষ? আমি কিসের জন্য দায়ী হইব?

কিন্তু হয়ত আমি তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছি। গুরু স্বভাবতঃ নীচ বা কুপ্রবৃত্তিশালী নহেন, আমি তাহার শতসহস্র প্রমাণ পাইয়াছি। হয়ত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। ঘটনাক্রমে মুহূর্ত্তের প্রলোভনে তিনি হয়ত আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার হইতেও ইহাই অনুমান করা সঙ্গত। শুনিতে পাই তিনি সে আশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার সন্ন্যাসীবেশকে ভণ্ডামি জ্ঞান করিয়া তাহাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন নাকি বাহ্যাড়ম্বরহীন সাধুতার জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত আছেন।

আর একবার তোমাদের নিকট আমাকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইল। সে ঘটনাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। শুধু তাহার পরিণাম মাত্র বলি। একদিন গভীর রাত্রে, যে গুরুদেবের হস্ত ধারণ করিয়া পিতৃগৃহ হইতে অপসৃত হইয়াছিলাম, সেই জব্বলপুরের পাহাড়ে আর একদিন গভীর রাত্রে—গুরুদেব আর বলিব না—সেই গুরুদানবকে গর্ব্বিত পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া স্বীয় অমূল্য সতীত্ব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার ভুল ভাঙ্গিল!

তৃতীয় দিন রাত্রি দুইটার সময় জামালপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখনও আমার অঙ্গে সেই পূর্ব্বধৃত সন্ন্যাসীপুরুষের বেশ।

রাত্রি আছে দেখিয়া আমি মোসাফিরখানায় বসিয়া রহিলাম। আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই জামালপুর ষ্টেশনে দাদার সঙ্গে গাড়ীতে উঠি। তাহার পর হইতে আর স্বামীর কোনও সংবাদ পাই নাই। তিনিও আমার কোনও

সংবাদ লন নাই—যদি গোপনে লইয়া থাকেন তবে আমি জানি না। এত দিন. কি আর তিনি বিবাহ করেন নাই? বিবাহ না করিলেও, আমাকে যে গ্রহণ করিবেন, তাহার কি সম্ভাবনা আছে? তিনি কি আমার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করিবেন? তিনি যদি করেন, তবে আমার শ্বাশুড়ী বিশ্বাস করিবেন কেন? যদি শ্বাশুড়ীও বিশ্বাস করেন, তবে পাঁচজনে বিশ্বাস করিবে কেন? এই পাঁচজনের জন্যই ত রামচন্দ্র সতীকুলের আরাধ্যা দেবী সীতাসুন্দরীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তবে কি আমি তাঁহার সংসারের দাসী হইয়াও থাকিতে পাইব না? না হয় আত্মপরিচয় দিব না। আর একবার বনে যাইব। বনে গিয়া এ পোড়ামুখ আগুন দিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিব। ক্ষত শুষ্ক হইলে আমার মুখ বিকৃত হইবে; কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তখন আসিয়া স্বামীর সংসারে দাসী হইব। যদি না রাখেন?—আমি বলিব, "আমি অর্থ চাহিনা, শুধু একবেলা দুইটি খাইতে দিও। আমি ভিখারিণী, আমায় দয়া কর।" ইহাতেও কি দয়া হইবে না? আমার স্বামীর দয়ার শরীর। আমার শ্বাশুড়ীরও সেইরূপ।—আর যদি দেখি বিবাহ করেন নাই? ছদ্মবেশে থাকিয়া কৌশলে মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশ করিব। তাহার পর কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। দাদার বাড়ী আর ফিরিব না। বউ পোড়ারমুখী বাঁচিয়া থাকিতে নয়। কোনও উপায় না হয়, মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইব। সে ত আর কেহ রোধ করিতে পারিবে না!

ফর্সা হইল। আমি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া ষ্টেশন ছাড়িলাম। বৈদ্যপাড়ায় সদর রাস্তার ধারেই আমাদের বাড়ী। চিনিয়া চিনিয়া গেলাম। বাড়ীর বাহিরেই দুইটা ঘোড়ানিমের গাছ ছিল, বাড়ী চিনিতে

কষ্ট হইল না। কাছাকাছি গিয়া দেখিলাম, সদর দরজা খোলা ; একটা হিন্দুস্থানী ছেলে, পিতলে ঘড়া মাথায় করিয়া বাহির হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার শ্বশ্রূদেবী নামাবলী গায়ে জড়াইয়া, হরিনামের মালা হাতে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা. বুঝিলাম মা ভোরের গাড়ীতে মুঙ্গেরে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। গাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।

মা দৃষ্টিপথের বাহির হইলে, সাহসে ভর করিয়া বাড়ী ঢুকিলাম। শরীর কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, কই, কোথাও ত নোলকপরা একটি নববধূ দেখিতে পাইলাম না। স্বামী তখন শয্যা-ত্যাগ করিয়া বাহির হইতেছেন। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। হায়, আমার কপালে এতও ছিল! আমি মনে মনে তাঁহার পায়ে সহস্রবার মাথা খুঁড়িলাম।

তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। মাঝে মাঝে কৌতূহলপূর্ণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাহিতেছিলেন! আমি সাবধানে চাপা গলায় বিকৃত স্বরে কথা কহিতে লাগিলাম। স্ত্রী এখানে নাই কেন, কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার উত্তর পাইলাম না, চাপিয়া গেলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তায় জানিলাম, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁহার চক্ষুর কোণে করুণার জলরেখা দেখা দিল ;—বুঝিলাম এ পোড়ারমুখীকে এখনও ভুলেন নাই। কতবার মনে করিলাম, আত্মপ্রকাশ করি কিন্তু পারিলাম না। ভাবিলাম শাশুড়ী আসুন, তাহার পর যাহা হয় হইবে।

স্বামী স্নান করিয়া, পাশের মেসের বাসায় আহার করিয়া, আফিসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা দশটার গাড়ীতে মা ফিরিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসীর সেবাদি সম্বন্ধে মাকে গোপনে কিছু বলিয়া স্বামী আফিসযাত্রা

করিলেন। একে পূর্ণিমা—পুণ্যাহ;—বাড়ীতে সন্ন্যাসীকে অতিথি লাভ করিয়া মা যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

এই সময় দাই চলিয়া গেল; বাড়ী নির্জ্জন হইল। আমি বুঝিলাম এই শুভ সুযোগ উপস্থিত। বলিলাম স্নান করিব, তোমাদের একখানা কাপড় দাও।

স্নানান্তে সেই কাপড়খানিকে শাড়ীর মত করিয়া পরিলাম। ঘোমটা দিয়া স্নানের স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মা নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া থাকিবেন—ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার মুখ আমি দেখি নাই। শুধু পা দুখানি দেখিতে পাইতে-ছিলাম,—ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিলাম।

মা বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, ওমা, ওমা—সন্ন্যাসী না পাগল?" বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে আমার অবগুণ্ঠন অপসৃত করিলেন। চোখোচোখী হইবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন—রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন—"একি! বউমা!!"

কেমন করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা আদ্যো-পান্ত নিবেদন করিলাম, তাহা আর বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে বিস্ময়ে তাঁহার মুখে কথা বাহির হইল না। তাহার পর আমার সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বুকে টানিয়া লইয়া স্নেহভরে বারম্বার আমার মুখচুম্বন করিলেন। শেষে বলিলেন,—"বাছা, ছেলে বাড়ী আসুক, নইলে আমি কিছুই বল্‌তে পার্‌ছিনে।"

বলিলেন, গুরুর সঙ্গে আমার পিতৃগৃহত্যাগের সংবাদমাত্র তাঁহারা পান নাই।—সুতরাং "পাঁচজন" সম্বন্ধে আর কোনও আশঙ্কা রহিল না। কিন্তু তথাপি বাড়ীতে লোকজন আসিয়া পাছে আমায় দেখিয়া ফেলে, পাছে কিছু সন্দেহ করে, সেই জন্য তিনি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

শ্বাশুড়ী ক্ষমা করিলেন ;—স্বামীর সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর্সি চিরুণী লইয়া সমস্তদিন স্বল্পাবশিষ্ট চুলের জটা ছাড়াইলাম। দুইখানা চিরুণী ছিল, দুইখানারই প্রায় সব কটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল।

সেই পূর্ণিমারজনীতে স্বামীর সঙ্গে আমার সুখসম্মিলন হইল। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিয়া থাক, তবে এইবার আমার কল্যাণে শাঁখ বাজাইয়া দাও।

দেবী

সে আজ কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসরের কথা।

পৌষমাসের দীর্ঘরজনী আর কিছুতেই পোহাইতে চাহে না। উমাপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেপের ভিতর অনুসন্ধান করিল, স্ত্রী নাই। বিছানা হাতড়াইয়া দেখিল তাহার ষোড়শী পত্নী এক পাশে গুটিসুটি হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সরিয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে তাহার গায়ে লেপখানি চাপাইয়া দিল। পাশে পায়ের দিকে হাত দিয়া দেখিল কোথাও ফাঁক বহিতেছে কি না।

উমাপ্রসাদ বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মা নাই;— পিতা পরম পণ্ডিত, পরম ধাম্মিক নিষ্ঠাবান শক্তি-উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই। অনেকের বিশ্বাস, উমাপ্রসাদের পিতা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ তাঁহাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই নূতন। স্ত্রীর নাম দয়াময়ী।

স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পত্নীর মুখচুম্বন করিল!

হায়, শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রপিতামহগণের তরুণবয়স্ক পিতা-মাতাগণ, অসার অপদার্থ আমাদেরই মত 'এমনি চঞ্চল মতি গতি' ছিলেন। অত বড় শাক্ত পরিবারের সন্তান হইয়াও উমাপ্রসাদ সে পর্য্যন্ত একদিনও স্ত্রীর নিকট মুদ্রাপ্রকরণ বা মাতৃকান্যাসের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই এবং যমনিয়মাদি সম্বন্ধে তাহাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখিয়াছিল।

নানা কথার পর উমাপ্রসাদ বলিল—"দেখ, আমি পশ্চিমে চাকরি করতে বেরুব।"

দয়া বলিল—"তোমার আবার চাকরি কেন? তোমার কিসের দুঃখ? জমিদারের ছেলে হয়ে কেউ চাকরি করে না কি?"

"আমার এখানে দুঃখ আছে বৈ কি।"

"কি?"

"তুমি যদি আমার দুঃখ বুঝবে তা হলে আর আমার দুঃখ কিসের!"

শুনিয়া দয়া ভারি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিল, কি দুঃখ?—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু দুষ্টামি বুদ্ধি আসিল। বলিল "তোমার কি দুঃখ? আমি বুঝি মনের মত হইনি?" দয়া জানিত এ কথা বলিলে উমাপ্রসাদকে আঘাত করা হইবে।

উমাপ্রসাদ প্রিয়ামুখে অজস্র চুম্বনবর্ষণ করিয়া এই আঘাতের প্রতিশোধ লইল। পরে বলিল—

"আমার দুঃখ তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব, সারাদিন সারারাত।"

যেরূপ নিয়মিত তালে দয়াময়ীর নিশ্বাস বহিতেছিল, সহসা তাহার ব্যতিক্রম হইল। উমা জানিল স্ত্রী জাগিয়াছে। মৃদুস্বরে ডাকিল—"দয়া"।

দয়া বলিল—"কি"। "কি" টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

"তুমি বুঝি জেগে রয়েছ?"

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—"না ঘুমচ্ছিলাম।"

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বলিল—"ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে?"

দয়া তখন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠ্‌লাম।"

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল—"এখন কখন? ঠিক কোন্ সময়?"—উমা ভারি দুষ্ট।

"কোন সময় আবার?—সেই তখন!"

"কখন?"

"যাও আমি জানিনে।" বলিয়া দয়া স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা করিল।

ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল "সেই যখন তুমি"—বলিয়া থামিল।

"আমি কি কর্‌লাম?"

দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—"সেই যখন তুমি আমায় চুমু খেলে;—হল! মাগো মা! এত জান!"

তখনও এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে। দুজনে কত কথা আরম্ভ হইল। অধিকাংশ কথারই না আছে মাথা না আছে মুণ্ড।

"চাকরি কর্‌বে ত সারাদিন আমাকে নিয়ে থাক্‌বে কেমন করে? আমাকে ত একলা ফেলে তুমি কাছারি চলে যাবে!"

"কাছারি গিয়ে খুব শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে আস্‌ব।"

দয়া ভাবিয়া দেখিল, তা হইতে পারে বটে। কিন্তু বাধা বিপত্তি যে অনেক।

"তুমি ত নিয়ে যাবে, সবাই যেতে দেবে কেন?"

"এখান থেকে কি নিয়ে যাব? যখন শুন্‌ব তুমি বাপের বাড়ী রয়েছ, তখন চুপি চুপি এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

শুনিয়া দয়া হাসিল। এও কি সম্ভব না কি?

"কতদিন আমরা থাক্‌ব সেখানে?"

"অনেক বচ্ছর থাক্‌ব।"

দয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল, সহসা একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। বলিল—"খোকাকে ফেলে কি অনেক বচ্ছর আমি বিদেশে থাক্‌তে পার্‌ব?"

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গালে গাল রাখিয়া কাণের কাছে বলিল—"তত-দিন তোমারও একটি খোকা হবে।" কথাটি শুনিয়া দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

উল্লিখিত খোকাটি উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। স্বয়ং উমাপ্রসাদ এ বাটীর শেষ খোকা। এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসন বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর; খোকা বাড়ীশুদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। খোকার মা হরসুন্দরী,—তাঁর ত আর গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

দয়া সহসা বলিল—"আজ এখনো খোকা এল না যে?"—

ভোর রাত্রে রোজ খোকা কাকীমার কাছে আসে। এটি তার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। যদিও বাটীতে দাসদাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহকার্য্যের অধিকাংশ দয়া স্বহস্তে করিত। বিশেষতঃ তাহার শ্বশুরের পূজাহ্নিক সম্পর্কীয় যাহা কিছু কার্য্য তাহাতে দয়া ছাড়া অপর কাহারও হস্তস্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। সারাদিন এই সমস্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খোকাকে সে একমুহূর্ত্তও চক্ষের আড়াল করিত না। কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল না পরাইয়া দিলে খোকা কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে,—ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা কাকীমা বলিয়া কান্না যুড়িয়া দেয়। এই প্রগল্‌ভতা, এই অন্যায় আবদারের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে হরসুন্দরীর নিকট হইতে চড়টা চাপড়টা পুরস্কার পাইতে হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাহাতে কান্না না থামিয়া আরও দশগুণ বাড়িয়া উঠে। তখন হরসুন্দরী তাহাকে কোলে করিয়া, ক্রোধে ও নিদ্রাঘোরে টলিতে টলিতে দয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া ডাকেন—"ছোট বউ ও ছোট বউ, এই নে তোর খোকাকে।" বলিয়া, দয়ার দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে. না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, "কে মেরেছে, কে মেরেছে" বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথার শিয়রে পাণের ডিবায় কোনও দিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন নারিকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকিত, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়। আজ এখনও খোকা

আসিল না বলিয়া দয়া কিছু উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল—"বাছার অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বোধ হয় এখনও রাত্রি আছে। দেখি দাঁড়াও।"

উমাপ্রসাদ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালা খুলিল। বাহিরে আম ও নারিকেল বৃক্ষবহুল বাগান। তখনও চন্দ্রাস্ত হয় নাই,—কিন্তু অধিক বিলম্বও নাই। দয়া নিঃশব্দে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। বলিল—"রাত আর বেশী কই?"

শীতের হিমবায়ু হু হু করিয়া জানালা-পথে প্রবেশ করিতে লাগিল। তবু দুজনে সেই অল্পালোকে পরস্পরের পানে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহাদের চক্ষু যে উপবাসী ছিল!

দয়া বলিল—"দেখ, আজ আমার মনটা কেমন হয়ে গেছে। খোকা এখনও এল না। কি জানি কেন মনটা এমন হয়ে গেল।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখনও খোকার আসবার সময় হয়নি। যে দিন ঘুমিয়ে পড়ে সে দিন ত আসতে দেরীও হয়। তোমার মন সে জন্যে খারাপ হয়নি। কেন হয়েছে আমি জানি।"

"কেন বল দেখি?"

"বলেছি কি না আমি পশ্চিমে যাব চাক্‌রি কর্‌তে, তাই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।"—বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে নিজের আরও কাছে টানিয়া লইল।

দয়া একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। মনে হচ্চে যেন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

বাহিরে জ্যোৎস্না নিরতিশয় ম্লান। পত্নীর কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদের মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল। গাছপালা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। জানালা বন্ধ করিয়া উভয়ে শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে একটা আধটা পাখীর ডাক শোনা গেল। পরস্পরের বক্ষোনিবদ্ধ হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে জানালার রন্ধ্রপথে প্রভাতের আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে লাগিল। তখনও দুইজনে নিদ্রাভিভূত।

সহসা বাহির হইতে উমাপ্রসাদের পিতা ডাকিলেন,—"উমা"।

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল দয়ার। সে গা ঠেলিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

কালীকিঙ্কর আবার ডাকিলেন,—"উমা"। স্বরটা কম্পিত, যেন অন্যরূপ, ইহা যে তাঁহারই কণ্ঠস্বর তাহা যেন কষ্টে বুঝা গেল।

এত ভোরে পিতা ত কখনও ডাকেন না। আর তাঁহার স্বরই বা এমন হইল কেন?—তবে সত্য সত্যই খোকার কিছু অসুখ বিসুখ করিয়াছে বুঝি! উমাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

দেখিল পিতার পরিধানে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, স্কন্ধে নামাবলী উত্তরীয়, গলে রুদ্রাক্ষমাল্য লম্বমান। এ কি! এত ভোরে তাঁহার পূজার বেশ কেন? অন্য দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া তবে তিনি পূজার বেশ পরিধান করেন। মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এই চিন্তা পরম্পরা উমাপ্রসাদের মস্তকে উদিত হইল।

দ্বার খুলিবামাত্র কালীকিঙ্কর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, ছোট বউমা কোথায়?"

স্বর পূর্ব্ববৎ কম্পিত। উমাপ্রসাদ কক্ষের চারিদিকে চাহিল। দয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, কিছুদূরে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

কালীকিঙ্করও সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন। বধূকে দেখিতে পাইবামাত্র, নিটবর্ত্তী হইয়া তাহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

উমাপ্রসাদ বিস্ময়ে বাক্যহীন। দয়াময়ী শ্বশুরের এই অদ্ভুতাচরণ দেখিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণামান্তে কালীকিঙ্কর বলিলেন—"মা, আমার জন্ম সার্থক হল। কিন্তু এতদিন কেন বলিস্‌নি মা ?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা—বাবা !"—কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা ইঁহাকে প্রণাম কর।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"বাবা!—আপনি কি উন্মাদ হয়েছেন ?"

"উন্মাদ হইনি বাবা! এতদিন উন্মাদ ছিলাম বটে। আজ আরোগ্য-লাভ করেছি, সেও মার কৃপায়।"

উমাপ্রসাদ পিতার কথার কিছুই অর্থগ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল—"বাবা! আপনি কি বল্‌ছেন ?"

কালীকিঙ্কর বলিলেন—"বাবা! আমার বড় সৌভাগ্য। যে কুলে জন্মেছি তা পবিত্র হ'ল। বাল্যকালে কালীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, এত দিন যে সাধনা, যে আরাধনা কর্‌লাম, তা নিষ্ফল হয়নি। মা জগন্ময়ী কৃপা করে ছোট বউমার মূর্ত্তিতে আমার গৃহে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়েছেন। গত রজনীতে স্বপ্নযোগে আমি এই প্রত্যাদেশ পেয়েছি। আমার জীবন ধন্য হ'ল।"

* * * *

* * * *

দয়াময়ী ছিল মানবী—সহসা দেবীত্বে অভিষিক্ত হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এই দিবসত্রয়ে এ সংবাদ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশে-পাশের বহু

গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া প্রসিদ্ধ শাক্ত-জমিদার কালীকিঙ্কর রায়ের বাটীতে দয়াময়ী-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে দর্শন করিয়া গিয়াছে।

দয়াময়ীর রীতিমত পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ধূপ দীপ জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা হয়। এ কয়দিনে দয়াময়ীর সম্মুখে বহুসংখ্যক ছাগবলি হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এ তিন দিন দেবতার পূজা পাইয়াও দয়াময়ী কেবল কাঁদিতেছে। আহার নিদ্রা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনায় তাহাকে এমন অভিভূত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে দুই দিন আগে এ বাটীর বধূ ছিল, শ্বশুর ও ভাসুরের সাক্ষাতে বাহির হইত না, এ সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। এখন আর তাহার মুখে অবগুণ্ঠন নাই,—যাহার তাহার পানে শূন্য-দৃষ্টিতে পাগলিনীর মত চাহিয়া থাকে। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছে, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি ফুলিয়াছে, বেশবাস সুসম্বৃত নহে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পূজার ঘরে একটি কোণে ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। পুরু কম্বলের বিছানায় রেশমী বস্ত্রের আবরণ, তাহার উপর দয়াময়ী শয়ন করিয়া আছে। গায়ে একখানি মোটা শাল। দুয়ার বন্ধ ছিল মাত্র, অর্গলিত ছিল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে দুয়ার খুলিতে লাগিল। চোরের মত সন্তর্পণে উমাপ্রসাদ প্রবেশ করিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া খিল দিল।

উমাপ্রসাদ দয়াময়ীর বিছানায় আসিয়া বসিল। সে দিন উষাকালের ঘটনার পর স্ত্রীর সহিত এই তাহার প্রথম নিভৃত সাক্ষাৎ।

দয়াময়ী জাগিয়া ছিল, স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া? একি হ'ল ?"

আঃ—আজ তিন দিনের পর দয়া স্বামীর মুখে একটি স্নেহমাখা

কথা শুনিল। এ তিন দিন কাল ভক্তগণের 'মা মা' শব্দে তাহার হৃদয়-দেশ মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর মুখনিঃসৃত এই আদরের বাণী তাহার প্রাণে যেন অকস্মাৎ সুধাবৃষ্টি করিয়া দিল। দয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

উমাপ্রসাদ স্ত্রীর গায়ের শাল মোচন করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। উচ্ছ্বসিতস্বরে বারংবার বলিতে লাগিল—"দয়া! একি হ'ল—একি হ'ল?"

দয়া নির্ব্বাক্।

উমাপ্রসাদও কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। তারপরে বলিল—"দয়া! তোমার কি মনে হয় যে এ কথা সত্যি? তুমি আমার দয়া নও, তুমি দেবী?"

এইবার দয়া কথা কহিল,—বলিল—"না, আমি তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কিছু নই, আমি তোমার দয়া ছাড়া আর কিছু নই,—আমি দেবী নই—আমি কালী নই।"

এই কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ সাগ্রহে স্ত্রীর মুখচুম্বন করিল। বলিল—"দয়া! তবে চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। এমন কোনও দূরদেশে গিয়ে থাক্‌ব, যেখানে কেউ আর আমাদের সন্ধান পাবে না।"

দয়া বলিল—"তাই চল। কিন্তু কি উপায়ে যাবে?"

উমাপ্রসাদ বলিল—"সে সমস্ত আমি ঠিক কর্‌ব, কিছু সময় যাবে।"

দয়া বলিল—"কবে? কবে? শীগ্‌গির ঠিক কর—নইলে বেশী দিন আমি বাঁচ্‌ব না। আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যদি মৃত্যুও না হয়, তবে আমি পাগল হয়ে যাব।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"না দয়া!—তুমি কিছু ভেবো না। দিন সাত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আজ শনিবার। আগামী শনিবার রাত্রে

তোমার কাছে আস্‌ব আবার—তোমাকে নিয়ে গৃহত্যাগ করব। এই সাত দিন তুমি আশায় বুক বেঁধে কাটিয়ে দাও, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার।"

দয়া বলিল—"আচ্ছা।"

উমাপ্রসাদ বলিল—"এখন তবে যাই, কেউ আবার এসে না পড়ে"—বলিয়া সে পত্নীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইল।

পরদিন প্রভাতে, দয়াময়ীর পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রামের একজন অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোটরান্তর্গত চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। আসিয়াই, দয়াময়ীকে দেখিয়া গলবস্ত্র হইয়া তাহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—"মা! আমি চিরকাল তোমায় পূজো করে এসেছি। আজ আমার বড় বিপদ মা! আজ ভক্তকে রক্ষা কর।"

দয়াময়ী বৃদ্ধের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। পুরোহিত বলিলেন—"কেন দাদা! তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আমার নাতিটি কয়দিন জরবিকারে ভুগ্‌ছিল। আজ সকালে কব্‌রেজ জবাব দিয়ে গেছে। সে না বাঁচ্‌লে আমার বংশলোপ হবে, আমার ভিটেয় সন্ধে দেবার আর কেউ থাক্‌বে না। তাই মার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

কালীকিঙ্কর চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন, তিনি বৃদ্ধের দুঃখে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া দয়াময়ীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা গো! বুড়োর নাতিটিকে বাঁচিয়ে দিতে হবে মা"—বলিয়া তিনি বৃদ্ধকে বলিলেন—"দাদা! তোমার নাতিকে এনে মার পায়ের কাছে ফেলে রাখ, যমের বাবার সাধ্য হবে না এখান থেকে নিয়ে যেতে।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মহা আশ্বস্ত হইলেন। যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

একদণ্ডকাল পরে বিধবা পুত্রবধূর কোলে নাতিটির সহিত বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিলেন। দয়াময়ীর পদতলে বিছানা করিয়া মৃতকল্প শিশুটিকে রাখা হইল। কেবল মাঝে মাঝে চরণামৃতের পাত্র হইতে কুষি করিয়া একটু একটু চরণামৃত লইয়া পুরোহিত তাহার মুখে দিতে লাগিলেন।

শিশুর মাতা বিধবা যুবতী দয়াময়ীর সখী। তাহার ব্যথাকাতর মুখ দেখিয়া দয়াময়ীর হৃদয় ব্যথিত হইল। শিশুটির পানে চাহিয়া দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু ভরিল। একান্ত মনে দেবতাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, আমি দেবতা হই, কালী হই, মানুষ হই, যেই হই—এই ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর।"

দয়াময়ীর চক্ষে অশ্রু দেখিয়া সকলে বলিয়া উঠিল—"জয় মা কালী, জয় মা দয়াময়ী, মায়ের দয়া হয়েছে—মায়ের চোখে জল।" কালীকিঙ্কর দ্বিগুণ ভক্তির সহিত চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর ততই ভাল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মত প্রকাশ করিলেন, আর শিশুর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই, স্বচ্ছন্দে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দয়াময়ীর দেবীত্ব আবিষ্কারের সংবাদ যত না শীঘ্র চৌদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহার কৃপায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষার সংবাদ অধিক সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতেই অপর একজন আসিয়া দয়াময়ীর চরেণে নিবেদন জানাইল যে, তাহার কন্যাটি আজ তিন দিন হইতে প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির,—মেয়ে বুঝি বাঁচে না। কালীকিঙ্কর বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি? মার চরণামৃত নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পান করিয়ে দাওগে। এখনি আরাম হবে।"

সে ব্যক্তি গলদশ্রুলোচনে দয়াময়ীর চরণামৃতের পাত্রটি মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল। বেলা এক প্রহর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল, মেয়েটি চরণামৃত পান করিবার অব্যবহিত পরেই নিরাপদে রাজপুত্রের মত সুন্দর সুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

আজ শনিবার। আজ উমাপ্রসাদ স্ত্রীকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিবে। সে সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ কিম্বা রাজমহল কিম্বা বর্দ্ধমান এরূপ কোনও নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থানে সে যাইবে না;—যাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। নৌকাপথে পশ্চিম যাইবে। অনেক দূর যাইবে;—কোথায় এখনও তাহার কিছু স্থিরতা নাই। হয় ভাগলপুর নয় মুঙ্গের। সেখানে চাকরির চেষ্টা করিবে। পথ খরচের মত অর্থ তাহার নিকট আছে। তাহার স্ত্রীর গায়ে যাহা অলঙ্কার আছে, তাহা বিক্রয় করিলে কোন্ না দুই বৎসর উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারিবে? দুই বৎসরেও কি তাহার একটা চাকরি যুটিবে না? নিশ্চয় যুটিবে। চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে নাকি?

এইরূপ নানা চিন্তায় উমাপ্রসাদ দিবাভাগ অতিবাহিত করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আজ সে দয়াময়ীর আরতি দেখিবে। এক দিনও ত দেখে নাই। যখন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া যায়, পূজা আরম্ভ হয়, তখন উমাপ্রসাদ বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করে। আজ দয়াময়ীর শেষ আরতি, আজ সে দেখিবে। দেখিবে আর মনে মনে হাসিবে। কল্য প্রভাতে পুরোহিত ঠাকুর যখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দেখিবেন যে দেবী অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহাই উমাপ্রসাদ কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত। গৃহস্থ সকলে নিদ্রাগত। চোরের মত উমাপ্রসাদ শয্যাত্যাগ করিল। অন্ধকারে ধীরপদে পূজার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে দ্বার মোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কোণে সেইরূপ ঘৃতদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দয়াময়ীর শয্যায় উমাপ্রসাদ গিয়া বসিল। দয়াময়ী নিদ্রামগ্ন।

প্রথমে উমাপ্রসাদ সস্নেহে দয়াময়ীর মুখচুম্বন করিল। পরে গা ঠেলিয়া তাহাকে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গে দয়াময়ী ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

উমাপ্রসাদ বলিল—"দয়া—এত ঘুম? ওঠ, চল।"

দয়া বিস্মিতের মত বলিল—"কোথায়?"

"কোথায়?—যাবার সময় তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কোথায়?—চল, আজ রাত্রে নৌকো করে আমরা পশ্চিমে চলে যাই।"

দয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল। উমাপ্রসাদ বলিল—"ওঠ—ওঠ, পথে গিয়ে ভেবো এখন। সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। চল চল।"

এই কথা বলিয়া উমাপ্রসাদ স্ত্রীর হস্তধারণ করিল।

দয়া সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"তুমি আর স্ত্রীভাবে আমাকে স্পর্শ করো না। আমি যে দেবী নই, আমি যে তোমার স্ত্রী, তা আর আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারিনে।"

কথাটা শুনিয়া উমাপ্রসাদ হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দয়াময়ী সহসা তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া দূরে বসিল। বলিল—"না না, হয়ত তোমার অকল্যাণ হবে।"

এ কথায় উমাপ্রসাদ যেন বজ্রাহত হইল। বলিল—"দয়া, তুমিও পাগল হলে?"

দয়া বলিল—"তবে এত লোকের রোগ আরাম হল কেন ? তা হলে কি দেশশুদ্ধ লোক পাগল ?"

উমাপ্রসাদ অনেক করিয়া বুঝাইল। অনেক অনুনয় করিল। অনেক কাঁদিল। দয়াময়ীর মুখে কেবল সেই কথা—"না না, তোমার অকল্যাণ হবে। হয় ত আমি তোমার স্ত্রী নই, হয় ত আমি দেবী।"

শেষকালে উমাপ্রসাদ বলিল—"তুমি দেবী হলে এমন পাষাণী হতে না। এততেও তোমার মন অচল অটল রইল ?"

দয়াময়ী এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তুমি আমাকে বুঝ্‌তে পারলে না।"

উমাপ্রসাদ দয়ামীয়র শয্যা ত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্ষিপ্তের মত সেই কক্ষে অস্থিরভাবে পদচারণা করিয়া বেড়াইল। পরে হঠাৎ দয়াময়ীর কাছে আসিয়া বসিল—"দয়া, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছিল ?"

দয়া বলিল—"তা হয়েছিল বৈ কি !"

"তুমি যদি দেবী, তুমি যদি কালী, আমি ত তা হলে মহাদেব, নইলে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হল কি করে ?"

এ কথার দয়া কি উত্তর দিবে ? সে চুপ করিয়া রহিল।

উমাপ্রসাদ আবার আরম্ভ করিল—"তুমি যদি আদ্যাশক্তি ভগবতী হও—তবে নরলোকে কার সাধ্য যে তোমাকে বিবাহ করে ? আমি যে তোমাকে বিবাহ করেছি, এত দিন যে আমি তোমার স্বামীর আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি, এতেই ত বোঝা যাচ্ছে যে আমিও মানুষ নই,—আমিও দেবতা, আমি স্বয়ং মহেশ্বর !"

দয়াময়ী বলিল—"যদি তাই হয়, তবে আমি তোমার স্ত্রী। দেবী হই, মানুষ হই, আমি তোমার স্ত্রী।"

এ কথা শুনিয়া উমাপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্ত্রীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। বলিল—"চল, তবে আমরা যাই। এখানে যত দিন থাক্‌ব, ততদিন তোমায় আমায় বিচ্ছেদ থাক্‌বে।"

দয়াময়ী বলিল—"তবে চল।"

* * * *

খানিকটা হাটিয়া গঙ্গার ধারে পৌছিয়া নৌকা চড়িতে হইবে। কিন্তু কিছু দূর চলিয়া দয়া সহসা থামিয়া আবার বলিল, "আমি যাব না।" এবার স্বর অত্যন্ত দৃঢ়। উমাপ্রসাদ আবার অনুনয়ের সাধ্য-সাধনার পালা আরম্ভ করিল। কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। দয়া বলিল; "আমি যদি দেবী, তুমি আমার স্বামী মহেশ্বর, তবে দুজনেই এখানে থাকি, দুজনেই পূজা গ্রহণ করি, পালাব কেন? এত জনের ভক্তিতে আঘাত দেব কেন? আমি পালাব না, চল ফিরে যাই।"

উমাপ্রসাদ মর্ম্মাহত হইয়া বলিল,—"তুমি একা ফিরে যাও, আমি যাব না।"

তাহাই হইল। দয়া একা দেবীত্বে ফিরিয়া গেল। উমাপ্রসাদ সেই নিশীথ-অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, পরদিন তাহার আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

দয়াময়ীর দেবীত্বে সকলেই বিশ্বাসবান্, কেবল বিশ্বাস করে নাই তাহাদের বড়বধূ হরসুন্দরী—খোকার মা। প্রথম দুই চারি দিন তাই বড়বধূই দয়াময়ীর জুড়াবার ঠাঁই হইয়াছিলেন। প্রথমে যখন স্বয়ং দয়াময়ীই বিশ্বাস করিতে চাহে নাই যে সে দেবী, তখন সে একদিন বড়বধূর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল.—"দিদি, আমার এ কি হল?" তিনি বলিয়াছিলেন—"কি কর্‌বো বোন্, ঠাকুর পাগল হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বয়সে ওনার ভীমরতি ধরেছে।"

উমাপ্রসাদের নিরুদ্দেশের পর দুই সপ্তাহ গেল। তৃতীয় সপ্তাহে খোকার জর হইল। দিন দিন ছেলে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বৈদ্য আসিল, কিন্তু কালীকিঙ্কর তাহাকে চিকিৎসা করিতে দিলেন না। বলিলেন—"আমার বাড়ীতে স্বয়ং মার অধিষ্ঠান, কত কত দুঃসাধ্য রোগ মার চরণামৃত পান করে ভাল হয়ে গেল, আর আমার বাড়ীতে রোগ হলে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করবে?"

বড়বধূ নিজ স্বামী তারাপ্রসাদের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—"ওগো ছেলেকে বদ্দি দেখাও গো, নইলে আমার ছেলে বাঁচ্‌বে না। ও রাক্কুসি ডাইনি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পার্‌বে না। ওর কি সাধ্যি!"

তারাপ্রসাদ অত্যন্ত পিতৃভক্ত। পিতার বিশ্বাস, পিতার বিধান, এ সমস্ত তিনি বেদের মত মান্য করেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"খবরদার, ও কথা বোলো না, ছেলের অকল্যাণ হবে। মা যা করবেন তাই হবে।"

কিন্তু বড়বধূর প্রতিদিনকার কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দনে কর্ত্তা এক দিন গলবস্ত্র হইয়া দয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা খোকার যে ব্যারাম হয়েছে, তাতে বৈদ্য দেখাবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?"

দয়াময়ী বলিল—"না, আমিই ওকে ভাল করে দেব।"

কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত হইলেন। তারাপ্রসাদও নিশ্চিন্ত হইলেন।

খোকার মা এক দিন একটি বিশ্বস্ত ঝিকে কবিরাজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—যাহা কিছু রোগের বিবরণ সব বলিয়া দিলেন। ঔষধ চাই। কবিরাজ মহাশয় এ প্রস্তাব শুনিয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—"মাঠাকুরুণকে বলিস্, যখন স্বয়ং শক্তি বলেছেন তিনিই খোকাকে আরোগ্য করে দেবেন, তখন আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে অপরাধী হতে পারব না।"

যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই খোকার মা কাঁদিয়া বলেন—"ওগো কিছু ওযুদ বলে দাও, আমার ছেলে বাঁচে না।" সকলেই বলে—"ওমা ও কথা বোলো না, তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে স্বয়ং আদ্যাশক্তি বিরাজ কর্ছেন।"

খোকার ব্যারাম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। দয়া বলিল, "খোকাকে এনে আমার কোলে দাও।"

খোকাকে কোলে করিয়া দয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিল। খোকা অনেকটা ভাল রহিল। কিন্তু রাত্রে আবার খোকার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল।

দয়াময়ী একান্ত মনে একান্ত প্রাণে কত করিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিল, খোকার গায়ে হাত বুলাইল, কিন্তু কিছুতেই খোকা বাঁচিল না।

যখন খোকার মৃত্যুসংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইল তখন তারাপ্রসাদ অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিল—দয়াময়ীকে বলিল—"রাক্ষসি, খোকাকে নিলি? কিছুতেই মায়া ত্যাগ কর্তে পার্লিনে?"

খোকার মা প্রথমে শোকে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন দয়াময়ীকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিল। বলিল - "ও দেবী কোথায়? ও ডাইনি। দেবী কখন ছেলে খায়?"

কালীকিঙ্কর ছল ছল নেত্রে দয়ার পানে চাহিয়া বলিলেন—"মা, খোকাকে ফিরিয়ে দে। এখনও দেহ নষ্ট হয় নি। ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে।"

দয়াময়ী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে যমরাজাকে উদ্দেশ করিয়া আজ্ঞা করিল, এখনি খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরাইয়া দেওয়া হউক।

তাহাতে যখন হইল না, তখন মিনতি করিল;—আদ্যাশক্তির মিনতিতেও যমরাজা খোকার প্রাণ ফিরাইয়া দিলেন না।

তখন নিজের দেবীত্বে দয়ার অবিশ্বাস জন্মিল।

আজ তাহার পূজা ইত্যাদি প্রায় বন্ধ বলিলেই হয়। সমস্ত দিন কেহ তাহার কাছে আসিল না। দয়া একাকিনী বসিয়া সারাদিন চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় উপস্থিত। যেমন তেমন করিয়া আরতি হইল।

* * *

পরদিন কালীকিঙ্কর উঠিয়া পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ!—পরিধেয় বস্ত্র রজ্জুর মত করিয়া পাকাইয়া, কড়িকাঠে লাগাইয়া দেবী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীবিলাস বাবুর বিবাহিত-জীবন সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী সরোজবাসিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাস শত সহস্রবার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধুরাশির মধ্যে, মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার হুলের দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। আসল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল। আর শ্রীবিলাসও বোধ হয় একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের ঐক্যতানবাদনে সুর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের শ্বশুর হরিগোপাল বাবু—লক্ষ্ণৌয়ের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপাল বাবু। ও অঞ্চলের লোক, কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে; এবং—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক,—কোন্ ভ্রমণকারী বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে অন্ততঃ একটিবারও পাত পাড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া, খাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের যে চাকুরি করিয়া দিয়াছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? আহা, ওদিককার গরীব লোকে আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে! সে কথা যাউক;—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। সারা বাঙ্গালা দেশে দুই তিন্‌খানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ফের্‌তা ঘর"—অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে—ছিল। পাত্র

যুটানই মুস্কিল ছিল;—কিন্তু যদি পাত্রও বা যুটিল, তবে হয় সে একটি হস্তীমূর্খ, নয়ত একবারে নিঃস্ব। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল। তাঁহাকে স্বজাতীয় এবং "স্বঘরের" দেখিয়া হরিগোপাল বাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন; এবং লক্ষ্ণৌয়ে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেটির সৎ স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, তখন হইতেই তাহাকে স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। সেই ভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আঠারো বৎসর বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; তখন কন্যার বয়ঃক্রম বারো বৎসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপাল বাবু দুই জনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তখন এফ্‌এ পড়িতেছেন। হঠাৎ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল। এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বলিলেন, —"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি। এই যমপুরী লক্ষ্ণৌ সহরে আমি আর একদিনও টিকিতে পারিব না।"

তাহাই হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার সিকি মূল্যেই বিক্রীত হইল। জিনিষপত্র কতক বিক্রীত, কতক বিতরিত এবং অবশিষ্ট গোলেমালে অপহৃত হইল। দিন পনোর কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী, হরিগোপাল বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সরোজবাসিনীর আর দুই ভগ্নী এবং একটি ভ্রাতা ছিল। ভগ্নী দুইটি

নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। ভ্রাতাটির নাম সতীশ, সাত আট বৎসর বয়স। সুতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসর খানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন,—"জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতার কলেজে পাঠাইয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই!"—বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শ্রীবিলাস কলিকাতায় গিয়া এফ্ এ, বি এ, এবং দুইবার অনুত্তীর্ণ হইবার পর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে সাত আট বৎসর অতীত হইল।

শ্রীবিলাসের এখন সাতাশ আঠাশ বৎসর বয়স হইয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এত খানি বয়স হইল, তথাপি তিনি সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে শ্রীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হইয়া থাকিতেন। এই সময় তাঁহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী তাঁহার অকৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাবে সহ্য না করিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন। বলা বাহুল্য ইহাতে সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ষ্টীম-হামারের সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাই তি নে পরামর্শ করিলেন, পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন।

শ্বশ্রূ বলিলেন,—"সেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভদিনে দুই জনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাঁকীপুরে। সেইখানেই বাসা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারেন নাই। কোনও মাসের আয়ে বাসাখরচটার সঙ্কুলান হয়—কোনও মাসে তাহাও হয় না। প্রথম উকিলী পাস করিয়া শ্রীবিলাসের মনে যে আত্মমর্য্যাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে পড়িতেছে। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্য্যন্ত বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা যোগাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন ভারি অসন্তোষের ভাব। তিনি দেশে প্রায়ই আত্মীয় প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর বুদ্ধির দোষ দিয়া বলিতেন,—"দেখ দেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে, তাহার টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে হইল। খতাইয়া দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেক টাকা বিবাহে ব্যয় করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা খরচ করিলাম, তবুও জামাইটি মানুষের মত হইল না।" ইদানীং শ্রীবিলাসও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শ্বাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ "গতিরন্যথা" ছিল না।

যখনকার যাহা, ঠিক সেই সময়ে মানুষের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জনের অদৃষ্টে তাহা

ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিংশ বৎসর বয়স হইলেও সন্তান হইল না ;—হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশানুরূপ ত নহেই—প্রয়োজনানুরূপও নহে। এই দুইটি কারণে তাঁহার জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহ্য হয়, যদি পত্নী অনুকূলা হয়েন। এমন কোন্ সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায়? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণয়বতী হইলেও এই দুইটি ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সে দিন রবিবারের সন্ধ্যা। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদের উকীল বাবুর বৈঠকখানা ঘরে একটিও মক্কেলনামক সেই প্রিয়দর্শন জীব উপস্থিত ছিল না। শ্রীবিলাস এই বর্ষা প্রদোষে একাকী বসিয়া সুর করিয়া ঋতুসংহারের দ্বিতীয় সর্গ পড়িতেছিলেন। ক্রমে এই স্থানে আসিলেন :—

শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে
শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ প্রবিশন্তি নার্য্যঃ।

এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে স্ত্রী নাই। দাসী জানাইল, ঠাকুর পলাইয়া গিয়াছে, সেই জন্য 'মা-জী' স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত আছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—এমন সময় সরোজবাসিনী প্রবেশ করিলেন। আজ অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজা যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একটা পরিহাস করিলেন, কিন্তু সরোজবাসিনী মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণার ভাব

প্রকাশ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। শ্রীবিলাস নাকি এই সরোজার সহিত অনেক দিন হইতে ঘর করিতেছেন- এই কারণে তিনি এরূপ আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তখন কাব্যলব্ধ নায়কভাব বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত সাধারণ সাংসারিকজনোচিত প্রশ্ন করিলেন—"আজ আবার বাবাজীর কি হইল ?"

সরোজবাসিনী নিরুত্তর। শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়া ছিলেন, পালঙ্কের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর পারাও যায় না। এমন ক'রে তিন দিন অন্তর ঠাকুর পালালে—"

সরোজবাসিনী বাধা দিয়া বলিলেন—"সস্তার ঠাকুর ঐ রকমই হয়ে থাকে। তিন টাকা মাহিনায় কি আর ভাল ঠাকুর হয় ?"

শ্রীবিলাস স্ত্রীর এই কয়টি সামান্য কথাতেই নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মনে হইল, স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অকৃতিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। স্মরণ হইল সেই বাল্যকালে সরোজবাসিনীর পিতা কি শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ;—তিনি ত এক প্রকার পথের ভিক্ষুক হইতেই চলিয়াছিলেন। সরোজবাসিনী বাল্যকাল হইতে শ্রীবিলাসকে স্বীয় পিতার অন্নদাস বলিয়াই জানিতেন--এখন সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই কি ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইবে ? তিনি নিঃসংশয়িত ভাবে স্থির করিলেন, এই উক্তিতে তাঁহার "প্লীবিয়ন্ অরিজিনের" প্রতিও বক্রকটাক্ষপাত আছে—অর্থাৎ তাঁহার নজর ছোট, তাই তিনি তিন টাকার রসুয়ে বামুন রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিলাস এই কল্পিত অপমানে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন—ইহা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাসের ফল। বলিলেন—

"আজ আর থাক্। বাজার থেকে জলখাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে এখন। তুমি বস।"

সরোজবাসিনী যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন। শ্রীবিলাস কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সরোজার হস্তধারণ করিয়া সাদরে বলিলেন—"চল"। সরোজবাসিনী একটা যন্ত্রণাসূচক উহুহু শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন। শ্রীবিলাস সভয়ে দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ?"

সরোজবাসিনী বলিলেন—"হয়েছে আমার মাথা ও মুণ্ড" (যেন মাথা ও মুণ্ড দুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।)

শ্রীবিলাস হাত টানিয়া দেখিলেন—অনেকটা স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে সাদা সাদা ঔষধ লেপিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল ;—বলিলেন—

"আহাহা, বড় কষ্ট হয়েছে ত! কেন তুমি রান্নাঘরে গেলে ? ছিঃ—এমন অসাবধান !"

বেশ চলিতেছিল এবং সম্ভবতঃ নিরাপদে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত ; কিন্তু এই শেষের কথাটিই মাটি করিয়া ফেলিল। "এমন অসাবধান !"—সরোজবাসিনী আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। সে চিরকাল ধনী পিতামাতার আদরের মেয়ে ছিল ;—তাহাকে কখনও কোন গৃহকার্য্য করিতে হয় নাই। রন্ধনাদি সম্বন্ধে তাহার একবারেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং সরোজবাসিনী রন্ধনশালায় অসাবধান, একথা তাহার পক্ষে কোন দোষেরই নয়। তথাপি তাহার সহ্য হইল না যে, স্বামী তাহাকে অসাবধান বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সে ক্রোধ ও ক্রন্দনের মিশ্রিত স্বরে শ্রীবিলাসকে কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিয়া দিল। স্বামী মহাশয়ও নিতান্ত নীরব রহিলেন না। ফলকথা সে রাত্রে শ্রীবিলাস বৈঠকখানা গৃহে শয়ন করিলেন। সেই

বালক সতীশ অনেক জিদ করিয়া দুইজনকে কিছু খাওয়াইল, নহিলে অভুক্ত অবস্থাতেই উভয়ের রাত্রি কাটিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে শ্রীবিলাস শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন. তাহাতে লেখা ছিল,—"এক নিকট আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে. অতএব সরোজবাসিনীকে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়।" শ্রীবিলাসের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাও লেখা ছিল যে,—"যতদিন ভালরূপ পসার না হয়, ততদিন সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া অনর্থক খরচ বাড়াইবার প্রয়োজন কি?"—শ্রীবিলাস নিশ্চয়ই স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেন, যদি এ আর্থিক অসচ্ছলতার কথা-টার উল্লেখ না থাকিত। ইহা তীরের মত আসিয়া তাঁহার সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত আত্মাভিমানকে বিদ্ধ করিল। তিনি যথাসময়ে বালক সতীশের হাতে এই পত্রখানি স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। সরোজবাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি যাইব, সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বল।" শ্রীবিলাস ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন—"এখন কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না।" তাহার প্রত্যুত্তরে আর সরোজবাসিনী কোনও কথা বলিয়া পাঠাইলেন না; পরন্তু জননীর সেই পত্রখানি লইয়া যে অংশে শ্রীবিলাসের অর্থকষ্টের উল্লেখ ছিল, সেই অংশটি মোটা পেন কলম দিয়া লাল কালীর দাগ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীবিলাস অন্যমনস্কভাবে সে পত্র লইয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলেন,—তখন আর খুলিয়া দেখিলেন না। আহারাদি করিয়া কাছারি চলিয়া

গেলেন। কাছারি হইতে প্রায়ই তাঁহাকে খালি পকেটে ফিরিতে হইত। সে দিন দৈবাৎ পকেট্‌টা কিছু ভারী করিয়া ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। শুনিলেন তিনটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে সতীশকে লইয়া "মা-জী" প্রস্থান করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া তাম্রকূট সেবা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শ্রীবিলাস ও পাড়ার অন্য সকলে ঠাকুরদাদা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সংস্কৃতটা কিছু পড়া ছিল;—ইংরাজিও অল্প জানিতেন; এ কালের লোক জন, আচার ব্যবহার, এ সকলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ভ্রম ছিল—তিনি বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ভুল করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ভারত-বর্ষটাকে কোম্পানীর রাজ্য বলিয়াই উল্লেখ করিতেন। এই ঠাকুরদাদা মহাশয়, শ্রীবিলাসের স্ত্রীর পলায়ন সংবাদ পাইবা মাত্র, হেলিতে দুলিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোক-গণের এই প্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুই চারিটা শাস্ত্র বচন আওড়াইয়া প্রমাণ করিলেন, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই;—এমন কি, কলির শেষ অবস্থা ঘনাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীবিলাসের এখন এই সমস্ত কথা নিরতিশয় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী এমন কিছু জিদ করিয়া লেখেন নাই যে, পাঠাইতেই হইবে—এমন কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না;—এই দেখুন না পত্রখানা।" বলিয়া পত্রখানা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন। পত্র খুলিবামাত্র

লাল কালীর মোটা মোটা দাগ উভয়ের চক্ষে পড়িল। ঠাকুরদাদা বলিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিলে?" শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকী রহিল না দাগ কে দিয়াছে। ক্ষোভে, অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। স্বর বন্ধ হইয়া আসিল; চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিয়াছে হে?" শ্রীবিলাস প্রথমবারে কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরদার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই; এবার বলিলেন—"যখন আমি পত্র খুলি, তখন এ দাগ ছিল না। আমার স্ত্রী এ দাগ দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার! স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা দেখিলে! স্বামী—যে স্বামী গুরুর গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান! হায়রে কলিকাল! এই বয়সে (ষষ্টি বৎসরের কম ত নহে) কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে! এমন শয়তানী স্ত্রীলোকের নরকেও স্থান হইবে না। মনুর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।

—অর্থাৎ কি না যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া ভর্ত্তারং—নিজ পতিকে লঙ্ঘয়েৎ—অর্থাৎ অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে-কিনা অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া শ্বভিঃ বল্‌তে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন।—কিন্তু এখন মনুর আইন চলে না—এখন হনুর রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস, তুমি যদি এই অপমান, এই নারী-পদাঘাত সহ্য কর, তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমায় ধিক্,

তোমার পুরুষত্বে ধিক্, তোমার লেখাপড়ায় ধিক্। তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

তাহাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতার স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন,—"আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলাকে আদর দিয়া দিয়া—মাথায় চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্ব্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাতি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—ইষ্টেশনে দেখিয়াছি—বেটারা বেটীদের মাথায় ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন খানসামা! সেই সাহেবের শিষ্য ত তোমরা! তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গর্হিত আচরণ ক্ষমা কর—প্রশ্রয় দাও— তবে তাহার দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতির স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া যাইবে। আর যদি তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে শ্রীবিলাস! কোম্পানী বাহাদুর যে খুনীর ফাঁসী দেন, সে কেন? খুন হইল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ করিয়া রাজস্ব কমাইবার প্রয়োজন কি? না—দশ জনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে – বাপ্‌রে, খুন কর্‌লে ত ফাঁসী যেতে হয়! স্থতরাং তুমি আর ইতস্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, বিবাহ করিয়া ফেল। আমি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থাবিশেষে পড়িয়া মানুষের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ঊনবিংশতি শতাব্দীর এই শেষভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক শ্রীবিলাস,— মিল, বেকন, কারলাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস,—মিল্টন— সেক্সপিয়র—

শেলি—মাইকেল—বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোত্থানের মধু-রসগ্রাহী শ্রীবিলাস. অম্লান বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব!"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে, এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন যে, কন্যাটি সেই বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকটসম্পর্কীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি বহুদূরে নির্ব্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন কি? সে গর্ব্বিতা, মদোদ্ধতা সরোজবাসিনী এখন "ধরার ধূলির চেয়ে নীচে" হইয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্বালয়ের লোক, তাহাকে একবাক্যে নিন্দা করিতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, গ্রামে যেখানে সেখানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে—ছি ছি ছি—এমন বুদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল! একটা সামান্য জিদের জন্য চিরজীবনটার দুঃখ কিনিল! গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সরোজার মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার এই শেষ অনুরোধ। এটি রাখিও। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে যাইয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার জন্য আর কি করিবে মা? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই কমিয়াছে—নহিলে সে কালে সতীনের জ্বালা ভোগে নাই এমন কয়টা স্ত্রীলোক ছিল? তুমি পূর্ব্বজন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই কষ্ট পাইতেছ। এই জন্মে ভাল করিয়া, ভক্তি করিয়া পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে। আমি চলিলাম—তুমি পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এখন আর কে তোমার আশ্রয় রহিল মা? আমার এ অনুরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি পাইব না।"

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজার মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাসময়ে এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

* * *

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে লইয়া সরোজ-বাসিনী বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। পৌঁছিয়া, একবারে গিয়া শ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। শ্রীবিলাস তখন কাছারিতে। চাকর-বাকরেরা, "মা—জী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্নাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ী ঘর দুয়ারের আর সে শ্রী নাই—দেখিয়া সরোজার চক্ষে জল

আসিল। কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলার আচ্ছাদন নাই। আলমারি, টেবিল, সিন্ধুক, বাক্স ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়াসার জাল। ঘরের কোণে তামাকের গুল, ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই হয়। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না;—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজ-বাসিনী তাহাদিগকে লইয়া কায করিতে লাগিয়া গেলেন। সমস্ত ঝাড়িয়া ধুইয়া, মুছিয়া, সাজাইয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন। ঘটী বাটী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিষ গুলা মাজাইয়া ঘসাইয়া তকৃতকে ঝক্‌ঝকে করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বেলা পড়িলে রসুই ঘরে গিয়া স্বহস্তে নানাপ্রকার জলখাবার প্রস্তুত করিলেন। পাণ সাজিয়া, কাপড় বদ্‌-লাইয়া, স্বামী সম্ভাষণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মনে হইল, সে সব দিনে মিলনের এইরূপ অনতিপূর্ব্বে কি উৎকণ্ঠা, কি হর্ষ, কি চঞ্চলতা আসিয়া বুকের ভিতর দৌরাত্ম্য করিত! আর আজ এ কি ভাব! ভাবিতে ভাবিতে সরোজার মুখখানিতে যেন মেঘ করিয়া আসিল!

শ্রীবিলাস কাছারি হইতে ফিরিলেন। প্রথমেই বাহিরে সতীশের সাক্ষাত পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন—পা যেন উঠে না!

সরোজার সঙ্গে দেখা হইল। উভয়ের তখনকার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে? অনেক পুরাতন কথা মনে আসিয়া উভয়ের চক্ষে জল বহাইল। সেই রাত্রি সে দম্পতির কি ভাবে কাটিল কে বলিতে পারে? দিনের পর দিন গেল, সংসার চলিতে লাগিল; কাহারও মনে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই; অথচ উভয়ে স্বামী স্ত্রী সাজিয়াই সংসার করিতে লাগিল।

আমার পাঠকেরা না হউন, পাঠিকারা নিশ্চয়ই শ্রীবিলাসের কৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ তাহার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার চিত্র দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। শ্রীবিলাসের নবপরিণীতা বধূটি বঙ্গদেশের এক নিভৃত গ্রামে, জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিল।

শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়া অবধি শুভদৃষ্টির বস্ত্রাবরণ মধ্যে ভিন্ন সে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান নাই। ফুলশয্যার রাত্রে কম্প দিয়া তাহার ত ভারি জ্বর আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শ্রীবিলাসের কোনও কষ্ট হইবার কথা নহে। আমাদের সরোজবাসিনীও আদর্শ রমণী নহেন; তিনি সপত্নীর মৃত্যু সংবাদে খুসী হইয়া দাস দাসীকে বক্‌সিস্ এবং দেবতাকে হরিলুট দেন নাই বটে;—কিন্তু তাহার পর হইতে হাসিতে গল্পেতে মনের প্রফুল্লতা ও লঘুভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীবিলাসেরও অনুতাপক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।

এখন হইতে এই দম্পতি, প্রত্যেক উপকথার নায়ক নায়িকার মতই, সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে, শ্রীবিলাস এখনও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই; এবং শত পুত্রের একটি মাত্র এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আলোক দর্শন করিতে পাইয়াছে।

ভিখারী সাহেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখ্‌সিসের প্রলোভন দেখাইয়া, ষ্টেশনেও পৌছিলাম, আর ট্রেনখানিও ছাড়িয়া দিল। মহা মুস্কিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর গাড়ী নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম একটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিয়ারিতে ফিরিবার এমন যে কিছু তাড়াতাড়ি ছিল তাহা নহে, তবে এখন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ট্রেণের প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ কালটা কাটাইব যে তাহার কিছু সম্বল ছিল না।

গাড়ী হইতে নামিলাম। ঘোড়া দুইটা তখনও হাঁফাইতেছে। তাহাদের গাত্র বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম্মজল মাটীতে পড়িতেছে। গাড়োয়ান বেচারার মুখখানি ম্রিয়মাণ; সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, আমার কিছু অপরাধ নাই। জানোয়ার দুটাকে মারিয়া ফেলিয়াছি বলিলেই হয়।"—কথাটা মিথ্যা নহে। আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কারই দিলাম। তখন তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

আমার চাকর হরি তেওয়ারি বলিল—"বাবু! ওয়েটিং রুমে জিনিস-পত্রগুলা লইয়া যাই?" নিকটে একটা প্রকাণ্ড স্বচ্ছায় নিমগাছ, ফুর ফুর করিয়া প্রাণ-কাড়িয়া-নেওয়া চৈতী হাওয়া বহিতেছে—গাছটার তলদেশের প্রতি আমি কিয়ৎক্ষণ লুব্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। চাকরটা অনেককাল আমার সঙ্গে ঘুরিয়াছে—আমার মুখ দেখিয়া আমার

মনের ভাব বুঝিতে পারে। বলিল—"হুকুম হয় ত এই গাছের তলাতেই বিছানা বিছাই।" আমি বলিলাম—"তাই বিছাও, এইখানেই একটু আরাম করি।"

বৃক্ষতলে সুকোমল হরিদ্বর্ণ শষ্পরাজির উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া, তাহার উপর শতরঞ্চ বিছাইয়া, একটি তাকিয়া রাখিয়া, হরি তেওয়ারি আমার বিছানা করিয়া দিল। আমি জুতা ছাড়িয়া, কোট্‌টা খুলিয়া রাখিয়া, একটা সুদীর্ঘ আঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাকিয়ায় হেলান দিলাম। তেওয়ারি গুড়গুড়িতে জল ফিরাইয়া তামাক সাজিতে গেল।

তেওয়ারি চক্ষুর অন্তরাল হইবামাত্র একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ ইংরাজ আসিয়া আমার বিছানার কাছে দাঁড়াইল। টুপি খুলিয়া ইংরাজিতে বলিল—"যীশু খ্রীষ্টের নামে আমাকে একটি পয়সা দিন।"

লোকটার পরিচ্ছদ একটি মূল্যবান্ কিন্তু খুব পুরাতন সিল্ক হ্যাট্; তাহার উপরকার কাপড়টিতে এত ধূলা জমিয়াছে যে তাহার আদিম কৃষ্ণবর্ণ এখন ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহা যে সিল্ক তাহাও কষ্টে ঠাহর হয়। বস্ত্রাদি, তাহাও তদবস্থ। কলার, নেক্‌টাই,—অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই ছিল না। মাথার চুলগুলা বড় বড়,—বাতাসে এদিক ওদিক উড়িতেছে। বয়স ষষ্টি বৎসরের কম হইবে না। লোকটাকে দেখিয়া হঠাৎ বিনা কারণে আমার মনে কেমন একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম ইহার অন্তরালে নিশ্চয়ই একটা ভগ্নজীবনের সকরুণ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস শ্রবণ করিবার জন্য আমার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ভাবিলাম যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ ইহাকে লইয়াই সময় যাপন করি।

তাহাকে বলিলাম—"এইখানে বস।" কি আপদ! আমার বিছানায় বসিতে চায়। যদিও আমি ব্রাহ্ম মানুষ, স্পর্শদোষ মানি না, তথাপি ঐ একটা জীবন্ত ভূতকে কি বিছানায় বসিতে দিতে পারি? তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"এই নীচে ঘাসেই ব'স না।" লোকটা গর্ব্বিত ভাবে বলিল,—"মহাশয়! আমার কাপড় ময়লা হইয়া যাইবে যে!"

শুনিয়া হাসি পাইল। ভারি পরিষ্কার কাপড় কি না! আমার বিছানার তলা হইতে কম্বলখানা টানিয়া বাহির করিয়া দিলাম। লোকটা পা দুটা ছড়াইয়া বসিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"চুরুট খাইবে?" আমি বলিলাম—"না, তুমি খাও।"

লোকটা চুরুট বাহির করিল। অতি উৎকৃষ্ট হাভানা জাতীয় চুরুট। বড় বিস্মিত হইলাম। এই ভিখারী এত মূল্যবান্ হাভানা কোথায় পাইল? কাহারও চুরি টুরি করিয়া আনে নাই ত?

ইত্যবসরে আমার চাকর গুড়গুড়ি ভরিয়া উপস্থিত হইল। আমিও তাম্রকূট সেবন আরম্ভ করিলাম। তেওয়ারি অপ্রসন্ন কুটিল দৃষ্টিতে ভিখারী সাহেবের পানে চাহিয়া রহিল।

উভয়ে ধূমপান করিতে করিতে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইতে লাগিল। নাম বলিল—হেন্‌রি। আমি বলিলাম—"ও ত গেল তোমার ক্রিশ্চান্ নেম্, তোমার সর্‌নেম্ কি?" সে বলিল—"আমার সর্‌নেম্ নাই।" জীবনের ইতিহাস কিছুই বলিতে চাহে না। শুধু বলে—"আমি অতি দরিদ্র, খাইতে পাই না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই।" জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার আর কেহ আছে?" সে বলিল—"আমার মা বাপ কেহই নাই, আমি একটি অনাথ বালক।" বালকই বটে! আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"স্ত্রী পুত্র পরিবার?" সে বলিল—"স্ত্রী পুত্র পরিবার আমার কেহই নাই।"

আমার মনে একটা মৎলব আসিল। ভাবিলাম. অনেক বাঙ্গালীই ত সাহেব হইয়াছে, একটা সাহেবকে বাঙ্গালী করিয়া দেখিলে হয়। ইহাকে আমার কয়লার খনিতে লইয়া গিয়া কুলীর সর্দ্দার করিব, ভাত ডাল খাওয়াইব, ধুতি চাদর পরাইয়া রাখিব। যদি রাজি হয়, তবে এ একটা অভিনব দর্শনীয় পদার্থ হইবে—ইহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাই।

প্রস্তাব করিলাম। হেন্‌রি মহা উৎসাহের সহিত সম্মতি জানাইল। বলিল—"ও ইয়েস্ বাবু, আমি বাঙ্গালী হইব। আমাদের জাতি বাঙ্গালীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আমি স্বয়ং বাঙ্গালী হইয়া আমাদের স্বজাতির পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎকে দেখাইব যে বাঙ্গালীরা হেয় পদার্থ নহে।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম জগতের কর্ণে যদি তোমার বাঙ্গালী হওয়ার সমাচার পৌঁছে তবে জগৎ বলিবে, তুমি অন্নদায়ে এ কায করিয়াছ। বলিলাম—"তবে চল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী। কোথাও তোমার কিছু জিনিষ পত্র থাকে যদি লইয়া আইস।"

সে বলিল—"বাবু, আমার আর কোথাও কিছু নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সেখানে ভাল হাভানা পাওয়া যায় ত?"

আমি বলিলাম—"এত খপর রাখি না, বোধ হয় পাওয়া যায় না।"

হেন্‌রি মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল—"বাবু, তবে আমার যাওয়া হইল না।"

অদ্ভুত লোক! এ দিকে অন্ন জুটে না, অথচ হাভানা চুরুটটি চাই। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আশ্রয় দিতে চাহিলাম, অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু এক হাভানা চুরুটের জন্য সকল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু এই অদ্ভুতত্বের জন্যই তাহাকে সংগ্রহ করিবার নেশা আমার বাড়িয়া উঠিল। বলিলাম, "তুমি যদি চাও ত

আমি কলিকাতা হইতে হাভানা আনাইয়া দিতে পারিব। প্রতি সপ্তাহে একজন করিয়া আমার চাপরাসি কলিকাতায় যায়।"

শুনিয়া হেন্‌রি মহা খুসী। আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বলিল -"বাবু, আমার একটি হাভানা তোমাকে খাইয়া দেখিতেই হইবে।" আমি চুরুট বড় একটা খাই না, কিন্তু হেনরি নাছোড়বান্দা। লইলাম একটি। দিব্য জিনিষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেন্‌রি খুব কাযের লোক বটে। আমার বাহিরের ঘরে তাহাকে স্থান দিয়াছি। বাঙ্গালী সাজাইয়াছি। বাঙ্গালীর বেশ তাহার অঙ্গে এমন মানায়! সম্প্রাত আমার একটি ইংরাজ বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি হেন্‌রিকে দেখিয়া হেন্‌রির ইতিহাস শুনিয়া অত্যন্ত আমোদ পাইয়াছেন। তাহার একখানি ফোটোগ্রাফ্ তুলিয়া "ষ্ট্র্যাণ্ড্ ম্যাগাজিন"-এর "কিউরিয়সিটি কলম"-এর জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নে লিখিয়া দিয়াছেন—"বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ।" হেন্‌রির একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিখিয়া দিয়াছেন। ছবিটি ষ্ট্র্যাণ্ডে প্রকাশিত হইলে অনেক সাহেব বাঙ্গালীপরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে পারেন। খাইয়া-দাইয়া এখন হেন্‌রির চেহারায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাস্তবিক সেই তেজোদৃপ্ত ইংরাজ-মূর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে এক অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য। কুলিগুলা তাহার এমনি বশীভূত হইয়াছে! আমাকে যদি দিনে দুইবার সেলাম করে ত তাহাকে দশবার করে।

শুধু হেন্‌রি আমার কুলী খাটাইয়া নিরস্ত নহে ;—আমার বড় মেয়ে গিরিবালাকে ইংরাজি পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েটাও হেন্‌রির এমন নেওটো হইয়াছে ! এই মাসখানেকের মধ্যেই তাহাকে এক রকম চলনসই বাঙ্গলা শিখাইয়া লইয়াছে। তাহাকে সে বলিত হেন্‌রি কাকা। প্রথম দিন শুনিয়া ত আমার হাড় জলিয়া গেল। গিরিকে (গৃহিণীর সাক্ষাতে) বলিলাম, "কাকা কি রে রাক্কুসি ? ও তোর বাবার চেয়ে বয়সে ছোট না কি ? জেঠা বল্। নয়ত মামা বল্।"—তাহার পর হইতে গিরি তাহাকে হেন্‌রি দাদা বলিয়া ডাকিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গিরিবালা জ্বরে পড়িল। দুই তিন দিন সকাল বেলা ভিজিয়া ভিজিয়া ফুল তুলিয়াছিল। আমি ভোরে চা খাইয়া আফিসে চলিয়া যাইতাম। আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্য করিত না। এই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহার সর্দ্দি জ্বরের মত হইল। প্রথমে আমরা ততটা খেয়াল করি নাই ;—অমন জ্বর ত ছেলেপিলের মাঝে মাঝে হইয়াই থাকে। দুইটা উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে।

পাঁচ ছয় দিনে জ্বরটা বিকারে দাঁড়াইল। অবস্থা উত্তরোত্তর সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে আমাদের কলিয়ারির নেটিভ্ ডাক্তার বাবুটি চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া রাণীগঞ্জ হইতে এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জনকে প্রত্যহ একবার করিয়া আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম।

হেন্‌রি তাহার ছাত্রীর মাথার শিয়রে বসিয়া খুব সেবাটা করিতে লাগিল। আমরা বাপ মায়ে যা সেবা না করিলাম, তা সে হেন্‌রি করিল। তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল বলিলেই হয়। ঔষধ পথ্যাদির সম্বন্ধে আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে হেন্‌রি রাগিয়া অনর্থপাত করিত।

মাঝে একদিন এমন অবস্থা হইল যে বুঝি রাত্রি আর কাটে না। আমার স্ত্রী ত মেয়ের রোগশয্যা ছাড়িয়া ও ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। রাণীগঞ্জের ডাক্তার বাবুটি অন্য দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেন, সে দিন আর যাইতে পারেন নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যখন রাত্রি দুইটা হইবে তখন ডাক্তার বাবু নূতন একটা ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যখন যে ঔষধ দেওয়া হইত, হেন্‌রি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। প্রশ্ন করিয়া করিয়া ডাক্তারকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। এবার বলিল, "Now, I won't allow that"—অর্থাৎ ও ঔষধ আমি দিতে দিব না। ডাক্তার চটিয়া গেলেন। বলিলেন—"মহাশয়, এ ব্যক্তি এমন করিয়া বাধা দেয় কেন?"

হেন্‌রি লোকটা এ দিকে ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি খামখেয়ালি করে। অন্য সময় তাহাতে বরং আমোদ পাইয়াছি, কিন্তু এখন ভারি বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল।

হেন্‌রি ডাক্তারকে ষ্টুপিড্ ফুল বলিয়া গালি দিল। আমাকে বলিল —"এ কিছু জানে না, ইহাকে তাড়াইয়া দাও। এখনি রোগীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল আর কি!" ডাক্তার বলিলেন—"যদি অমন করিয়া আমার চিকিৎসা-কার্য্যে বাধা দিবে তবে আমি চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া যাইব।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এই ব্যাপারে আমাদের স্ত্রীপুরুষের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হেন্‌রিকে বলিলাম—"কর কি? তুমি চিকিৎসার কি জান? ডাক্তার যা ভাল বোঝেন তাই করুন, তার পর আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

হেন্‌রি বলিল—"অদৃষ্ট আবার কি? জানিয়া শুনিয়া এ ঔষধ এখন খাওয়াইলে নিশ্চিত মৃত্যু। আধ ঘণ্টার মধ্যে গা হিম হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।"

ডাক্তার বাবু হেন্‌রিকে বলিলেন—"তুমি ত ভারি পণ্ডিত দেখিতেছি! কেন, নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে কেন?"

আমি বলিলাম—"হেনরি, ডাক্তার বাবু যাহা বলিতেছেন তাহাই আমার ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কোনও আশঙ্কা করিও না।"

শেষকালে হেন্‌রি ডাক্তারকে বলিল,—"আচ্ছা তবে তোমার ঔষধই দাও। কিন্তু যদি আমার মেয়ে মরিয়া যায় তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিসে দিব। আর তুমি যে ঔষধ দিতেছ, তাহার একটা তালিকা করিয়া নাম দস্তখৎ করিয়া রাখ।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে হেন্‌রি প্রেস্‌ক্রিপ্সন্‌খানা লিখিয়া ফেলিল। ডাক্তারকে বলিল,—"সহি কর।"

ডাক্তার বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম ইহাদের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার মেয়ের প্রাণ যায়। আমি ডাক্তার বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিলাম—"মহাশয়! ওটা পাগল, ওর কথা শুনিবেন না। আপনি যে ঔষধ ইচ্ছা তাহাই দিন।" প্রেস্‌ক্রিপ্সন্‌খানা হেন্‌রির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

ঔষধ দেওয়া হইল। হেন্‌রি রোষকষায়িত লোচনে বলিল—"ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন।" ডাক্তারের কাছে একটা উৎকৃষ্ট থার্ম্মমিটর্ ছিল, অর্দ্ধ মিনিট রাখিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। পাঁচ মিনিট অন্তর তাপ লওয়া হইতে লাগিল। হু হু করিয়া টেম্পারেচর নামিতেছে।

ডাক্তারের মুখ শুকাইয়া গেল। মেয়ের হাত পা শীতল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

হেন্‌রি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দেখ মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। আমি উহাকে হত্যা করিব।" এই বলিয়া সে ক্ষিপ্তের মত ডাক্তারের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে চাহিল। তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার। ডাক্তার বাবু এ ব্যাপার দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহার বাঙ্গালী-প্রাণ আর তাঁহাকে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে দিত কি না সন্দেহ। আমি হেন্‌রিকে বলিলাম,—"দেখ, তুমি যখন এতই জান, তবে এখনও যদি কিছু প্রতীকার থাকে ত কর।" আমার স্ত্রী বলিলেন—"হেন্‌রি, এ মেয়েকে তুমি যদি বাঁচাতে পার, তবে এ মেয়ে তোমাকে দিলাম।"

হেন্‌রি বলিল—"এ মেয়ে আমাকে দিলে?" আমার স্ত্রী বলিলেন —"দিলাম।"

হেন্‌রির মুখ আনন্দপূর্ণ হইল। সেই বিপদের সময়ও তাহার ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা পাগল নাকি?

হেন্‌রি বলিল—"ঈশ্বর সাক্ষী, এ মেয়েকে যদি বাঁচাইতে পারি, তবে এ মেয়ে আমার?"

আমার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হাঁ হেন্‌রি, এ মেয়েকে যদি বাঁচাইতে পার ত এ মেয়ে তোমার।"

হেন্‌রি বলিল—"আচ্ছা, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখি!" বলিয়া ডাক্তারের ঔষধের বাক্সটা কাছে টানিয়া লইল। ক্ষিপ্র হস্তে একটা ঔষধ প্রস্তুত করিল। খানিকটা গিরির মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু কে গিলিবে? ঔষধ ঠোঁটের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

দেখিয়া হেন্‌রি স্থচের মত কি একটা যন্ত্র বাহির করিল। তাহা ঔষধে শিক্ত করিয়া গিরির দেহের স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ মিনিট পরে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। দশ মিনিট পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টা; তখন আবার গিরিবালার পূর্ণ জ্বর। হেন্‌রি আহ্লাদে আটখানা। বলিল—"ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ; এ যাত্রা ইহাকে বাঁচাইতে পারিলাম।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের কৃপায়, হেন্‌রির চিকিৎসা গুণে, গিরিবালা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সপ্তাহের পর পথ্য লাভ করিল। হেন্‌রি সর্ব্বদা তাহার কাছে কাছে থাকে। কুলীর সর্দ্দারি করা সে একবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।

দিন দিন কিন্তু হেন্‌রির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আজ দুই দিন তাহার হাভানা ফুরাইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় চাপরাসি পাঠাইল না। হেন্‌রির হাভানা ফুরাইলে নিয়মিত দিনের দুই চারি দিন পূর্ব্বেও চাপরাসিকে এখন কলিকাতায় পাঠান হয়। হেন্‌রি সদাই অন্যমন, কি ভাবে। মুখখানি ম্লান করিয়া থাকে। কেবল গিরিবালা কাছে আসিলেই যেন তাহার মনের অন্ধকার দূর হয়, মুখে হাসি ফুটে।

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হেন্‌রি তোমার কি হইয়াছে বল ত, তুমি সর্ব্বদা ভাব কি ?"

হেন্‌রি বলিল—"বাবু আমি আমার ভূতজীবনের ইতিহাস ভাবি। একটু একটু করিয়া আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি মাঝে মাঝে

পাগল হইয়া যাই, আবার ভাল হই। এবার আমার ভাল হইবার সময় আসিয়াছে।"

ভারি বিস্মিত হইলাম। হেন্‌রি পাগল? কই পাগলের কোনও লক্ষণ ত দেখি নাই! তথাপি কথাটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য মনে হইল না। এটা আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি, হেন্‌রির কথাবার্ত্তা নিতান্ত পথে কুড়ানো ভিখারীর মত নহে। তা ছাড়া, গিরিবালার রোগের সময় চিকিৎসাশাস্ত্রে সে ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিল। ও হয় ত কোথাও একটা বড়গোছের ডাক্তার ছিল, এখন পাগল হইয়া গিয়াছে। হেন্‌রিকে নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। সে স্বয়ং স্বেচ্ছায় যাহা বলিয়াছিল, তার বেশী আর একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

এই সময় গিরিবালা আসিয়া হেনরিকে ডাকিল। হেন্‌রি বালকের মত প্রফুল্ল ও চঞ্চল হইয়া গিরিবালার সঙ্গে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম, পাগলই বটে। নহিলে এত সত্বর উহার ভাব পরিবর্ত্তন হয় কেন? সহজ মানুষ বিষণ্ণ হইলে, প্রফুল্লতা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে। পাগলের সে সময়টুকুর আবশ্যক হয় না।

কিয়দ্দিন পরে আমি কলিয়ারির আফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, দরোয়ান একখানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত আমার সেই ইংরাজ-বন্ধু মরিসন্ আসিয়াছেন, সেই যিনি বাঙ্গালী-পরিচ্ছদে হেন্‌রির ফোটোগ্রাফ্ তুলিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া সমাদর করিয়া বন্ধুকে লইয়া আসিলাম। অভিবাদন ও প্রথম শিষ্টাচার বচনাদির পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনার সে ইংরাজ-বাঙ্গালী কুলীর সর্দ্দারটি আছে ত?"

"আছে বৈকি? কেন বলুন দেখি?"

"তাহা হইলে আপনি ভারি বিপদে পড়িয়াছেন!" এই বলিয়া মরিসন্ মুখখানি অতিশয় গম্ভীর করিলেন।

আমি একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর। হেন্‌রি একজন ফেরারি আসামী। ও লণ্ডনের নিকট একটা জেলে আবদ্ধ ছিল। দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। উহার প্রাণদণ্ড হইত। জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় দিয়া আপনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নিজের জন্য নহে, হেন্‌রির জন্য। হেন্‌রিকে আমরা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। হেন্‌রি এমন ভাল, উহার ভূত জীবন নরশোণিতে কলঙ্কিত? দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? উহার প্রাণদণ্ড হইবে? হেন্‌রি যে আমাদের পরমাত্মীয়ের মত। হেন্‌রি যে আমার প্রাণাধিকা কন্যার জীবনদাতা! উহার ফাঁসী হইবে?

বন্ধু বলিলেন—"এখন কি উপায় ভাবিতেছেন? এই বেলা পুলিস ডাকিয়া উহাকে ধরাইয়া দিন, তাহা হইলে প্রমাণ করা সহজ হইবে যে আপনি যে উহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা না জানিয়া।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"হেন্‌রিকে আমি ধরাইয়া দিব? বরং উহাকে এখনি গিয়া সাবধান করিয়া দিব।"

মরিসন্ পা দুটা খুব ফাঁক করিয়া দিয়া, চেয়ারের পৃষ্ঠে এলাইয়া পড়িয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি একজন সুশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি হইয়া এমন কথা বলিতেছেন? আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য শিকারকে কাড়িয়া লইবেন? সকলেই যদি আপনার মত এইরূপ ভাবাপন্ন হয় তবে ত এই সুবিপুল সুখময় জনসমাজস্বরূপ অট্টালিকা একদিনে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়!"

আমি ভারি দমিয়া গেলাম ; কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু আমি কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ নীতি অনুসারে আমার কন্যার প্রাণদাতার প্রাণদণ্ডে সহায়তা করিব ?

মরিসন্‌কে বলিলাম—"হেন্‌রি যদি প্রকৃতই অপরাধী হয়, তাহা হইলে সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিয়া উহাকে ধরাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

মরিসন্ বলিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন যে উহাকে আপনি সাবধান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিবেন।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"কৈ তাহা ত আমি বলি নাই। উহাকে সাবধান করিয়া দিব বলিয়াছিলাম বটে কিন্তু যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিব এমন কথা কখন বলিলাম ?" মরিসন্ ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার বলিলাম—"যদিও ধর্ম্মতঃ আমার তাহাই করা উচিত বটে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?" আমি গিরিবালার রোগ এবং হেন্‌রি কেমন করিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বলিলাম।

শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এ সকল সংবাদ আপনি পাইলেন কোথা বলুন দেখি ?"

তিনি বলিলেন—"মনে আছে. হেন্‌রি যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন আমি তাহার বাঙ্গালী-পরিচ্ছদ দেখিয়া অত্যন্ত হাসি এবং তাহার ফোটোগ্রাফ্ তুলিয়া লই ?"

"মনে আছে।"

"তাহা হইলে আপনি ভারি বিপদে পড়িয়াছেন!" এই বলিয়া মরিসন্ মুখখানি অতিশয় গম্ভীর করিলেন।

আমি একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর। হেন্‌রি একজন ফেরারি আসামী। ও লণ্ডনের নিকট একটা জেলে আবদ্ধ ছিল। দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। উহার প্রাণদণ্ড হইত। জেল ভাঙ্গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। তাহাকে আশ্রয় দিয়া আপনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইয়াছেন।

আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। নিজের জন্য নহে, হেন্‌রির জন্য। হেন্‌রিকে আমরা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। হেন্‌রি এমন ভাল, উহার ভূত জীবন নরশোণিতে কলঙ্কিত? দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? উহার প্রাণদণ্ড হইবে? হেন্‌রি যে আমাদের পরমাত্মীয়ের মত। হেন্‌রি যে আমার প্রাণাধিকা কন্যার জীবনদাতা! উহার ফাঁসী হইবে?

বন্ধু বলিলেন—"এখন কি উপায় ভাবিতেছেন? এই বেলা পুলিস ডাকিয়া উহাকে ধরাইয়া দিন, তাহা হইলে প্রমাণ করা সহজ হইবে যে আপনি যে উহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহা না জানিয়া।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"হেন্‌রিকে আমি ধরাইয়া দিব? বরং উহাকে এখনি গিয়া সাবধান করিয়া দিব।"

মরিসন্ পা দুটা খুব ফাঁক করিয়া দিয়া, চেয়ারের পৃষ্ঠে এলাইয়া পড়িয়া, যেন ভারি নিরাশ হইয়া বলিলেন—"বাবু, আপনি একজন সুশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি হইয়া এমন কথা বলিতেছেন? আইনের কবল হইতে তাহার ন্যায্য শিকারকে কাড়িয়া লইবেন? সকলেই যদি আপনার মত এইরূপ ভাবাপন্ন হয় তবে ত এই সুবিপুল সুখময় জন-সমাজস্বরূপ অট্টালিকা একদিনে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়!"

আমি ভারি দমিয়া গেলাম ; কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু আমি কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ নীতি অনুসারে আমার কন্যার প্রাণদাতার প্রাণদণ্ডে সহায়তা করিব ?

মরিসন্‌কে বলিলাম—"হেন্‌রি যদি প্রকৃতই অপরাধী হয়, তাহা হইলে সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিয়া উহাকে ধরাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

মরিসন্ বলিলেন—"আপনি ত বলিয়াছেন যে উহাকে আপনি সাবধান করিয়া দিবেন এবং যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিবেন।"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—"কৈ তাহা ত আমি বলি নাই। উহাকে সাবধান করিয়া দিব বলিয়াছিলাম বটে কিন্তু যাহাতে সে ধৃত না হয় সে চেষ্টা করিব এমন কথা কখন বলিলাম ?" মরিসন্ ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আবার বলিলাম—"যদিও ধর্ম্মতঃ আমার তাহাই করা উচিত বটে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?" আমি গিরিবালার রোগ এবং হেন্‌রি কেমন করিয়া তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছে, তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বলিলাম।

শুনিয়া তিনি কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এ সকল সংবাদ আপনি পাইলেন কোথা বলুন দেখি ?"

তিনি বলিলেন—"মনে আছে, হেন্‌রি যখন প্রথম আসিয়াছিল, তখন আমি তাহার বাঙ্গালী-পরিচ্ছদ দেখিয়া অত্যন্ত হাসি এবং তাহার ফোটোগ্রাফ্ তুলিয়া লই ?"

"মনে আছে।"

"সেই ফোটোগ্রাফ্ আমি লণ্ডনের "ষ্ট্র্যাণ্ড্ ম্যাগাজিনে" পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। উহা ঐ পত্রের কিউরিয়সিটির ভিতর মুদ্রিত হইয়াছে! সেই ছবি দেখিয়া লণ্ডন-পুলিস হেন্‌রিকে চিনিতে পারিয়াছে। হেন্‌রিকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতার পুলিস-কমিসনারকে তাহারা অনুরোধ করিয়াছে। পুলিস-কমিসনার আমার কাছে হেন্‌রির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।"

"আপনি ঠিকানা বলিয়াছেন?"

"কি করিব, আইন অনুসারে আমি বলিতে বাধ্য।"

শুনিয়া আমি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। হেন্‌রিকে বাঁচাইবার আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। আহা! বুড়া বয়সে বেচারির অদৃষ্টে এই লেখা ছিল? আর আমার চোখের সম্মুখে তাহাকে হাত-কড়ি লাগাইয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই বা কি করিয়া সহ্য করি? আমি কি তাহার জন্য কিছুই করিবার অধিকারী নহি? আমিই ত তাহার মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেন আমি বাহাদুরী করিয়া তাহাকে বাঙ্গালীর কাপড় পরাইলাম! তাহা না করিলে ত ষ্ট্র্যাণ্ডে তাহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইবার অবসর হইত না! আমি যদি আমার প্রাণাধিকা দুহিতার জীবনদাতার প্রাণরক্ষার জন্য সচেষ্ট হই, তবে কি তাহা অন্যায়—অধর্ম্ম হইবে? আইনের চক্ষে আমি দোষী হইলেও, হে ঈশ্বর, তোমার চক্ষেও কি তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে? পরোপকার কি সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম নহে?

আমি মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছি,—হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। আমার বন্ধু হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভারি বিরক্ত হইলাম। মানুষ না পিশাচ? এই কি হাসিবার সময়? বিরক্তভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"আপনি দেখিতেছি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে আর আপনাকে কষ্ট দিব না। হেন্‌রি আপনার এবং আমারই মত সাধু সজ্জন ব্যক্তি। এবং উহার নাম শুধু হেন্‌রি নহে—সার্ হেন্‌রি রবিন্সন্!"

আমি ত অবাক্। সার্ হেন্‌রি রবিন্সন কি আবার? আমার বন্ধু উন্মাদ হইয়াছেন না কি? বলিলাম—"কি বলিতেছেন আপনি?"

"বলিতেছি এই কথা যে, আপনার ঐ কুলীর সর্দ্দারটি একদিন হাউস্ অব্ কমন্সে বক্তৃতা করিয়া স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন।"

আমার মনে হইল এ সকল প্রসঙ্গ এমনি অসম্ভব যে, হয়ত আমি জাগিয়া নাই, স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। বন্ধু আমার মুখের ভাব দর্শনে সমস্তই বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন। আমার হাতে একখানি বড় লেফাফা দিলেন। তাঁহারি স্বনামীয় পত্র, বিলাতী ডাকে আসিয়াছিল, শীল মোহর করা রেজেষ্ট্রী করা ছিল। চিঠি বাহির করিয়া আলোকের কাছে ধরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

পত্রখানি ষ্ট্রাণ্ড্ ম্যাগাজিনের কার্য্যালয় হইতে আসিয়াছে। নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "বাঙ্গালী পরিচ্ছদে ইংরাজ" ফোটোগ্রাফ্‌খানি আমরা সাদরে ষ্ট্র্যাণ্ড্ম্যাগাজিনের কিউরিয়সিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম। ইহার মূল্যস্বরূপ একখানি চেক্ পাঠাইলাম, প্রাপ্তি স্বীকার করিলে বাধিত হইব।

আপনি এই ফোটোগ্রাফ্‌খানি পাঠাইয়া শুধু আমাদের পাঠকের আমোদের আয়োজন করেন নাই, পরন্তু বেচারি "হেন্‌রির" বড়ই

উপকার করিয়াছেন। উহাঁর পূরা নাম সার্ হেন্‌রি রবিন্সন্। অদ্য প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

সার্ হেন্‌রি লণ্ডন সমাজের একজন গণ্য মান্য লোক। উন্মাদ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি দুইবার পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি একজন পরম পারদর্শী ব্যক্তি। গত দশ বৎসর হইতে তিনি এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যান;—গৃহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যান কেহ সন্ধান পায় না; তাঁহার পাগলামির লক্ষণ এই যে তিনি নিজেকে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া মনে করেন এবং পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আত্মীয় স্বজনেরা অন্বেষণ করিয়া আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন; সব সময়ে যে অন্বেষণে কৃতকার্য্য হন, তাহা নহে। একবার পাগল হইলে ছয় মাস আট মাস বা এক বৎসর ব্যাধিগ্রস্ত থাকেন। যে বার ধৃত না হন সেবার আরোগ্যলাভ করিলে নিজেই আবার গৃহে ফিরিয়া আসেন। যত দিন ভাল থাকেন, তত দিন উহাঁর একমাত্র কায নিজের জমিদারীভুক্ত দীন দুঃখী প্রজাদের রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া বেড়ানো।

গত বৎসর শীত-ঋতুতে ইনি রোগমুক্তাবস্থার বন্ধুগণের সহিত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান। তথায় পৌছিবার মাস দুই পরে বন্ধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। তাহার পর হইতে বেচারি সার্ হেন্‌রির জন্য অনেক বিফল অনুসন্ধান হইয়াছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে তাঁহার ছবি না বাহির হইলে আরও কত দিন যে এইরূপ অনুসন্ধান হইত তাহার স্থিরতা নাই। শুধু ছবি হইতে আমার বন্ধু তাঁহার খুল্লতাতকে হয়ত নাও চিনিতে পারিতেন, কিন্তু আপনি যে তাঁহার হাভানা সিগারের প্রতি

একান্ত আনুরক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে সনাক্ত করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সার্ হেন্‌রির বর্ত্তমান ঠিকানা আমাদিগকে জানান, তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

(স্বাক্ষর)

পত্রখানি পাঠ করিয়া বন্ধুকে প্রত্যর্পণ করিলাম। বলিলাম—"এমন ব্যাপার!"

মরিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, আপনি এতদিন সার্ হেন্‌রির আচার ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় কোনও রূপে তাঁহার পরিচয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন?"

হেন্‌রি সেদিন আমাকে তাহার ভূতজীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই মরিসন্‌কে বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"সুসংবাদ বটে। সার্ হেন্‌রি তবে আরোগ্যের পথে আসিয়াছেন।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব রহিলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি তাঁহাদিগকে হেন্‌রির—অর্থাৎ সার্ হেন্‌রির—ঠিকানা জানাইয়াছেন?"

"না। জানাইব বলিয়াই ত সংবাদ লইতে আসিয়াছি যে এখনও এখানে তিনি আছেন কি না।"

"তবে সংবাদ দিন। আহা! বেচারা কত কষ্টই পাইয়াছে।"

"তা আর নয়? অত বড়মানুষ হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান! কেমন করিয়া উঁহার দিন গুজরাণ হইত কে জানে?"

"দিন গুজরাণ শুধু নহে, হাভানা সিগার কোথা হইতে আসিত? পাগল সব ভুলিত,—পরিবার, পরিজন, বিষয়, পদমর্য্যাদা,—কিছুই মনে

থাকিত না। কেবল হাভানা সিগারটি ভুলিতে পারিত না। মৌতাত এমনি জিনিষ!"

মরিসন্ বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"সার্ হেন্‌রিকে কখন, কি ভাবে একথা জানাইবেন?"

আমি বলিলাম—"অবসর বুঝিয়া এক সময় কথা পাড়িব।"

বন্ধু সাবধান করিয়া দিলেন—"দেখিবেন, হঠাৎ না হয়। তাহা হইলে হয়ত বিপরীত ফল হইবে। একটু যা আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে তাহা অন্তর্হিত না হইয়া যায়।"

আমি বলিলাম—"সে সাবধানতা অবশ্য গ্রহণীয়। আপনার ষ্ট্র্যাণ্ড্ খানা আর চিঠিখানা দিয়া যান।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন প্রভাতে হেন্‌রির সঙ্গে দেখা হইলে প্রথমে তাহাকে ষ্ট্র্যাণ্ড্ ম্যাগাজিনে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখাইলাম। ছবি দেখিয়া এবং ছবির নিম্নস্থ বিবরণ পড়িয়া সে মৌন হইয়া রহিল।

সমস্ত দিন আর সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম না।

অপরাহ্নে তাহার সহিত আম-বাগানে পদচারণা করিতেছিলাম। খোকার অসুখ করিয়াছে বলিয়া গিরিবালা বেচারি বেড়াইতে আসিতে পায় নাই। ষ্ট্রাণ্ডের কথা তুলিলাম। এ কথা সে কথার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"ষ্ট্র্যাণ্ডের সম্পাদকের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

হেন্‌রি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিল—"আছে। কেন?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া হেন্‌রির হাতে ষ্ট্র্যাণ্ড্ সম্পাদকের পত্রখানি দিলাম। তখনও যথেষ্ট দিবালোক ছিল। হেন্‌রি পত্রখানি হাতে করিয়া এ পিঠ ও পিঠ দেখিতে লাগিল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কার পত্র ?"

"ষ্ট্র্যাণ্ড্ সম্পাদকের পত্র।"

"না। এ কার নামে আসিয়াছে ? মরিসন্ কে ?"

"সেই যে আমার সেই বন্ধু, যিনি তোমার ফোটো তুলিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মরিসন্। পড় না।"

হেন্‌রি পত্রখানি পড়িল। আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। যতক্ষণ পত্র পড়িতেছিল, ততক্ষণ তাহার স্বচ্ছ সুন্দর বার্দ্ধক্য রেখাঙ্কিত মুখে কত রকমের ভাব খেলিয়া গেল !

পত্র পড়িয়া হেন্‌রি মুখখানি ম্লান করিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"সার্ হেন্‌রি।"

হেন্‌রি যেন চমকিয়া উঠিল। বুঝিলাম এখনও হেন্‌রি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। পত্রে পড়িল আমরা তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়াছি, অথচ তাহার প্রকৃত নামে ডাকাতে সে চমকিল।

হেন্‌রি বলিল—"কি ?"

আমি বলিলাম—"আমাদিগকে মাপ কর।"

"কেন ?"

"তোমার প্রকৃত পরিচয় অবগত ছিলাম না; আতিথ্যের কত ত্রুটি হইয়াছে ! কত কষ্ট পাইয়াছ ! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর।"

হেন্‌রি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের আশ্চর্য্য সহৃদয়তা, অমায়িকতা, পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমাদের উপকার বিস্মৃত হইব না।"

"আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি হেন্‌রি? তুমিই বরং আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাইয়াছ।"

হেন্‌রির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল। গিরিবালার প্রসঙ্গ মাত্রেই সে আনন্দিত হইত। বলিল—"আমি যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাইয়া থাকি, তুমিও ত আমাকে তাহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়াছ।"

আমি মনে করিলাম, হেন্‌রি আতিথ্যের উল্লেখ করিতেছে। বলিলাম—"আমি আর তোমায় কি দিয়াছি? আমি যৎসামান্য যাহা তোমার জন্য করিয়াছি, তুমি আমার কর্ম্মে সহায়তা করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়াছ।"

হেন্‌রি আবার হাসিল;—"না না, তাহার অপেক্ষা তুমি আমাকে ঢের বেশী মূল্যবান্ জিনিষ দিয়াছ।"

"কি?"

"কেন, গিরিবালাকে আমায় দিয়াছ। হাসিলে যে! কেন? ভারি অসম্ভব নাকি? তুমি ত ব্রাহ্ম, তোমার ত জাতিচ্যুতির ভয় নাই। গিরিবালাকে আমি বিলাতে লইয়া গিয়া উহাকে সেখানে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, উহাকে মানুষ করিব, লেখাপড়া শিখাইব, তাহার পর হয়ত কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত লণ্ডনপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

আমি বলিলাম—"না সাহেব! সে কি হয়? আমি ছাড়িলেও, আমার স্ত্রী ছাড়িবেন কেন?"

হেন্‌রি ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া বলিল—"বেশ! মনে নাই? তিনি ত গিরিবালাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

* * * * *
* * * * *

সার্‌ হেন্‌রি এখন বিলাতে। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত কথাবার্ত্তার এক মাস পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রতি মেলেই চিঠি পাই।

গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য হেন্‌রি মহা হাঙ্গাম করিয়াছিল। তাহার পাগ্‌লামী প্রায় অন্তর্হিত হইলেও, এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। এক এক বার বুঝিত অন্যায় আব্দার করিতেছে, কিন্তু তবু আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না। শেষকালটা আমি মত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তাঁহাকে আমি কত বুঝাইলাম, তাঁহার শপথ স্মরণ করাইলাম, কিছুতেই তিনি শুনিলেন না। এইবার গিরিবালাকে বেথুন ইস্কুলে পাঠাইয়া দিব ভাবিতেছি, নহিলে মেয়েটা মূর্খ হইবে যে। গিরির মা যেরূপ কন্যাগত প্রাণ, মেয়ের সঙ্গে যাইতে না চাহিলে হয়। তা, গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিদ্যার দৌড়—থাক্‌ আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশ করিব না।

হেন্‌রি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আমার সঙ্গে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের আশ্চর্য্য সহৃদয়তা, অমায়িকতা, পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমাদের উপকার বিস্মৃত হইব না।"

"আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি হেন্‌রি? তুমিই বরং আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাইয়াছ।"

হেন্‌রির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি দেখা দিল। গিরিবালার প্রসঙ্গ মাত্রেই সে আনন্দিত হইত। বলিল—"আমি যদি তোমার মেয়েকে বাঁচাইয়া থাকি, তুমিও ত আমাকে তাহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়াছ।"

আমি মনে করিলাম, হেন্‌রি আতিথ্যের উল্লেখ করিতেছে। বলিলাম—"আমি আর তোমায় কি দিয়াছি? আমি যৎসামান্য যাহা তোমার জন্য করিয়াছি, তুমি আমার কর্ম্মে সহায়তা করিয়া তাহার ঋণ শোধ করিয়াছ।"

হেন্‌রি আবার হাসিল;—"না না, তাহার অপেক্ষা তুমি আমাকে ঢের বেশী মূল্যবান্ জিনিষ দিয়াছ।"

"কি?"

"কেন, গিরিবালাকে আমায় দিয়াছ। হাসিলে যে! কেন? ভারি অসম্ভব নাকি? তুমি ত ব্রাহ্ম, তোমার ত জাতিচ্যুতির ভয় নাই। গিরিবালাকে আমি বিলাতে লইয়া গিয়া উহাকে সেখানে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিব, উহাকে মানুষ করিব, লেখাপড়া শিখাইব, তাহার পর হয়ত কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত লণ্ডনপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের সহিত উহার বিবাহ দিব।"

আমি বলিলাম—"না সাহেব! সে কি হয়? আমি ছাড়িলেও, আমার স্ত্রী ছাড়িবেন কেন?"

হেন্‌রি ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া বলিল—"বেশ! মনে নাই? তিনি ত গিরিবালাকে আমায় দান করিয়াছেন।"

*　　*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*　　*

সার্ হেন্‌রি এখন বিলাতে। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত কথাবার্ত্তার এক মাস পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রায় প্রতি মেলেই চিঠি পাই।

গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য হেন্‌রি মহা হাঙ্গাম করিয়াছিল। তাহার পাগ্‌লামী প্রায় অন্তর্হিত হইলেও, এই বিষয়ে তাহার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই। এক এক বার বুঝিত অন্যায় আব্দার করিতেছে, কিন্তু তবু আত্মসম্বরণ করিতে পারিত না। শেষকালটা আমি মত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তাঁহাকে আমি কত বুঝাইলাম, তাঁহার শপথ স্মরণ করাইলাম, কিছুতেই তিনি শুনিলেন না। এইবার গিরিবালাকে বেথুন ইস্কুলে পাঠাইয়া দিব ভাবিতেছি, নহিলে মেয়েটা মূর্খ হইবে যে। গিরির মা যেরূপ কন্যাগত প্রাণ, মেয়ের সঙ্গে যাইতে না চাহিলে হয়। তা, গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার বিদ্যার দৌড়—থাক্ আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশ করিব না।

বিষবৃক্ষের ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে একটি দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়ীটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধবিহীন। প্রবেশ করিলেই তাহাকে "মেসের বাসা" বলিয়া ভ্রম জন্মে না। সিঁড়িগুলি প্রশস্ত, —জলে কাদায় পিচ্ছিল নহে, অন্ধকার নহে। উপরের কক্ষগুলির কোনটিতে একাধিক শয্যা নাই এবং সেগুলি টেবিল, চেয়ার, পুস্তকাধার, কাচের আলমারি প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। ভিত্তিগাত্র দুই চারিখানি করিয়া সুরুচিসঙ্গত নয়নাকর্ষক চিত্রে সমলঙ্কৃত। গৃহটির সর্ব্বত্রই আরাম ও স্বচ্ছলতার একটা ভাব বিদ্যমান।

এটি কিন্তু মেসের বাসা না হইলেও পুরুষের বাসা বটে। সোণা-মুখীর জমিদার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের দুইটি যুবক এ বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করে। দুইজনের একজন কার্য্যোপলক্ষে বাটী গিয়াছে। যে আছে তাহার নাম চারু, বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করে। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর। মুখশ্রী স্ত্রীলোকের মত কোমল, ঢল ঢল ভাবাপন্ন, চক্ষু দুইটি সরলতামাখা, দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

আজ জন্মাষ্টমীর ছুটি। কলেজ বন্ধ। আহারান্তে চারু একখানি উপন্যাস হস্তে শয্যাগ্রহণ করিয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিল,

এমন সময় তাহার দুইজন বন্ধু বিপিন ও নগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন ও নগেন্দ্র চারুর সমবয়স্ক। ইহারা বি-এ. পাস করিয়া আইন পড়িতেছে। নগেন্দ্র মহা ধনীর সন্তান, বিপিন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। ইহারা চারুর ন্যায় সুকোমল নহে। ক্রিকেটে, ফুটবলে খুব নাম; বাল্যকাল হইতে জিম্‌ন্যাষ্টিকপরায়ণ। নব্যতন্ত্রের এক একটি গুণ্ডা বলিলেই হয়। নগেন্দ্র ত দুইবার পাহারাওয়ালাকে প্রহার করিয়া পুলিসকোর্টে জরিমানা দিয়াছে।

চারুকে দেখিয়াই দুইজনে যুগপৎ বলিয়া উঠিল—"কি চারু, শ্বশুর-বাড়ী যাওনি?"

চারু শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে কি না, এই বিষয় লইয়া নগেন্দ্র ও বিপিন পথে মহা তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে তাহারা হাসিতে হাসিতে সেই সকল গল্প করিল। তাহার পর নানা কথা আসিয়া পড়িল। কথাবার্ত্তার স্রোত মন্দা হইলে, চারু নগেন্দ্রকে গাহিতে অনুরোধ করিল। নগেন্দ্রের পিতা ওস্তাদ রাখিয়া বাল্যকালে কয়েক বৎসর তাহাকে গীত বাদ্য শিখাইয়াছিলেন— সে দিব্য গাহিতে পারিত। বলিল—

"কি গাইব?"

"আজ জন্মাষ্টমী—একটা কৃষ্ণবিষয় গাও।"

নগেন্দ্র রাগিয়া বলিল—"দেখ তোমার ভণ্ডামিগুলো আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনে। সোণামুখীর বাঁড়ুয্যেরা যে পরম বৈষ্ণব তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হতভাগা যে আমাদের চেয়েও যবন, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন, তাও বিলক্ষণ জানি। তোমার কৃষ্ণভক্তির ভাণ আমার অসহ্য।"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"অত চট কেন হে? সে দিন তোমাদের বাড়ীতে শ্যামবাজারের নাট্যসমিতি বিষবৃক্ষের যে অভিনয় করেছিল,

তাতে হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানটি কেমন হয়েছিল বল দেখি?—সেইটি গাও না,—আমার ত ভারি চমৎকার লেগেছিল ভাই।"

চারু বলিল—"খবরদার অশ্লীল গান টান আমাদের বাড়ীতে গেও না—আমরা কৃষ্ণপ্রেমী লোক।"

হাসিয়া নগেন গুণ্ গুণ্ করিয়া সুর ধরিল; বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—"গোড়াটা কি হে?"

"শ্রীমুখ পঙ্কজ—"

নগেন্দ্র গাহিল—

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখ্ব বলে হে
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
ইত্যাদি।

সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চারু ও বিপিন একে একে যোগ দিল। গান খুব জমিয়া গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। নিম্নে পথচারী লোকজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া শুনিয়া লইল। একবার —দুইবার—তিনবার গাহিয়া গান শেষ হইল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর নগেন্দ্র আবার গুণ্ গুণ্ করিয়া ধরিল—

মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী।

—গানটার নেশা যেন আর কিছুতেই ছুটিতেছে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—"নগেন, তোর বউ মান করেছে নাকি রে? মান মান করে অত ক্ষেপ্লি কেন তুই?"

নগেন গান বন্ধ করিয়া বলিল—"আমার বউ ত এখানে নেই। আমার শালীর বিয়ের সময় গেছে এখনও আসেনি।"

"চিঠিতেও ত মান হয়।"

"কি জানি ভাই, মান হয়েছে কিনা, এক হপ্তা কিন্তু চিঠি পাইনি।"

"তবে যাও বৈষ্ণবী সেজে গিয়ে মান ভাঙ্গিয়ে এসগে। বেশ গলাটি আছে, গান শোনাবে; যখন পুরস্কার দেবার সময় হবে তখন বল্‌বে 'ধনি তব মান রতন দেহ মোয়।' যথারীতি 'গদ গদ' হয়ে বল্‌বে, হেসে ফেলো না যেন।"

চারু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর ভাই! ইংরিজি শিক্ষার জ্বালায় মান টান সব দেশ থেকে উঠে গেল।"

এই উৎকট নূতন মন্তব্যটা শুনিয়া নগেন ও বিপিন চমকিয়া উঠিল। বলিল—"কি রকম—কি রকম?"

চারু বলিল—"ইংরিজি পড়ে লোকে যে রকম স্ত্রীবৎসল হয়ে উঠ্‌ছে—চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীর 'শ্রীচরণের ছুঁচো' হয়ে পড়ে থাক্‌লে সে বেচারি মান কর্‌বার অবসর পাবে কখন বল?"

বিপিন ও নগেন চারুর এই গবেষণায় বিস্মিত হইয়া পড়িল। বিপিন বলিল—"ব্রাভো চারু!—মনোজগতে তোমার এই আবিষ্কার, জড়জগতে কলম্বসীয় আবিষ্কারের চেয়ে একটুও কম নয়।"

নগেন বলিল—"বাঃ চারু! তুই দুদিন বিয়ে করে প্রেমশাস্ত্রে এমন পরিপক্ব হয়ে উঠ্‌লি? আমি দু বচ্ছরে যে এ তত্ত্ব পাইনি!"

বর্দ্ধিত উৎসাহে চারু বলিল—"মানটা প্রণয়ে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ। অপরাধ আবার যে সে অপরাধ নয়—সন্দেহ হওয়া চাই যে প্রণয়পাত্র অবিশ্বাসী—"

বাধা দিয়া নগেন্দ্র বলিল—"না চারু! তোমার থিওরি ভারি খেলো হয়ে পড়্‌ল। তুমি প্রেমতত্ত্বের কিচ্ছু জান না,—তুমি নিরেট মুখ্য ষ্টুপিড্ ফূল। তুমি ক'বার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছ?

তাতে হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানটি কেমন হয়েছিল বল দেখি?—সেইটি গাও না,—আমার ত ভারি চমৎকার লেগেছিল ভাই।"

চারু বলিল—"খবরদার অশ্লীল গান টান আমাদের বাড়ীতে গেও না—আমরা কৃষ্ণপ্রেমী লোক।"

হাসিয়া নগেন গুণ্ গুণ্ করিয়া সুর ধরিল; বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—"গোড়াটা কি হে?"

"শ্রীমুখ পঙ্কজ—"

নগেন্দ্র গাহিল—

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখ্‌ব বলে হে
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
ইত্যাদি।

সুর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চারু ও বিপিন একে একে যোগ দিল। গান খুব জমিয়া গেল। স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। নিম্নে পথচারী লোকজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া শুনিয়া লইল। একবার—দুইবার—তিনবার গাহিয়া গান শেষ হইল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর নগেন্দ্র আবার গুণ্ গুণ্ করিয়া ধরিল—

মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী।

—গানটার নেশা যেন আর কিছুতেই ছুটিতেছে না।

বিপিন হাসিয়া বলিল—"নগেন, তোর বউ মান করেছে নাকি রে? মান মান করে অত ক্ষেপ্‌লি কেন তুই?"

নগেন গান বন্ধ করিয়া বলিল—"আমার বউ ত এখানে নেই। আমার শালীর বিয়ের সময় গেছে এখনও আসেনি।"

"চিঠিতেও ত মান হয়।"

"কি জানি ভাই, মান হয়েছে কিনা, এক হপ্তা কিন্তু চিঠি পাইনি।"

"তবে যাও বৈষ্ণবী সেজে গিয়ে মান ভাঙ্গিয়ে এসগে। বেশ গলাটি আছে, গান শোনাবে; যখন পুরস্কার দেবার সময় হবে তখন বল্‌বে 'ধনি তব মান রতন দেহ মোয়।' যথারীতি 'গদ গদ' হয়ে বল্‌বে, হেসে ফেলো না যেন।"

চারু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর ভাই! ইংরিজি শিক্ষার জালায় মান টান সব দেশ থেকে উঠে গেল।"

এই উৎকট নূতন মন্তব্যটা শুনিয়া নগেন ও বিপিন চমকিয়া উঠিল। বলিল—"কি রকম—কি রকম ?"

চারু বলিল—"ইংরিজি পড়ে লোকে যে রকম স্ত্রীবৎসল হয়ে উঠ্‌ছে—চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীর 'শ্রীচরণের ছুঁচো' হয়ে পড়ে থাক্‌লে সে বেচারি মান কর্‌বার অবসর পাবে কখন বল ?"

বিপিন ও নগেন চারুর এই গবেষণায় বিস্মিত হইয়া পড়িল। বিপিন বলিল—"ব্রাভো চারু!—মনোজগতে তোমার এই আবিষ্কার, জড়জগতে কলম্বসীয় আবিষ্কারের চেয়ে একটুও কম নয়।"

নগেন বলিল—"বাঃ চারু! তুই দুদিন বিয়ে করে প্রেমশাস্ত্রে এমন পরিপক্ক হয়ে উঠ্‌লি ? আমি দু বচ্ছরে যে এ তত্ত্ব পাইনি!"

বর্দ্ধিত উৎসাহে চারু বলিল—"মানটা প্রণয়ে অপরাধের দণ্ডস্বরূপ। অপরাধ আবার যে সে অপরাধ নয়—সন্দেহ হওয়া চাই যে প্রণয়পাত্র অবিশ্বাসী—"

বাধা দিয়া নগেন্দ্র বলিল—"না চারু! তোমার থিওরি ভারি খেলো হয়ে পড়্‌ল। তুমি প্রেমতত্ত্বের কিচ্ছু জান না,—তুমি নিরেট মুখ্যু ষ্টুপিড্ ফূল। তুমি ক'বার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছ ?

শুনিয়া নগেন্দ্রের মুখ হইতে তর্কযুক্তির বৈদ্যুতী প্রবাহিত হইল। ফলতঃ অনতিবিলম্বে চারু ও বিপিনকে তাহার সহিত একমত হইতে হইল।

তাহাদের মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল, উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। কি সুন্দর! কি চমৎকার! কি মজা! বাস্তবিক ইহা এমন একটা জিনিষ যাহার জন্য অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে গল্প করিবার কত বড় একটা উপাদান হইবে!

এই বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইল। বারুদের স্তূপে আগুন লাগিবামাত্র তাহা যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে, এই নবীন বন্ধু-ত্রয়ের কল্পনাও তেমনি অগ্নিময়ী হইয়া উঠিল।

চারু বলিল—"আমরা বৈষ্ণবীর সাজ পোষাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেটার বিষয় কি ভাবছ?"

নগেন্দ্র বলিল—"কেন, আমাদের করুণাময় রয়েছে। সে সাজিয়ে দেবে এখন। সাজ পোষাকও সব তার আছে।"

"করুণাময় আবার কে?"

"করুণাময়,—আমাদের করুণা হে। শ্যামবাজার নাট্যসমিতির ড্রেসিং মাষ্টার। ও সব বিষয়ে সে একজন খুব পাকা লোক।"

"আর, গোটাকতক বৈষ্ণবীর গান শিখে অভ্যাস করে নিতে হবে, শ্রীমুখ পঙ্কজটা ত আর সেখানে গাওয়া চল্‌বে না!"

"নিশ্চয় না। সন্দেহ কর্‌বে যে। বিষবৃক্ষ আর কোন্ মেয়ে পড়েনি?"

পরামর্শ সমস্ত ঠিক হইলে বিপিন বলিল,—"সব যেন হল, কিন্তু চারুর বউকে কে চিনিয়ে দেবে?"

নগেন্দ্র বলিল—"তার জন্যে ভাবনা কি? কথায় বার্তায় আমি সে সব বের করে নেব।"

"এই ত সেদিন গিয়েছিলাম। বল ত আবার যাই।"

"যাও, আজই যাও। বরং আমরাও সঙ্গে যাই।"

বিপিন বলিল—"তীর্থের পাণ্ডা হয়ে নাকি? বাস্তবিক চারু! তোর বউকে এখনও দেখাতে পার্‌লিনে। এই বেলা দেখা, এখনও কনে আছে। এর পর ধেড়ে মাগী হয়ে উঠ্‌লে কি আর দেখাতে পার্‌বি, না দেখাতে পাবি?"

চারু বলিল—"কেন? জান ত আমি অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী নই। আমি কোন দিন আমার স্ত্রীকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসে তোমাদের সকলকে ডিনারে নেমন্তন্ন কর্‌ব। তাঁর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব।"

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ, ও সব বাজে কথা রেখে দাও। তোমার স্ত্রীকে আমরা দেখ্‌তে চাই—এবং অবিলম্বে। চল তোমার শ্বশুরবাড়ী।"

"চল" বলিয়া চারু ঝটিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। চাদর লইয়া ছাতা লইয়া যাইবার ভাণ করিল।

নগেন বলিল—"ও সব চালাকি নয়। সত্যি আমি একটা মৎলব ঠাউরেছি। ভারি নূতন আর ভারি সাহসিক।"

বিপিন ও চারু বিস্মিত হইয়া নগেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিল।

নগেন্দ্র বলিল—"দেখ চারু! তুমি শ্বশুরবাড়ীতে দু তিনবার মাত্র গিয়েছ। একদিনের বেশী কখনও ছিলে না। বাস্তবজীবনে একবার বিষবৃক্ষের অভিনয় করা যাক্ এস। আমরা তিনজনে বৈষ্ণবী সেজে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গোটা দুই গান শুনিয়ে আসি চল।"

চারু ও বিপিন হাসিল। কারণ এ প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। নগেন্দ্রকে তাহারা সে কথা বলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার দুই দিন পরে, বেলা বারোটার সময়, চাঁদপাল ঘাট হইতে নবীনা বৈষ্ণবীত্রয়ের নৌকা ছাড়িল।

করুণাময়ের বাহাদুরী আছে বটে। তিন জন যুবাকে সে চমৎকার ছদ্মবেশে সাজাইয়াছে। মুখমণ্ডল হইতে গুম্ফশ্মশ্রুর চিহ্ন মাত্র তিরোহিত। চুলেরই বা কি বাহার! কে বলিবে তাহা কৃত্রিম! ছদ্মবেশে সাজাইতে করুণাময় বিশিষ্ট প্রতিভান্বিত।

আন্দুলমৌরি গ্রামে চারুর শ্বশুরালয়। দিবসে চারি বার ষ্টীমার ছাড়ে। ষ্টীমারে এক ঘণ্টার পথ, নৌকায় যাইলে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। প্রথমে ষ্টীমারে যাইবার পরামর্শ হইয়াছিল। কিন্তু ষ্টীমারে সহস্রলোকের নয়নপথবর্ত্তী হওয়াটা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে হইল না। তাই যাতায়াতের জন্য একখানি নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে।

নৌকাও ছাড়িল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। বিপিন বলিল—"বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! বিষবৃক্ষ—গোড়া থেকেই বিষবৃক্ষ। আকাশে মেঘের ঘটাখানা দেখ একবার। ওহে নগেন্দ্র, তোমার সূর্য্যমুখী কি বলে দিয়েছেন?"

নগেন্দ্র বলিল—"ভার্য্যাসূর্য্যমুখী বলে দিয়েছেন, মেঘ উঠ্‌লে ঝড়ের সম্ভাবনা দেখ্‌লে নৌকা ঘাটে লাগাতে। মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছেন। তা, আন্দুলের ঘাটে নৌকা বেঁধে একবার কুন্দনন্দিনীদের বাড়ীতে যাওয়া যাবে এখন।"

চারু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত বলিল—"দূর হতভাগা!"

আকাশে মেঘ, গঙ্গাবক্ষে স্নিগ্ধ সমীর সঞ্চার। দেহ দোদুল্যমান, মন পুলকপূর্ণ। তিন জনে নৌকার মুখের কাছে বসিয়া ক্ষেপার

তালে তালে গান আরম্ভ করিল। এই গানগুলা তাহারা দুই দিন ধরিয়া ক্রমাগত অভ্যাস করিতেছে। পরীক্ষার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে হলে প্রবেশ করিবার সময়, বালকেরা যেমন বহিগুলা একবারে শেষ-বার উল্টাইয়া লয় সেইরূপ আর কি।

বর্ব্বর মাঝিগুলা দাঁড় টানিতে টানিতে সহাস্য নেত্রে ইহাদের পানে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন আরোহী বহুভাগ্যে মিলে। বিপিন তাহাদের একটা ধমক দিয়া বলিল—"কি দেখ্‌ছিস্ হাঁ করে ?"

গানে গল্পে তিন ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইল। মেঘ মেঘই রহিল, বৃষ্টি হইল না, ঝড়ও উঠিল না। লাভের মধ্যে রৌদ্রক্লেশ নিবারিত হইল।

রাজগঞ্জের ঘাটে নৌকা ভিড়িবামাত্র, বৈষ্ণবী তিন জন এক এক লম্ফে নিম্নে অবতরণ করিল। সুন্দরী স্ত্রীলোকের এইরূপ চপলতা ও তৎপরতা দেখিয়া সমস্ত লোক অবাক হইয়া ইহাদের পানে চাহিয়া রহিল। দুই চারিটা কুরসিকতার বাক্যও বৈষ্ণবীদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিপিন হাসিল, নগেন রাগিল, চারুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। রাজগঞ্জের হাট হইতে আন্দুলে চারুর শ্বশুরালয় একক্রোশ পথ। চারু বলিল—"একটু ধীরে সুস্থে যাওয়া যাক্ চল। চারটের কমে আমার শ্বশুর ডিস্পেন্সারিতে যান না।"

চারুর শ্বশুর আন্দুলের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রমণীমোহন বাবু। বেশ হাতযশ, খুব পশার প্রতিপত্তি। বেলা এগারোটা বারোটার সময় তিনি "কল্" হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বৈকালে চারিটার সময় বাহির হন। বাজারে তাঁহার ডিস্পেন্সারি আছে, তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে যান। আবার

সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার সময় বাড়ী আসেন। চারুর এ সমস্ত জানা ছিল। গৃহসন্ধানী ভিন্ন অপর কেহ কি চুরি করিতে যাইতে সাহস পায়?

তিন বন্ধু অত্যন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া বনপথ। সঙ্কীর্ণ পথ, দুইধারে বন। এই বনের দৃশ্য কলিকাতা-বাসী যুবকগণের পিপাসিত চক্ষুতে বড়ই ভাল লাগিল। কখনও গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বটানি বিদ্যার আলোচনা করে, কখনও কোনও পচা শৈবালময় পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করে, কখনও একটা ভাঙ্গা শিবমন্দিরের সোপানে বসিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার বয়স নির্ণয় করে, আর কখনও বা একটা বনের ফল তুলিয়া দংশন করিয়া দেখে তাহা আহার-যোগ্য কি না। একবার একটা ছেলে সাপ বাহির হইয়া কিল্‌বিল্ করিতে করিতে তাহাদের পায়ের অতি নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সাপ দেখিবামাত্র তাহারা আঁৎকাইয়া সাত হাত পিছু হটিয়া গেল এবং ওজস্বিনী ভাষায় সর্পজাতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। কোথায় আশ্রয়? চারিদিকে বন। দূরে কেবল একটা ভগ্ন জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে। চারু ও বিপিন বলিল—"এই তেঁতুল গাছটার তলায় দাঁড়াই এস। কোথায় ও মন্দিরে যাবে, সাপ আছে না কি আছে?"

নগেন বলিল—"যদি বেশী আসে," বলিয়া সে মন্দির লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। চারু ও বিপিন বৃক্ষতলেই দাঁড়াইয়া রহিল। মন্দিরে পৌছিয়া নগেন্দ্র দেখিল, ভিতরে কোনও দেবমূর্ত্তি নাই, কেবল একটা ছাগল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন দরোয়ানবেশী যণ্ডামার্ক খোট্টা, সেও ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

নগেন্দ্রকে দেখিয়াই সে ব্যক্তি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। নগেন্দ্র নিতান্ত আমোদ বোধ করিল। তাহাকে স্ত্রীজনোচিত কোমলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে গা ?"

"আমার নাম নাথু মণ্ডল। আমি রাজাদের বাড়ীর দরোয়ান।"

এই সময় অন্ধকার করিয়া জলটা খুব জোরে আসিল। সে ব্যক্তি নগেনের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। একগাল হাসিয়া বলিল—"বোষ্টুমি-দিদি তুমি বড় খপ্‌সুরত।" নগেন্দ্র সরিয়া দাঁড়াইল এবং বিরক্তির সহিত অন্যদিকে চাহিল। সহসা লোকটা নগেন্দ্রের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নগেন্দ্রের বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ডবেগে তাহার নাসিকায় পতিত হইল। এই অতর্কিত আঘাতে সে ঠিকরাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িল। তাহার নাসিকা দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত বহিল।

স্ত্রীলোকের নিকট এ প্রকার মার খাইয়া সে ব্যক্তি প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, তাহার রসিকতা দারুণ রোষে পরিণত হইল।

চক্ষু পাকাইয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—"মেয়ে মানুষ হয়ে আমার সঙ্গে লড়্‌বি হারামজাদি ? আমি তোকে খুন করে এইখানে পুঁতে ফেল্‌ব।"

বলিয়া সে নগেন্দ্রকে আক্রমণ করিল। নগেন্দ্র দুর্ব্বৃত্তটার উপর শিক্ষিত হস্তে ঘুঁসির উপর ঘুঁসি চালাইতে লাগিল। ক্রমে রসিক চূড়ামণি জখম হইয়া পড়িলেন। তখন নগেন্দ্র তাহাকে মন্দিরের কোণে ঠাসিয়া, বিপুল বলের সহিত বামহস্তে তাহার বক্ষ এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। সে ব্যক্তি যাতনায় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

জলটা ছাড়িয়া যাওয়াতে এই সময় চারু ও বিপিন আসিয়া পৌছিল। ব্যাপার দেখিয়া নিমেষের মধ্যে তাহারা সমস্তই বুঝিতে পারিল। বলিল—"নগেন্ কল্লি কি? শেষে কীচক বধ? ছাড়্ ছাড়্—মরে যাবে বেটা।"

কীচক দেখিল, একজন দ্রৌপদী ছিল, তিনজন হইল। আতঙ্কে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মায়ি! দোহাই মায়ি! তোদের পায়ে পড়ি মায়ি!"

নগেন্দ্র বলিল—"আর কখনো কর্‌বি এমন কায?"

"না মায়ি। আর কখনও কর্‌ব না মায়ি।"

নগেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"দে বেটা নাকে খৎ দে। এক হাত মেপে।"

প্রাণের দায়ে নাথু মণ্ডল যথাদিষ্ট কার্য্য করিল।

তাহার পর নগেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া পথে নামাইয়া দিল। সে ব্যক্তি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাতরাইতে কাতরাইতে অদৃশ্য হইল।

তিনজনে তখন মন্দিরে দাঁড়াইয়া মহা হাসি। নগেন্দ্র গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া বস্ত্রাদি সুসম্বৃত করিয়া লইল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, গন্তব্য পথাভিমুখে সকলে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকাল। চারুর শ্বশুর বাড়ীতে, রান্নাঘরের রকে বসিয়া বড়-বধূ একখানি আধুনিক উপন্যাস পাঠে ব্যাপৃতা আছেন। গৃহিণী (চারুর শ্বশ্রূ) এবং একপাল মেয়ে তাহা শ্রবণতৎপর।

গৃহিণী বলিলেন—"বউমা. আর না, বেলা গেল—আজ বই বন্ধ কর।"

নবীনারা বলিল—"তাও কি হয়?—আগে সুবালার সঙ্গে শরৎ-কুমারের বিয়েটা হোক্।"

গৃহিণী বলিলেন—"তবে তোমরা বিয়ে দাও বাছা, আমি উঠি।"

এই সময় সদর দরজার বাহিরে শব্দ শ্রুত হইল—"জয় রাধে।"

বড় বউ তাঁহার ছোট মেয়ে সুশীলাকে বলিলেন—"দেখ্‌ত দেখ্‌ত কে?"

সুশীলা উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। সদর দরজাকে আড়াল করিয়া একটু-খানি ইষ্টকের প্রাচীর। সুশীলা প্রাচীরের সীমান্তে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া বাহিরে দেখিল। পরক্ষণেই পুলকহাস্যের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল—

"ও মা—বোষ্টুমি মা—গান গাইতে এসেছে মা।"

তাহার মা শ্বশ্রূর প্রতি চাহিলেন। তিনি সম্মতিসূচক শিরশ্চালনা করিলেন। বড়বউ মেয়েকে ইসারা করিয়া বলিলেন—"ডাক্ ডাক্।"

সুশীলা বৈষ্ণবিগণকে লইয়া আসিল।

বৈষ্ণবীগণের বেশবিন্যাস, ধরণধারণ ও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত চক্ষু দেখিয়া রমণীমণ্ডলীর মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হইল। অরক্ষিত অভুক্ত প্রভুবিহীন দেশী বিড়ালের সঙ্গে সযত্নপালিত শুভ্রকান্তি আদরের বিলাতী বিড়ালের যে প্রকার বিভিন্নতা, সচরাচর দৃষ্ট বৈষ্ণবী ভিক্ষুকের সঙ্গে ইহাদের সেই প্রকার বিভিন্নতা অনুভূত হইল।

বৈষ্ণবীরা বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথায় বসিবে? ভূমিতে বসিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গৃহিণী এক-জনকে বলিলেন—"একখানা কম্বল এনে দে।"

বৈষ্ণবীরা কম্বলের উপর উপবেশন করিল। চারু বুদ্ধি করিয়া দুইজনের পশ্চাতে একটু আড়ালে বসিল।

নগেন্দ্র খঞ্জনীতে একটু আওয়াজ দিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি শুন্‌বেন?"

কেহ "গোবিন্দ অধিকারী" কেহ "গোপাল উড়ে" কেহ "দাশুরায়" ফর্‌মাস্ করিল না। হায়! এখনকার মেয়েরা এ সকলের আস্বাদন কি জানিবে? গৃহিণী বাল্যকালে এ সকল শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কুসঙ্গে পড়িয়া তৎসমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই এই সভায় রামায়ণ কিংবা মহাভারতের পরিবর্ত্তে প্রণয়প্রাণ উপন্যাস পাঠ চলিতেছিল। রামায়ণ মহাভারতাদির অপেক্ষা আধুনিক নাটক নভেলই গৃহিণীর বিশেষ রুচিকর লাগিত। যদিও তিনি তাহা মুখে কখনও স্বীকার করিতেন না, তথাপি তাঁহার কন্যারা পুত্রবধূরা ইহা জানিত। তাই তাহারা তাঁহার মৌখিক অনিচ্ছার বিরুদ্ধে আব্দার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিত। তিনি সারাক্ষণ আগ্রহের সহিত কাণ খাড়া করিয়া সমস্ত শুনিতেন। কিন্তু শেষ হইলে বলিতেন—"কি সব বাবু! ঠাকুর দেবতাদের কথা নয় কিছু নয়!"

যাহা হউক, সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল—"আমরা আর কি বল্‌ব বাছা! তোমাদের যা ভাল আছে তাই গাও।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কৃষ্ণবিষয়?"

গৃহিণী বলিলেন - "বেশ, কৃষ্ণবিষয়ই গাও।"

নগেন্দ্র গান আরম্ভ করিল, তাহার পর বিপিন যোগ দিল। স্বর যখন উচ্চে উঠিল, তখন পশ্চাৎ হইতে চারুও সাবধানে নিজ কণ্ঠ মিলাইল। গানটি জ্ঞানদাসের একটি পদ। শ্রোত্রীগণ তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু জ্ঞানদাসের সুমধুর পদবিন্যাস এবং

সুকণ্ঠ গায়কগণের মিলিত উচ্ছ্বসিত সুস্বরলহরীতে সকলে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। দুইবার, তিনবার গাহিয়া তবে গান শেষ হইল।

এই সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড়বধূ বলিলেন—"কি বাছা তোমাদের হিন্দীমিন্দী আমরা সকল কথা বুঝ্তে পারিনে। এইবার একটা বাঙ্গালা গাও। একটা থিয়েটরের গান গাও না। আজকাল ত কত বোষ্টুমি এসে থিয়েটরের গান গায়—নন্দ-বিদায়, তবে গিয়ে প্রভাস মিলন, আরও সব কত কি।"

নগেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা, একটা আধুনিক গান গাই তবে শুনুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল—

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস!
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ?
এখনো ত নিশি শেষে ওঠেনিক শুক-তারা,
এখনো ত রাধিকার শুকায়নিক অশ্রুধারা!
সেথাকার কুঞ্জগৃহে, পুষ্প ঝরে' গেল কিহে?
চকোর হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস?

দুইবার উপর্য্যুপরি গলা ছাড়িয়া গাহিয়া বৈষ্ণবীরা যেন কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গৃহিণী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা একটু জিরিয়ে নাও বাছা,—চেঁচিয়ে ভারি মেহন্নত হয়।"

গান বন্ধ করিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র বলিল—"মা ঠাক্রুণ, আপনি ভাগ্যবতী, তার সমস্ত লক্ষণ আপনাতে দেখ্তে পাচ্চি।"

কয়েকজন নবীনা ইহা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল--"হাঁগা তোমরা কি সামুদ্রিক জান ?"

"জানি, কিন্তু হাত দেখ্‌তে পারিনে; মুখ, চক্ষু, চুল, কণ্ঠস্বর থেকে কিছু কিছু অনুমান কর্‌তে পারি।—তা গিন্নিমা, আপনার ছেলে মেয়ে কটি ?"

"বাছা, আমার দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। এই বড় বউমা; ছোটবউমা বাপের বাড়ী আছেন, বড় মেয়ে মেঝ মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে, এইটি ছোট মেয়ে--এর এই সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে।" এই বলিয়া গৃহিণী চারুর স্ত্রী কুমুদিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

বন্ধুত্রয়ের চোখে চোখে বিদ্যুৎবার্ত্তার আদান প্রদান হইয়া গেল। চারু উভয়ের প্রতি চোখ রাঙাইয়া যেন বলিল—"কি ছেলেমান্‌ষি কর ? শেষকালে কি ধরা পড়্‌বে ?"

আর একটা গান হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবীরা বিদায় চাহিল।

বড়বধূ তাঁহার শ্বশ্রূদেবীর কাণে কাণে গোপনে কি বলিলেন।

গৃহিণী বৈষ্ণবীদিগকে বলিলেন—"তোমরা বাছা আজ নেইবা ফিরে গেলে! রাত্তিরে এখানে থাক; সিধে পত্তর দিই, রাঁধ বাড় খাও দাও। কাল সকালে যেও এখন।"

কি সর্ব্বনাশ! তাহারা রন্ধন করিতে জানে না কি? আর বাড়াবাড়ি করিলে ধরা পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং তাহারা সম্মত হইল না।

একজন প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে গৃহিণীর নাত্‌বৌ—তিনি বলিলেন —"তোমার যে অন্যায়, দিদি! এই কাঁচা বয়সে ওরা কি আপন আপন বোষ্টম ছেড়ে থাক্‌তে পারে ?"

রমণী-সভায় হাসির ফোয়ারা ছুটিল। বৈষ্ণবীরাও পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল।

নগেন বলিল–"তা যা বল বাছা, রাত্তিরে আমরা থাকতে পারব না।"

যথাবিধি পুরস্কৃত হইয়া, বৈষ্ণবীরা বাহিরে আসিয়া দেখিল একজন কনষ্টেবল দরজার কাছে প্রহরায় নিযুক্ত। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সে হাঁকিল—"জমাদার সাহেব! আসামী নিক্‌লি।"

তিনজনে সবিস্ময়ে বৈঠকখানার বারান্দার পানে চাহিল। দেখিল, পুলিসের জমাদার সদলবলে আসিয়া বসিয়া আছে।

জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন—"গিরেফ্‌তার করো।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। হাস্যকারী আর কেহ নয়, সেই দরোয়ান নাথু মণ্ডল। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া সে নগেন্দ্রকে বলিল—"কি গো বোষ্টুমি দিদি! কুস্তি লড়্‌বি?"

* * * *

* * * *

রাত্রি দশটার সময় চারু তাহার শ্বশুরবাড়ীর একটি শয়নকক্ষে চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার শালাজ—পূর্ব্বকথিতা বড়বউ। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"ছি ছি ছি—এ কি বুদ্ধি চারু? তোমার দুটো বন্ধুকে এনে কি বলে তুমি আমাদের বাড়ীসুদ্ধ মেয়েকে দেখিয়ে দিলে? আর তোমার বন্ধুরাই বা কি রকম লোক? কি রকম তাদের আক্কেল? সাহসও ধন্যি! ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর কি করেই বা ঢুক্‌লো? একটু লজ্জা একটু আত্মসম্ভ্রম নেই?"

খুন পর্য্যন্ত করেছে এমন কত শোনা যায়। তা এরা ফকির্ণী, ভিক্ষে করে খায়: এদের ছেড়ে দাও। নাথু মণ্ডলকে আমি পাঁচটা টাকা বখ্সিস্ দিচ্ছি—ও মোকদ্দমা তুলে নিক্।' আমি ত লজ্জায় মাথা হেঁট করে বাবার সঙ্গে সঙ্গে এলাম। নগেন বিপিন যে অন্ধকারে কোথায় সরে পড়্ল, কে জানে!"

"বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্‌তে তিনি কি বল্লেন?"

"হাস্‌লেন। পাছে আমি অপ্রতিভ হই, তার জন্যে কত রকম কথা বলে আমায় সান্ত্বনা কর্‌লেন। কিন্তু তাঁর প্রতি কথায় আমার মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল।"

বড়বধূ ঘড়ির পানে চাহিলেন। বলিলেন—"কাল আবার সব গল্প হবে ভাই, আজ অনেক রাত্তির হ'ল—কুমিকে নিয়ে আসি।"

চারু বলিল—"কাল আমি থাক্‌ব বুঝি? ভোরে উঠে অন্ধকারে অন্ধকারে চম্পট।"

বড়বধূ কৃত্রিম রোষের সহিত বলিলেন—"খবরদার চারু—অমন কাযটি কোরো না—তা হ'লে পাড়াসুদ্ধ ঢাক পিটিয়ে দেব, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত তুলিয়ে দেব।"

চারু আতঙ্কে শিহরিয়া বলিল—"না না মাফ্ করুন, মাফ্ করুন, বিনা অনুমতিতে আমি যাব না।"

"এই সুবুদ্ধির কথা বলেছ। যাই কুমিকে তুলে আনি।" এই বলিয়া বউদিদি প্রস্থান করিলেন।

চারু বসিয়া একখানা পুস্তক উল্টাইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ উঠিল। চারুর বক্ষশোণিতও সেই তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

চারু বলিল—"আর বউদিদি! যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, পায়ে পড়ি, এ কথা যেন বাইরে প্রকাশ কর্‌বেন না। তা হলে কিন্তু আর কখনো এমুখো হতে পার্‌ব না।"

বড়বধূ একটু অভয়হাস্য হাসিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, বাবা যদি থানায় গিয়ে তোমাদের ছাড়িয়ে না আন্‌তেন তা হলে কি দশা হত তোমাদের ?"

চারু বলিল—"সমস্ত রাত্তির আজ হাজতে পচ্‌তে হ'ত। তারপর কাল সকালে যা হয় হ'ত। কিন্তু ভাগ্যিস্ ব্যাপারখানা কি দেখ্‌বার জন্যে বাবা থানায় গিয়েছিলেন!"

"বাবা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যান নি। বাড়ী এসেই শুন্‌লেন যে এই রকম হয়েছিল। তখন তাঁর মনে নানা রকম সন্দেহ, নানা রকম আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল। তাই তিনি থানায় ছুটে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন।"

"বাবার কিন্তু আশ্চর্য্য চক্ষু। আপনারা এতগুলো মেয়েতে আমায় চিন্‌তে পারেন নি দিনের বেলায়, আর তিনি রাত্তিরে কেমন আমায় চিনে ফেল্লেন!"

বড়বধূ হাত নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা চিন্‌বো কোত্থেকে, তুমি যে আড়ালে বসেছিলে মশাই! আর একটিও কি কথা কয়েছিলে?—তা হলেও না হয় চেনা সম্ভব হ'ত গলার স্বর শুনে। বাবা ত তোমার স্বর শুনেই চিন্‌তে পেরেছেন বল্লেন।"

"বাবার কিন্তু খুব উপস্থিত বুদ্ধি। আমাকে চিনে কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ কর্‌লেন না;—কিছু নয়। ধীরে ধীরে শান্তভাবে দারোগাকে বল্লেন—'সাহেব! যে রকম শুন্‌ছি, তাতে ত দরোয়ানটারই সম্পূর্ণ দোষ। মারের কথা কি বল্‌ছ, ও রকম অবস্থায় পড়্‌লে স্ত্রীলোকে

দুয়ারের কাছে আসিয়া মলের শব্দ থামিয়া গেল। বড়বধূর স্বর শুনা গেল, রাগিয়া বলিতেছেন—"দাঁড়ালি কেন লা পোড়ারমুখি? সং আর কি! দিনে দিনে কচি থুকী হচ্চেন। দেখে আর বাঁচিনে!" এই বলিয়া তিনি কুমুদিনীকে ঠেলিয়া ঘরে ঢুকাইয়া দিলেন। বেচারি পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া গেল।

শাহজাদা ও ফকীরকন্যার

প্রণয়-কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পারস্যদেশে প্রাচীনকালে এক মহা প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাদশাহের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল। আসন্নকাল উপস্থিত হইলে বাদশাহ নিজ ভ্রাতাকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া কহিলেন—"ভ্রাতঃ, আমি ত চলিলাম। আমার পুত্রটি অতি শিশু। যতদিন পর্য্যন্ত সে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার স্থানে তুমিই রাজ্য কর। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের মুখ যাহাতে উজ্জ্বল হয়. এইরূপ দয়া-ধর্ম্ম সহকারে প্রজা-পালন করিতে থাক। আর আমার পুত্রটি শাস্ত্রপাঠ, অস্ত্রশিক্ষা, ব্যায়ামাদি বিষয় প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত বিদ্যায় যাহাতে পারদর্শী হইতে পারে, তাহার জন্যও তুমি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, উহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিবে।"—ইত্যাদি প্রকার কহিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বর ও মোহম্মদের পদে মন সমর্পণ করিয়া, তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট ভাই বাদশাহ হইলেন, শাহজাদা যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইলেন। নূতন বাদশাহ পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

যুবরাজের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু বাদশাহ হুকুম করিলেন—"যুবরাজ সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকিবেন, বাহিরে আসিতে পাইবেন না।"

শাহাজাদা দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বিচক্ষণ মৌলভিগণের যত্নে নানা শাস্ত্রে ও নানা ভাষায় বুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবনাবস্থা উপনীত হইল। তখন তিনি মাঝে মাঝে মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন, পিতৃব্য-কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে, এই সমগ্র রাজ্যের আমি অধীশ্বর হইব, পরম সুখে কালহরণ করিতে পারিব। কিন্তু পিতৃব্য, যুবরাজের বিবাহ বা রাজ্যাভিষেকের কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। পরলোকগত বাদশাহের একটি অতি বিশ্বস্ত হিন্দুস্থানবাসী ভৃত্য ছিল, তাহার নাম মুবারক। সে সর্ব্বদা রাজপুত্রের নিকট অবস্থিতি করিত এবং তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। একদিন রাজপুত্র মুবারকের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেখ, একজন রাজ-ভৃত্য আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া মুবারক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নানাপ্রকারে রাজপুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিল। বাদশাহ দোষী ভৃত্যের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া রাজপুত্রকে মিষ্ট কথায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন। আরও বলিলেন—"শীঘ্রই তোমার বিবাহ দিব।" মুবারক শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বলিল—"প্রভু, তবে আর বিলম্ব কেন? নজুমী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া দিন স্থির করিতে আজ্ঞা হয়।" বাদশাহ বলিলেন—"আমি কল্যই জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আনাইয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব।"

অতঃপর একজন বিশ্বস্ত রাজ-ভৃত্য গিয়া পণ্ডিতগণকে কহিল—"দেখ, বাদশাহ কল্য প্রকাশ্য-সভায় তোমাদিগকে যুবরাজের শুভ

বিবাহের জন্য দিন স্থির করিতে বলিবেন। তোমরা বলিবে যে, এখন এক বৎসর বিবাহের দিন নাই। এইরূপ বলিলেই বাদশাহ সন্তুষ্ট হইবেন, নতুবা তোমাদের বিপদ।"

পর দিন যথা সময়ে প্রকাশ্য-দরবারে পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। মুবারক ও রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিয়া বসিল। প্রশ্নমত পণ্ডিতগণ কহিলেন—"শাহানশাহ, আমরা গণনা করিয়া দেখিতেছি, এখন এক বৎসরকাল বিবাহের কোনও শুভদিন নাই।" ইহা শুনিয়া কপটী বাদসাহ মৌখিক দুঃখপ্রকাশ করিলেন। মুবারককে বলিলেন—"শুনিলে ত মুবারক, এখন এক বৎসর দিন নাই। কি করা যাইবে, এখন এক বৎসর অপেক্ষা করিতেই হইল। তুমি যুবরাজকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও, যুবরাজ এখন মন দিয়া লেখা পড়া করুন। এক বৎসর পরে বিবাহ দিয়া তাঁহার পৈত্রিক গদী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকল আমীর ওমরাহগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বর্ত্তমান বাদশাহের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিল না। সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, যুবরাজ পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার ন্যায় রাজ্যপালন করেন। বাদশাহ সকলের এই মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন যায়। একদিন মুবারক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া যুবরাজ অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়া কহিলেন—"মুবারক দাদা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে আমায় বল; তোমার কোনও অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমাকে কেহ কি অপমান করিয়াছে? কি হইয়াছে আমায় খুলিয়া বল।"

মুবারক কহিল—"যুবরাজ, তোমায় সে দিন বাদশাহের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে মহা বিপদের সূচনা হইয়াছে। হায় হায়, যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তাহা হইলে এমন কার্য্য করিতাম না।"

যুবরাজ শঙ্কাকুল হইয়া কহিলেন—"কেন মুবারক, কি বিপদ হইয়াছে ?"

মুবারক বলিল—"সে দিন তোমাকে রাজসভায় দেখিয়া, আমীর, ওমারহ, রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যগণ, সাধারণ প্রজাবর্গ,—সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। বৎসরান্তে তুমি রাজা হইবে শুনিয়া সকলেই পুলকিত। সকলেই বলিতেছে—আহা, আমাদের স্বর্গগত বাদশাহ পরম দয়াবান ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজ-সিংহাসন পাইলে আবার রাজ্যের সেইরূপ সুখ সম্পদ হইবে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তোমার পিতৃব্য ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মুবারক, তুমি যদি কোনও মতে যুবরাজকে মারিয়া ফেলিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব।" শুনিয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিলে সমূহ বিপদ, সেই কারণে কপটতাপূর্ব্বক বলিলাম—বাদশাহ, ইহা আর শক্ত কথা কি—আমি অনায়াসেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দিব। তবে উপায় স্থির করিতে কিছু সময় লাগিবে। বাদশাহ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় দিয়াছেন।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া যুবরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মুবারকের পদে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"মুবারক দাদা, কিরূপে আমার প্রাণ বাঁচিবে ?"

মুবারক বলিল—"ভয় কি, ঈশ্বর আছেন। আমি কোনও উপায় করিব। তুমি কাতর হইও না।"

নানা প্রকারে যুবরাজকে সান্ত্বনা দিয়া মুবারক কহিল—"আমার সহিত এস, তোমাকে একটি গুপ্ত বিষয় দেখাইব।"

বিস্মিত হইয়া রাজপুত্র মুবারকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যেখানে স্বর্গীয় বাদশাহ সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন, সে মহাল এখন বন্ধ ছিল। সেই মহালে উপস্থিত হইয়া, মুবারক ভিতরে প্রবেশ করিল। স্বর্গীয় বাদশাহ যে কুর্শী খানিতে উপবেশন করিতেন, সেই রত্নাসন খানিকে মুবারক বহু সম্মানে সেলাম করিল। তৎপরে, সেই কুর্শীর দক্ষিণ দিকে মেঝের একটি তক্তা ধরিয়া টান দিল। টান দিবামাত্র সে খানি সরিয়া গেল এবং নিম্নে ভূগর্ভে সোপানাবলী নামিয়া গিয়াছে দেখা গেল। যুবরাজ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি মুবারক?" মুবারক বলিল—"ইহা তোমার পিতার গুপ্ত গৃহ। আমার সঙ্গে নামিয়া আইস।" বলিয়া মুবারক সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, যুবরাজও পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিলেন।

ভিতরে গিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, চারিদিকে চারিটি কামরা আছে। প্রত্যেক কামরায় দশটি করিয়া কলসী, সোণার শিকলে বাঁধা, কড়িকাট হইতে ঝুলিতেছে। প্রত্যেক কলসীর মুখে একখানি করিয়া সোণার ইট রাখা আছে। উনচল্লিশটি কলসীতে, সোণার ইটের উপর একটি করিয়া কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি বসানো আছে, কেবল একটিতে নাই। যে কলসীতে বানর নাই, তাহার মুখ খুলিয়া শাহজাদা দেখিলেন, সেটি মোহরে পরিপূর্ণ। অন্য কলসীগুলি শূন্য। এই সমস্ত দেখিয়া যুবরাজ বিস্ময়ে মুবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা, এ সব কি?"

মুবারক বলিল—"জিনিদৈত্যগণের রাজা মালেক সাদেক তোমার পিতার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৎসর একদিন করিয়া তিনি তোমার পিতার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে আসিতেন। এই

ভূগর্ভস্থিত কক্ষগুলিতে তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিতেন। যাইবার সময় তোমার পিতা, মালেক সাদককে এক কলসী মোহর উপহার দিতেন, মালেক সাদেকও তোমার পিতাকে একটি করিয়া ভৌতিক প্রস্তর নির্ম্মিত বানর দিয়া যাইতেন। এই বানরের আশ্চর্য্য গুণ এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি এইরূপ চল্লিশটি বানর পায়, তবে পৃথিবীতে আর তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। উনচল্লিশ বৎসর মালেক সাদেক যাতায়াত করিয়াছিলেন,—এই উনচল্লিশ ঘড়া মোহর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও উনচল্লিশটি বানর দিয়াছেন। পর বৎসর আসিলে তাঁহাকে দিবার জন্য এক ঘড়া মোহর এইখানে রাখা আছে। ইতিমধ্যে তোমার পিতার মৃত্যু হইল। নহিলে চল্লিশটি বানর পূর্ণ হইত, এবং ক্ষমতায় তোমার পিতা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইতেন। কিন্তু একটি কম বলিয়া এ সকল বানরের দ্বারায় কোন কার্য্যই হইবে না।"

রাজকুমার কহিলেন—"তবে ত সকলই ব্যর্থ হইল।"

মুবারক বলিল—"ব্যর্থ বৈ কি। আমি মনে করিতেছি—এখানে যখন তোমার এখন মহা বিপদ, তখন এখান হইতে তোমার পলায়ন করা শ্রেয়স্কর। মালেক সাদেকের নিকট গিয়া, তোমাকে দেখাইয়া, তাঁহাকে সকল কথাই বলি। তোমার পিতার প্রতি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি তোমার সহায় হইতে পারেন। তোমাকে সকল বিপদ হইতে তিনি রক্ষা করিতে পারেন। এক কলসী মোহর যাহা রাখা আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে উপহার দেওয়া যাইবে। যদি শেষ বানরটি তিনি তোমায় দেন, তবে তোমার তুল্য নরপতি ধরাধামে কেহ থাকিবে না।"

শাহজাদা বলিলেন—"কিরূপে আমরা পলায়ন করিব?"

মুবারক বলিল—"তাহার জন্য কোনও চিন্তা নাই। সে উপায়ও আমি স্থির করিয়াছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে, মুবারক একদিন রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"প্রভু. আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার একটি উপায় আমি স্থির করিয়াছি।"

বাদশাহ প্রীত হইয়া কহিলেন—"কি উপায় স্থির করিয়াছ ?"

মুবারক বলিল—"যুবরাজকে যদি এখানে হত্যা করা যায়, তাহা হইলে লোকের মধ্যে ক্রমে জানাজানি হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে আপনার বিলক্ষণ অপযশ আছে। তাহা অপেক্ষা দেশ ভ্রমণের ছলে তাঁহাকে দূরদেশে লইয়া গিয়া হত্যা করাই নিরাপদ। ফিরিয়া আসিয়া রটনা করিয়া দিব যে, তিনি কোনও মারাত্মক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রজাবর্গের এবং অপর কাহারও কোনও সন্দেহের কারণ থাকিবে না।"

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বাদশাহ বলিলেন—"মুবারক, তুমি যথার্থই বলিয়াছ। যাও, যুবরাজকে লইয়া গিয়া, কোনও দূরদেশে কার্য্য শেষ কর। তাহা হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পারিব এবং তোমাকেও পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করিব।"

মুবারক, দূরদেশে যাইবার ব্যয় এবং নিজ পুরস্কারের অর্দ্ধাংশ পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, বাদশাহকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সৈন্য সামন্ত বা ভৃত্যাদি কেহই যাইবে না। মুবারক বাজার হইতে মালেক সাদেকের জন্য বিবিধ বহুমূল্য উপহারাদি ক্রয় করিল। ভূগর্ভস্থ সেই এক কলসী মোহর উঠাইয়া লইয়া, শুভদিন দেখিয়া, যুবরাজসহ যাত্রা করিল। দুই জনে দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমাগত চল্লিশ দিন গমন করিল।

সে দিন চলিতে চলিতে ক্রমে রাত্রি হইল, অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রি এক প্রহর হইলে মুবারক বলিল—"খোদাতালাকে ধন্যবাদ, এতদিনের পর আমরা জিনিদৈত্যের দেশে পৌছিয়াছি।"

শাহাজাদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কৈ ?"

মুবারক বলিল—"এই যে,—এত আলো জ্বলিতেছে, এত লোকজন যাতায়াত করিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, পথ, বাগান, ঘরবাড়ী, ইহাই জিনিদৈত্যপতি মালেক সাদেকের রাজধানী।"

রাজপুত্র বলিলেন—"মুবারক দাদা! আমার সহিত কৌতুক কর কেন? ইহা ত জঙ্গল এবং কেবলই অন্ধকার।"

মুবারক তখন ঈষৎ হাসিয়া, নিজ পকেট হইতে একটি ডিবিয়া বাহির করিল। ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সুলেমানী সুর্ম্মা ছিল। অল্প লইয়া রাজপুত্রের দুই চক্ষুতে লাগাইয়া দিল।

সুর্ম্মা চক্ষে লাগিবামাত্র, শাহাজাদা দেখিলেন, চতুর্দ্দিক আলোকপূর্ণ। বিস্তৃত রাজপথ। স্থানে স্থানে লণ্ঠন জ্বলিতেছে। অনেক ঘরবাড়ী, লোকজন, কোন কোনও গৃহের উপরতালায় নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে। বাজারে বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শাহাজাদার মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুবারককে

দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারিল এবং বন্ধুতাসূচক কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সে রাত্রি একটি বন্ধু-গৃহে মুবারক অবস্থিতি করিয়া, পরদিন প্রাতে মালেক সাদেকের দরবারে রাজপুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইল।

দৈত্যপতির রাজসভা স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ মণিমুক্তা দ্বারায় খচিত। স্থানে স্থানে চাঁদনী দরী এবং মখমলের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। বহু পণ্ডিত, গুণী, আমীর, ওমরাহ, উজীর ও ফকীর বসিয়া আছে। অঙ্গ-রক্ষক সিপাহীগণ সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান। মণিময় সিংহাসনের উপর, হীরকের মুকুট পরিয়া, মোতির হার গলায় দিয়া, মালেক সাদেক বসিয়া আছেন। মুবারক রাজপুত্রসহ নিকটে গিয়া সেলাম করিল। মালেক সাদেক দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—"কি মুবারক? তুমি কবে আসিলে?"

মুবারক নত হইয়া বলিল—"শাহানশাহ! এ দাস পারস্যরাজ্য হইতে গত রাত্রিতে পৌছিয়াছে।"

মালেক সাদেক কহিলেন—"বেশ। তোমার সহিত এই যুবকটি কে?"

মুবারক উত্তর করিল—"মহারাজ! ইহাকে চিনিতে পারিলেন না? আপনি চিনিবেনই বা কি করিয়া, অতি বাল্যকালে ইহাকে দেখিয়াছিলেন কি না। আপনার বন্ধু পারস্যের স্বর্গীয় বাদশাহের ইনি পুত্র।"

অতঃপর মুবারক এই কয়েক বৎসরের ঘটনা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। এক কলসী মোহরও তাঁহাকে উপহার দিল। শেষে বলিল—"রাজপুত্রের বড়ই বিপদ। এ বিপদে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? আপনি যদি কৃপা করিয়া শেষ বানরটি দেন, তাহা হইলে ইহার আর কোনই কষ্ট থাকে না। আপনার বন্ধুর রাজ্য ও বংশ সমস্তই বজায় থাকে।"

সকল কথা শুনিয়া মালেক সাদেক বলিলেন—"আচ্ছা, সে উত্তম কথা। এ যখন এতদূর আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমি ইহাকে রক্ষা করিব। কিন্তু উহাকে একটু পরীক্ষা করিতে চাই। আমার একটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র করযোড়ে কহিলেন—"যাহা হুকুম হয়, এ অধীন তাহা যথাসাধ্য পালন করিবে।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"কার্য্যটি বড়ই কঠিন। পারিবে কি? যদি কার্য্যটি করিতে পার. তবে তোমার পিতাকে আমি যে পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার অধিক অনুগ্রহ তোমাকে করিব। যাহা চাহিবে তাহাই দিব। কিন্তু যদি কার্য্যনাশ কর, তাহা হইলে আমার হস্তে তোমার বিপদের সীমা থাকিবে না।"

রাজপুত্র বলিলেন—"কার্য্যটি যদি আমার শক্তির মধ্যে হয়, তবে অবশ্যই তাহা আমি প্রাণপণে সম্পন্ন করিব। কার্য্যটি কি?"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক নিজ বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি চিত্র বাহির করিলেন। রাজপুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন—"এই মনুষ্যকন্যার সন্ধান করিয়া, যদি তাহাকে আমার কাছে আনিতে পার. তবে আমি তোমার সহিত চিরদিনের জন্য মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিব। আর যদি না আনিতে পার, কিম্বা কোনওরূপ অন্যায় কর, তবে তুমি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইবে। দেখ, এখনও সময় আছে। যদি কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিতে পার, তবেই ভারগ্রহণ কর! নতুবা এখনও নিবৃত্ত হও।"

রাজপুত্র দেখিলেন, ছবিখানি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি পরমাসুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি। বলিলেন—"প্রভু! কেন পারিব না? আমি এই রমণীকে পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিব এবং যে প্রকারে পারি আপনার নিকট আনিয়া দিব।"

ইহা শুনিয়া মালেক সাদেক অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ছবিখানি দিয়া, বিবিধ ধনরত্ন ও পরিচ্ছদ উপহার দিয়া, রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মালেক সাদেকের নিকট বিদায় লইয়া, শাহাজাদা ও মুবারক সেই মনুষ্যকন্যার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ও জঙ্গলে জঙ্গলে বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোঁথাও সেই মনুষ্যকন্যার সংবাদ পাইলেন না। এইরূপে সাতটি বৎসর অতীত হইয়া গেল।

একদিন এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে বেড়াইতে অপরাহ্ণ সময়ে শাহজাদা দেখিলেন, একজন ছিন্নবসন কৃশকায় বৃদ্ধ ফকীর রাজপথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। ফকীর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে কিন্তু কেহই তাহাকে একটি পয়সাও দিতেছে না। যাহার দ্বারে যাইতেছে সেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। দেখিয়া শাহজাদার অন্তঃকরণে বড়ই দয়া হইল। তিনি পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া ফকীরকে দিলেন। ফকীর বলিল—"হে দাতা! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি বোধ হয় পথিক, এ সহরের অধিবাসী নহ।"

বৃদ্ধ এইরূপে রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল। কিছুদূরে একটি দোকানে গিয়া, মোহর ভাঙ্গাইয়া, স্ত্রীলোকের উপযুক্ত একটি সুন্দর রেশমী বস্ত্র খরিদ করিল। বাকী টাকায় খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া, আবার চলিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া রাজপুত্র কিছু বিস্মিত হইলেন। স্বীয় সহচরকে কহিলেন—"মুবারক! এ ব্যক্তি ফকীর, তবে স্ত্রীলোকের উপযোগী রেশমী বস্ত্র ক্রয় করে কেন?"

মুবারক বলিল—"কি জানি. তাহা ত বলিতে পারি না। বোধ হয়. উহার গৃহে স্ত্রী কন্যা কেহ আছে। তোমার যদি এতই কৌতূহল হইয়া থাকে, চল না, উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলেই জানিতে পারিব।"

মুবারকসহ শাহজাদা ফকীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ফকীর ক্রমে নগরসীমা ছাড়িয়া বাহিরে গেল। সেখানে রাজপুত্র দেখিলেন, বড় বড় অট্টালিকা গৃহাদির ভগ্নস্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। বাগান ছিল, অনুমানে বুঝা গেল. এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জলের ফোয়ারা ছিল, তাহা ভগ্ন। দেখিয়া রাজপুত্র মনে করিলেন, বোধ হয় পূর্ব্বে এখানে কোনও রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তির বসতি ছিল, এখনও তাহারই চিহ্ন বিদ্যমান। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটি সামান্য মৃত্তিকাময় কুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বেটী! কোথা আছিস্?" কুটীর হইতে উত্তর আসিল—"বাবা! আসিয়াছ? আজ এত শীঘ্র ফিরিলে কেন? মঙ্গল ত?" বৃদ্ধ বলিল—"বেটী! আজ ঈশ্বর করুণা করিয়া একটি যুবা পথিককে আমার সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছিলেন। সে আমাকে একটি মোহর দিয়াছে। তাই আজ অনেকদিনের পর তোর জন্য একটি রেশমী বস্ত্র কিনিয়া আনিয়াছি। মাংস, ঘৃত, মশলা, চাউল প্রভৃতিও কিনিয়া আনিয়াছি। পাক কর, অনেকদিনের পর আজ সুস্বাদু খাদ্য আমাদের মুখে উঠিবে; এই নে।"

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধের কন্যা প্রফুল্লমুখে বাহিরে আসিল। রাজপুত্র

তাহাকে দেখিবামাত্রই বুঝিলেন এ আর কেহ নয়, যাহার সন্ধানে আজ সাত বৎসর কাল দেশে দেশে. বনে জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন, তসবীর অঙ্কিত এই সেই যুবতী। দেখিয়া রাজপুত্র নতজানু হইয়া ঈশ্বরকে বহু ধন্যবাদ দিলেন। মুবারকও বলিল—"হাঁ, এই সেই মনুষ্যকন্যা বটে।" তাহার অভিনব যৌবন, আশ্চর্য্য রূপ যেন সেই স্থানকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, আমি সাত বৎসর ধরিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য কখনও চক্ষুগোচর করি নাই।

রাজপুত্র তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হে ফকীর! দুইজন পথিককে একটু বিশ্রামের স্থান দিবেন কি?" ফকীর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিতে পারিল এবং মহা সমাদরে আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল। বসাইয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মত দয়াবান্ লোকের আগমনে আজ আমার কুটীর পবিত্র হইল। বৎস! তুমি কে এবং কি জন্যই বা দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ?"

রাজপুত্র কহিলেন—"আমি পারস্যদেশের যুবরাজ। ঘটনাক্রমে একখানি ছবি আমার হস্তগত হয়। সেই ছবিখানিতে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সেই যুবতীর দর্শনলালসায় আমি সাত বৎসরকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছি। এতদিন পরে সেই যুবতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তিনি আর কেহই নহেন, আপনারই কন্যা।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া রাজপুত্রের সম্বর্দ্ধনা করিল। বলিল—"না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনার পদ-গৌরব অবগত ছিলাম না। অতএব ক্ষমা করিবেন।" অতঃপর বসিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, বৃদ্ধ বলিল--"হায়, আমি কি

হতভাগ্য। আপনার মত এমন সুপাত্রের হস্তে যদি আমি কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার কন্যা বড়ই বিপন্না। কাহারও সাধ্য নাই যে উহাকে বিবাহ করে।"

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—"কেন ফকীরসাহেব, এ কন্যা বিপন্না বলিতেছেন কেন? কেহ ইহাকে বিবাহ করিতেই বা পারিবে না কেন?"

কন্যাটি এই সময় খাদ্য পাক করিবার জন্য রন্ধনশালায় গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

"আমার ইতিহাস শুনিবেন? সে অনেক কথা। আমি পূর্ব্বে এই সহরের একজন বিশিষ্ট রহিস্ ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম। এই যে সকল ভগ্নস্তূপ দেখিতেছেন, এই স্থানেই এক সময় আমার প্রাসাদ শোভা পাইত। আমরা বহুপুরুষ ধরিয়া এইখানে বসবাস করিয়াছি। ঈশ্বর আমাকে কেবল মাত্র এই কন্যা সন্তানটি দিয়াছিলেন। কন্যা বড় হইলে, ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিল যে, দেশ বিদেশের বড় বড় লোকগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে প্রস্তাব করিতে লাগিল। একমাত্র কন্যা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, এই কারণে আমি স্নেহাধিক্য-বশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এই নগরের রাজপুত্র একদিন ইহাকে দৈবাৎ দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে প্রণয়-বিহ্বল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল. বাতুলের মত হইল, ক্রমে তাহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহ এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন রাজবাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া, নিজ পুত্রের সহিত আমার কন্যার

বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি রাজাজ্ঞা অমান্য করিতে সাহসী হইলাম না। আরও ভাবিলাম, কন্যার বিবাহ ত একদিন না একদিন কাহারও সঙ্গে দিতেই হইবে, তবে যদি শাহজাদাকে জামাতা পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সুতরাং সম্মত হইলাম। উভয় পক্ষে মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে শুভদিন উপস্থিত হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ শেষে, মহাসমারোহে, বর কন্যাকে শয্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিয়া, বর কন্যার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে তাহারা বিদায় লইল, বাদশাহজাদা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বত্র নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নৃত্যাদি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর কন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল। যেন একত্র শত শত কামান গর্জ্জন করিতেছে। যেন শত শত বজ্রপাত একত্র সংঘটিত হইতেছে। রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্র নৃত্যগীত বন্ধ হইল। রাজপরিবারে, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবৃন্দ, দাস দাসী, সকলেই মহা ত্রাসে নবদম্পতির শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। অনেক ডাকাডাকি, কেহই দ্বার খুলে না। অবশেষে বাদশাহের আজ্ঞায় দ্বার সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলা হইল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদশাহজাদার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত, রক্তে শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার কন্যা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কক্ষে কোনরূপ অস্ত্রও ছিল না। অনেক কষ্টে দাসীগণ আমার কন্যার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। বাদশাহ পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"পরদিন শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রোধে

হতভাগ্য। আপনার মত এমন সুপাত্রের হস্তে যদি আমি কন্যা সমর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ধন্য হইতাম। কিন্তু তাহার উপায় নাই। আমার কন্যা বড়ই বিপন্না। কাহারও সাধ্য নাই যে উহাকে বিবাহ করে।”

ইহা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—“কেন ফকীরসাহেব, এ কন্যা বিপন্না বলিতেছেন কেন? কেহ ইহাকে বিবাহ করিতেই বা পারিবে না কেন?”

কন্যাটি এই সময় খাদ্য পাক করিবার জন্য রন্ধনশালায় গেল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

“আমার ইতিহাস শুনিবেন? সে অনেক কথা। আমি পূর্ব্বে এই সহরের একজন বিশিষ্ট রহিস্ ও ধনী ব্যক্তি ছিলাম। এই যে সকল ভগ্নস্তূপ দেখিতেছেন, এই খানেই এক সময় আমার প্রাসাদ শোভা পাইত। আমরা বহুপুরুষ ধরিয়া এইখানে বসবাস করিয়াছি। ঈশ্বর আমাকে কেবল মাত্র এই কন্যা সন্তানটি দিয়াছিলেন। কন্যা বড় হইলে, ইহার সৌন্দর্য্য, সুকুমারতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী এতই প্রসিদ্ধিলাভ করিল যে, দেশ বিদেশের বড় বড় লোকগণ ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে প্রস্তাব করিতে লাগিল। একমাত্র কন্যা, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, এই কারণে আমি স্নেহাধিক্য-বশতঃ বিলম্ব করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে এই নগরের রাজপুত্র একদিন ইহাকে দৈবাৎ দেখিয়া, আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে প্রণয়-বিহ্বল হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল, বাতুলের মত হইল, ক্রমে তাহার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাদশাহ এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন রাজবাটীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া, নিজ পুত্রের সহিত আমার কন্যার

বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। আমি রাজাজ্ঞা অমান্য করিতে সাহসী হইলাম না। আবও ভাবিলাম, কন্যার বিবাহ ত একদিন না একদিন কাহারও সঙ্গে দিতেই হইবে, তবে যদি শাহজাদাকে জামাতা পাওয়া যয়, তাহার৹অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সুতরাং সম্মত হইলাম। উভয় পক্ষে মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে শুভদিন উপস্থিত হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহ শেষে, মহাসমারোহে, বর কন্যাকে শয্যাগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিয়া, বর কন্যার মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে তাহারা বিদায় লইল, বাদশাহজাদা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রাসাদের সর্ব্বত্র নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ, সঙ্গীত নৃত্যাদি চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বর কন্যার শয্যাকক্ষ হইতে এক অতি ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল। যেন একত্র শত শত কামান গর্জ্জন করিতেছে। যেন শত শত বজ্রপাত একত্র সংঘটিত হইতেছে। রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্র নৃত্যগীত বন্ধ হইল। রাজপরিবারে, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতবৃন্দ, দাস দাসী, সকলেই মহা ত্রাসে নবদম্পতির শয়নকক্ষের দিকে ছুটিল। অনেক ডাকাডাকি, কেহই দ্বার খুলে না। অবশেষে বাদশাহের আজ্ঞায় দ্বার সবলে ভগ্ন করিয়া ফেলা হইল। সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদশাহজাদার মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত, রক্তে শয্যা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার কন্যা মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে কক্ষে কোনরূপ অস্ত্রও ছিল না। অনেক কষ্টে দাসীগণ আমার কন্যার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইল। বাদশাহ পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"পরদিন শোক কতকটা প্রশমতা প্রাপ্ত হইলে বাদশাহ ক্রোধে

আদেশ করিলেন—'এই কন্যা অতিশয় মন্দভাগিনী, সত্বর ইহার মস্তক কাটিয়া ফেল।' আজ্ঞা পাইয়া, দাস দাসীগণ, সৈন্য সামন্ত ডাকিয়া, আমার কন্যাকে বধ করিবার আয়োজন করিল। রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনে বধ্যভূমি নির্ম্মিত হইল। সশস্ত্র সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ ও রাজকর্ম্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন। আমার কন্যাকে বধ করিবার জন্য জল্লাদ যখন প্রস্তুত হইতেছে তখন সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিল, অজস্র পরিমাণ প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদশাহ ও সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি প্রস্তরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল ঠিকানা নাই। কেবল আমার কন্যার গায়ে একখানি প্রস্তরও লাগিল না।

"ক্রমে প্রস্তরপাত বন্ধ হইল, শব্দ থামিয়া গেল, মেঘ অপসৃত হইল; তখন বাদশাহ বলিলেন,—'এই কন্যা ভূতগ্রস্ত, নহিলে এমন ভৌতিক কাণ্ড হইবে কেন? ইহাকে কিছু আর বলিও না। ইহাকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দাও এবং ইহার পিতাকে বধ করিয়া, ইহাদের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া, সমস্ত ধন সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।"

"আজ্ঞা পাইবা মাত্র রাজভৃত্যগণ আসিয়া আমার গৃহাদি সমস্ত ভগ্ন করিল, আমার দ্রব্যাদি লুটিয়া লইল। আমার কন্যা রাজবাটী হইতে তাড়িত হইয়া একবস্ত্রে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল। ক্রমে রাজ-সৈন্যগণ আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে জল্লাদের হস্তে দিল। এমন সময় পুনরায় আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা গেল, অন্ধকার হইয়া প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। সৈন্যগণ কেহ মরিল, কাহারও মস্তক, হস্ত, পদ ভগ্ন হইল। তাহারা ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। আমার এবং কন্যার গায়ে কোনও প্রস্তর লাগিল না।

"সেই অবধি ভীত হইয়া বাদশাহ আমার প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার করেন না। তবে আমার ধন সম্পত্তি সমস্ত যাওয়াতে আমি পথের ভিক্ষুক হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য একটু কুটীর বাঁধিয়া কন্যাসহ কোনও মতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ মৌন হইয়া রহিলেন। রাজপুত্র ব্যাপার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ইহা মালেক সাদেকেরই কীর্ত্তি। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন এরূপ হইল, আপনার কন্যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কন্যা বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কেবল বলিল—'যখন আমাদের শয়নকক্ষ হইতে নর্ত্তকীগণ বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাহজাদা উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরা উভয়ে পালঙ্কে শয়ন করিলাম। তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। শূন্য হইতে যেন এক মণিময় সিংহাসন নামিয়া আসিল। তাহার উপর এক রূপবান যুবাপুরুষ রাজবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হস্তে উলঙ্গ তরবারি। চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ। তরবারির এক আঘাতে শাহজাদার মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আমি ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম, আর কিছুই জানিনা।'—আমার বোধ হইল কোনও ভৌতিক কাণ্ড হইবে। সেই অবধি ভূতের ভয়ে বাদশাহ বহু প্রকার তাবিজাদি ধারণ করিয়াছেন, এবং সহরের সর্ব্বত্র মৌলানাগণ ইসিম আজম ও কোরাণ পাঠ করিতেছে।"

বৃদ্ধ আবার মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজপুত্র ও মুবারক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র বাসস্থানে ফিরিয়া, আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। মুবারক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল—"শাহজাদা, এতদিনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, অথচ তোমার মন এমন বিষণ্ণ কেন?"

রাজপুত্র কহিলেন—"মুবারক, সেই রূপসী-রত্নকে দেখিয়া আমার মনে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মুবারক বলিল—"কেন রাজকুমার, বিষাদ কিসের?"

শাহজাদা বলিলেন—"মুবারক, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, আমার মনের দুঃখ কি বুঝিবে? আমি যে দিন হইতে ঐ কন্যার ছবি দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মন প্রেম-অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। এতদিন পরে যদি তাহার দেখা পাইলাম, তাহাকে লাভ করিতে পারিব না।"

মুবারক শুনিয়া বলিল—"সর্ব্বনাশ! এমন চিন্তা মনেও স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িণীকে তাঁহার নিকট পৌছিয়া দিবার উপায় চিন্তা কর। অন্যরূপ কামনা পরিত্যাগ কর। এদেশের বাদ-শাহজাদার কি দশা হইয়াছে তাহা ত তুমি স্বকর্ণেই শুনিলে।"

রাজপুত্র বলিলেন—"শুনিলাম বলিয়াই ত এই বিষাদ।"

মুবারক তখন ফকীর-কন্যাকে কি উপায়ে লইয়া গিয়া মালেক সাদেকের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে, তাহার পরামর্শই করিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল, ফকিরকে বলিয়া, কহিয়া, বুঝাইয়া, বিবাহ করিবার ছল করিয়া, শাহজাদা ঐ কন্যাকে লইয়া গিয়া মালেক সাদেক সমীপে অর্পণ করিবেন।

সে রাত্রি শাহজাদা নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। সেই সুন্দরীর চন্দ্রমুখ যতই তাঁহার মনে পড়ে, ততই অন্তরে প্রেমাগ্নি জ্বলিয়া উঠে।

কোনও ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রাজপুত্র স্নান করিয়া, বেশ বিন্যাস করিয়া, বাজারে গিয়া বিবিধ প্রকার শুষ্ক ও হরিদ্বর্ণ মেওয়া ফল, মাংস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য ও পেয়, বিবিধ প্রকার বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি উপহার দ্রব্য ক্রয় করিয়া, মুবারক সহ ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। ফকীর মহা সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর রাজপুত্র বলিলেন—"মহাশয়, আমি গত রজনীতে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি, আপনার নিকট আপনার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিব। আমার যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে আপনার কন্যাকে লাভ না করিতে পারিলে আমার জীবনে সুখ নাই। আপনি মৃত্যুশঙ্কার কথা বলিয়াছিলেন, আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সুখহীন জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।"

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"বৎস, ও কথা বলিও না। জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। ঐ আশঙ্কাটি যদি না থাকিত, আমি এখনি তোমাকে আপন কন্যা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইব?"

রাজপুত্র অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। রাজপুত্র প্রত্যহই নানা উপহার দ্রব্যাদি লইয়া ফকীরের আলয়ে আসিতেন এবং দিবসের অধিকাংশ ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই অনেক প্রকারে বৃদ্ধকে বুঝাইতেন কিন্তু কিছুতেই বৃদ্ধের মত করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ কেবলই বলিতেন, তোমাকে কন্যাদান করিয়া, তোমার বধের ভাগী আমি হইতে পারিব না।

এক মাস পরে হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজ

কুমার ও মুবারক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা হকিমের কাছে গিয়া রোগের অবস্থা জানাইতে লাগিলেন, ঔষধাদি আনিয়া বৃদ্ধকে সেবন করাইতে লাগিলেন। রাজকুমার নিজ হস্তে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে খাওয়াইতেন। ফল কথা, বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই বাঁচিলেন না।

তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমান-ধর্ম্ম অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম শাহজাদা সম্পন্ন করিলেন। সর্ব্বদা কন্যার নিকটে থাকিয়া তাহাকে প্রবোধ দিতেন। এইরূপে আরও মাসখানেক কাটিল।

মুবারক এক দিন জনান্তিকে রাজকুমারকে বলিল—"আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ফল কি ? চল এবার ফকীরকন্যাকে লইয়া মালেক সাদেকের নিকট সমর্পণ করি।"

রাজপুত্র ইহা শুনিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। অন্তরের বাসনা বড়ই প্রবল, অথচ মৃত্যুভয়ও কাটাইয়া উঠিতে পারেন না।

মুবারক সে দিন ফকীরকন্যাকে বলিল—"বেটী, আমরা বিদেশী লোক, এখন ত আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে মনে করিয়াছ ?"

ফকীরকন্যা বলিল—"মহাশয়, আমার আর এখানে কে আছে ? আমি একা স্ত্রীলোক এখানে থাকিবই বা কি করিয়া ? আমার কি উপায় হইবে ?"

মুবারক বলিল—"এখানে একাকী থাকা যদি তোমার অনভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে চল। তাহার পর কোন একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

ফকীরকন্যা সম্মত হইল। মুবারক পাল্কী ও বাহক সংগ্রহ করিয়া,

ফকীরকন্যা ও রাজপুত্রকে লইয়া, মালেক সাদেকের রাজ্য-অভিমুখে যাত্রা করিল।

বহুদিনের পথ। নানা বন, উপবন, পর্ব্বত ও নদী অতিক্রম করিয়া ইঁহারা যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কোনও সুন্দর স্থান প্রাপ্ত হইলে, দুই এক দিন সেখানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতেন। কুমারীর নিয়ত সাহচর্য্যে রাজপুত্রের মনে প্রণয়-বহ্নি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুইজনে বিশ্রাম স্থান হইতে অনেক দূর অবধি বেড়াইতে যাইতেন। কোথাও একটি সুন্দর বনপুষ্প দেখিলে, রাজপুত্র তাহা যত্নে তুলিয়া, ফকীরকন্যার কেশদামে পরাইয়া দিতেন। এইরূপে কয়েক মাস কাটিল। কিন্তু মালেক সাদেকের ভয়ে শাহজাদা কোনও দিন ফকীরকন্যার নিকট স্বীয় প্রণয় ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না।

একদিন মুবারক নির্জ্জনে রাজপুত্রকে অনেক ভৎ‌র্সনা করিল। ইঁহার মনোভাব জানিতে মুবারকের বাকী ছিল না। মুবারক বলিল—"রাজকুমার, তোমাকে পূর্ব্বাবধিই সাবধান করিয়া দিয়াছি, এ বাসনা মনে স্থান দিও না। মালেক সাদেকের প্রণয়িণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কতদূর বিপজ্জনক, তাহা কি তুমি অবগত নও? শেষে কি প্রাণটা খোয়াইবে?"

রাজপুত্র কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে মুবারক। কিন্তু আমি যে কিছুতেই হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ফকীরকন্যাকে বিবাহ করিলে মালেক সাদেকের হস্তে আমার মৃত্যু, আর প্রণয়-বাঞ্ছা পূর্ণ না হইলেও আমার অবধারিত মৃত্যু। এখন আমি কি করিব?"

মুবারক যুবরাজের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। বলিল—"ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। হয়ত মালেক সাদেকের নিকট কন্যাকে

উপস্থিত করিলে তিনি প্রীত হইয়া ও কন্যা তোমাকেই দান করিবেন। তাহাতে তোমার প্রাণরক্ষা, রাজ্যরক্ষা সকল দিকই বজায় থাকিবে।"

যুবরাজ বিষণ্ণ মনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে তাঁহারা একটি নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। স্থানটি সুন্দর দেখিয়া, কিছুদিন বিশ্রামের জন্য তাঁহারা সেই খানেই ছাউনি ফেলিলেন। তখন বসন্তকাল বিরাজ করিতেছে। নদী তীরে সহস্র সহস্র বন্য-গোলাপ ফুটিয়া বায়ুকে আতর গন্ধে পরিপ্লাবিত করিয়াছে। বুলবুল পক্ষীর গান শুনিলে বৃদ্ধেরও মনে তরুণ-ভাব উপস্থিত হয়। একদিন যুবরাজ ও ফকীরকন্যা নদী সৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত হইয়া একটি গোলাপের ঝাড়ের নিকট তৃণাস্তরণে উপবেশন করিলেন। সে দিন কথায় কথায়, শাহজাদা নিজ প্রণয় ব্যক্ত করিলেন। কিরূপ উন্মাদনা আসিয়া উপস্থিত হইল, কিছুতেই নিজেকে সে দিন সংযত করিতে পারিলেন না। রাজকুমারের প্রণয়-কথা শুনিয়া কুমারীর গণ্ডযুগল, নিকটস্থ ঝাড়ের গোলাপের পাপড়ির মতই লাল হইয়া গেল। যুবরাজের বারম্বার প্রশ্নে কুমারীও স্বীকার করিলেন, যে দিন হইতে তিনি পিতৃগৃহে যুবরাজকে দেখিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাকে নিজ হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রথম প্রণয় ব্যক্ত করিতে সেই অসামান্যা সুন্দরীর মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। রাজ-পুত্র আত্মহারা হইয়া স্বীয় প্রিয়তমাকে বক্ষে গ্রহণ করিয়া তাহার গোলাপী অধর চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কুমারী বলিলেন—"না প্রাণাধিক, আত্মসম্বরণ কর, আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিব না।" যুবক বলিলেন—"তোমার অধর চুম্বনের মূল্য স্বরূপ যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, আমি তাহাতেও কাতর নহি।" কুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া, গোলাপের ঝাড় হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া, তাহা চুম্বন করিয়া

যুবকের কোলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন—"ঐ ফুলে আমার চুম্বন আছে, উঠাইয়া লও।"

যুবক সাগ্রহে ফুলটি উঠাইয়া লইয়া বারম্বার তাহা চুম্বন করিতে লাগিল। এমন সময় আকাশ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। শত বজ্রনির্ঘোষের শব্দ শ্রুত হইল।

যুবরাজ বুঝিলেন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। ফকীরকন্যাও বুঝিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ হইল! তিনি ভয়ে যুবরাজের কণ্ঠলগ্ন হইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মালেক সাদেক আসিয়া সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইয়া বিকট শব্দ উত্থিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া ফকীরকন্যার মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল।

মালেক সাদেক শাহজাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিশ্বাসঘাতী যুবক! তোর উত্তর কি?"

শাহজাদা বলিলেন—"কিসের উত্তর?"

মালেক সাদেক বলিলেন—"এই কন্যার প্রতি তুই কেন প্রেমাভিলাষ করিয়াছিস্?"

শাহজাদা কহিলেন—"দৈত্যপতি, এ প্রশ্নের কোনই উত্তর নাই। আমি উহাঁকে ভালবাসিয়াছি বলিয়া ভালবাসিয়াছি।"

মালেক সাদেক বলিলেন—"মনে ভালবাসিয়াছিস্, কিন্তু মুখে প্রকাশ করিলি কেন?"

যুবরাজ উত্তর করিলেন—"যদি জানিতাম, আপনি যেরূপ এই কন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, তিনিও সেইরূপ আপনার প্রতি অনুরক্ত, তবে আমি কখনই তাঁহার কাছে আমার প্রণয় ব্যক্ত করিতাম না। কিন্তু তিনি যখন আমাকেই হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছেন ইহা বুঝিলাম, তখন প্রণয় ব্যক্ত না করিব কেন?"

দৈত্যপতি বলিলেন—"আমার ক্রোধের ভয় করিস্ না? প্রাণের মায়া নাই?"

শাহজাদা বলিলেন—"দৈত্যরাজ, মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান। প্রেম কি কখনও মৃত্যু ভয় করে? ইচ্ছা হয়, আমাকে বধ করুন, তথাপি আমি আমার প্রিয়তমার নিকট প্রণয় ব্যক্ত করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমও যে প্রাপ্ত হইয়াছি, এই জন্য মৃত্যুর পর নরকে যাইলেও আমার আত্মা স্বর্গসুখ অনুভব করিবে।"

ধীরে ধীরে, আকাশ পরিষ্কার হইল। পুনশ্চ দিবার তরুণালোক দেখা দিল। অল্প অল্প দৈত্যপতির মুখমণ্ডলে, ক্রোধের পরিবর্ত্তে, প্রসন্নতার চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"যুবা,—উঠ। আমি তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম মাত্র। আমি দৈত্যবংশোদ্ভব, তাহাতে বৃদ্ধ হইয়াছি। মনুষ্যকন্যায় আমার কোনই প্রয়োজন নাই। উঠ, নদী হইতে শীতল জল আনিয়া তোমার প্রিয়তমার চেতনা সম্পাদন কর। তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

একথা শুনিয়া, শাহজাদা মহা আশ্বস্ত হইয়া, নদী হইতে জল আনিয়া, সযত্নে স্বীয় প্রণয়িণীর চেতনা সম্পাদন করিলেন। যুবতী একটু সুস্থ হইলে, মালেক সাদেক বলিতে লাগিলেন—"যখন তুমি অতি শিশু, তখন একদিন তোমার পিতা এবং আমি উভয়ে ছদ্মবেশে ইস্তাম্বুল সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে এই কন্যাকে দেখি। ইনিও তখন অতি শিশু। তোমার পিতা ইহাঁর সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার পুত্র যদি বাঁচে, তবে এই কন্যার সহিত বিবাহ দিব। ইস্তাম্বুলের শাহজাদা যখন ইহাঁকে বিবাহ করিল, তখন সেই কারণেই আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। পরে তোমার পিতার মৃত্যুর পর, অনেক বৎসর ধরিয়া আর ও কথা আমার স্মরণ ছিল না;

তোমাকে আসিতে দেখিয়া আবার আমার স্মরণ হইল। তোমার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে অন্বেষণ করিবার ভার তোমাকেই দিয়াছিলাম। বৎস,—তোমার ক্লেশকর পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ইতিমধ্যেই তোমার নিষ্ঠুর পাপাত্মা পিতৃব্যকে তোমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। তোমার পিতৃসিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই তোমাকে পারস্যরাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, এই কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

মহা সমারোহে যুবরাজের অভিষেক ও উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, নবীন বাদশাহ রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিকে ডাকাইয়া নিজ জীবনের ইতিহাস বলিয়া, একখানি কাব্য রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেই কাব্যের শীর্ষদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল

"মৃত্যু হইতে প্রেম বলবান।"

পরিশিষ্ট

বঙ্কিম বাবুর কাজির বিচার

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিম বাবু যখন বারাসত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময়ের কথা বলিতেছি।

শ্রাবণ মাস—ঘোর বর্ষা—বড় দুর্দ্দিন। রহিয়া রহিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ একই প্রকার পাংশুবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, যেন কুজ্ঝটিকায় পরিবৃত। খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী সমস্ত জলে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও পথস্থিত সেতুর দুই পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার মধ্য দিয়া জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বদিক হইতে প্রবলবেগে বায়ু বহিয়া সেই দুর্দ্দিনের ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছে। এমন সময়ে রহিমগঞ্জের হরনাথ ভট্টাচার্য্য বসিরহাট হইতে বারাসত যাইবার পথাবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। পথিক দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠকায়—নগ্নপদ, স্কন্ধে উত্তরীয়; গোলপত্রের ছত্র মাথায় দিয়া সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল রাজপথ বহিয়া দ্রুতবেগে বারাসতাভিমুখে পদচালনা করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, ললাট চিন্তাক্লিষ্ট। কলিকাতায় তাঁহার একমাত্র পুত্র কলেজের ছাত্র—সে সাংঘাতিক পীড়িত হইয়াছে বলিয়া টেলিগ্রাম্ আসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণ সেই দুর্দ্দিনেও দিগ্বিদিক্-

জ্ঞানশূন্য হইয়া কলিকাতা যাইতেছেন। নতুবা এরূপ নিদারুণ বর্ষায় ও ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে পথে বাহির হয় কাহার সাধ্য!

ক্রমশঃ সন্ধ্যাগত দেখিয়া হরনাথ গতির বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তখনও বারাসতে রেল হয় নাই। সুতরাং সেই রাত্রি সেই স্থানেই কাটাইতে হইবে। বারাসতে কেহ পরিচিত নাই—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে রাত্রি যাপনের জন্য কোনও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি কোনমতেই বারাসতে পৌছিতে পারিলেন না।

একে কৃষ্ণপক্ষীয় রজনী—তাহাতে চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন—ব্রাহ্মণ আর পথ দেখিতে পান না। অতি কষ্টে বাজারে পৌছিয়া বাসার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন দোকানদারই স্থান দিতে স্বীকৃত হইল না। অনেকেই বলিল—"আমরা দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ীতে গিয়া শয়ন করি।" অবশিষ্ট, এই দারুণ বর্ষায় স্থানাভাব বলিয়া আপত্তি করিল। তখন অগত্যা তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভদ্রপল্লীতে অতিথি হইয়া রাত্রি যাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এ বাড়ী সে বাড়ী করিয়া বেড়াইলেন—সকলেই বলে 'স্থান হইবে না।' অবশেষে একটি ভদ্রলোকের চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। হরনাথ কাতরস্বরে তাঁহাকে স্বীয় নাম ধাম ও বিপন্ন অবস্থা অবগত করাইয়া, সেই রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্বামী শুনিবামাত্র যথেষ্ট সমাদরের সহিত ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

গৃহস্বামীও ব্রাহ্মণ—তিনি অতিথিকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া, তাঁহার জন্য সন্ধ্যাহ্নিক ও জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন।

আহারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কথোপকথনে অতিবাহিত হইল। হরনাথ কহিলেন—"মশায়! কি আশ্চর্য্য কথা, এখনো হিন্দুধর্ম্ম রয়েছে—একজন বিপন্ন ব্রাহ্মণকে এ দুর্দ্দিনে কেউ একটু আশ্রয় দিতে স্বীকার কর্‌লে না! ভাগ্যে মশায় ছিলেন; নইলে আমার দশা আজ কি হ'ত?"

গৃহস্বামী হাসিয়া বলিলেন—"তার কারণ আছে মশায়—বিশেষ কারণ আছে"। হরনাথ কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলুন দেখি ব্যাপারখানা?"

গৃহস্বামী বলিলেন—"আজ ক'দিন হ'ল এই বারাসতে একজন চোর, অতিথি সেজে এসে, এক ভদ্রলোকের সর্ব্বস্বটা নিয়ে গেছে। তাই কেউ আজ আপনাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার হয় নি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহ্নিক ও জলযোগাদি শেষ করিয়া হরনাথ অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। আহারান্তে চণ্ডীমণ্ডপেই তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত হইল তিনি শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হয় না। একে বিদেশ—তাহাতে ব্যাধিক্লিষ্ট পুত্রমুখ স্মরণ করিয়া কেমন এক ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। এক এক বার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছেন। ভাবিতেছেন, কিরূপে রাত্রিটা কাটিয়া যাইবে। এই ভাবে দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার

পর, তাঁহার বোধ হইল যেন বাহিরে খস্ খস্ করিয়া কি একটা শব্দ হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গনের দিকে চাহিয়া রহিলেন—বোধ হইল যেন অঙ্গন পার হইয়া ধীর পদক্ষেপে কেহ অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—কে এ? চোর নহে ত? যদি তাহা হয়, তবে ত গৃহস্বামীর সর্ব্বনাশ করিবে!

একবার মনে করিলেন—গোলমাল করিয়া কায নাই, চুপ চাপ পড়িয়া থাকি। শেষে চোরের হাতে পড়িয়া কি প্রাণটা খোয়াইব? কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধি কিছুতেই তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। ভাবিলেন—আহা যে ব্রাহ্মণ আমায় আজ অসময়ে আশ্রয় দিল, বিপদে বন্ধুর মত কায করিল, আমি তাহার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিব না? সকলকে জানাই—গোলমাল করি।

তখন তিনি উঠিয়া, কোমর বাঁধিয়া বহিরঙ্গনে দাঁড়াইয়া "চোর, চোর," বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে চোরটা একটা বাক্স কক্ষে করিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং বিদ্যুৎবেগে তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। হরনাথের শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল, তিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফ দিয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। চোর প্রথমে অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। যখন দেখিল তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন বাক্স ফেলিয়া হরনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া সেও "চোর, চোর." করিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। দুই জনের যুগপৎ চীৎকারে, গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া, আলো লইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে আগন্তুক ব্রাহ্মণ ও সরকারী পরিচ্ছদ-পরিহিত জোয়ান আলি কন্‌ষ্টেবল, পরস্পরকে সবলে ধরিয়া রাখিয়া, উভয়ে "চোর, চোর," বলিয়া চীৎকার করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন

প্রতিবেশীও লণ্ঠন জ্বালিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী অতিথির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "একি!"

ব্রাহ্মণ বলিল - "মশাই—"

জোয়ান আলি মহা চীৎকার করিয়া বাধা দিয়া বলিল—"চোপ্ রও হারামজাদ্, শূয়ারকা বচ্ছা! মশাই, আমি পথে পাহারা দিচ্ছিলাম, দেখি এ লোকটা একটা বাক্স বগলে করে. এখানে এসে দাঁড়াল। আমি হাঁকলাম, কোন্ হায়রে?—কথাই কয় না। মনে ভারি সন্দেহ হ'ল, এসে ধর্‌লাম একে। আমাকে বলে কনেষ্টবল বাবা ছেড়ে দাও, তোমাকে অর্দ্ধেক ভাগ দেব।"—এই বলিয়া সে ব্রাহ্মণের গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল।

কনষ্টেবলের পক্ষ হইতে প্রবল বাধা সত্ত্বেও হরনাথও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে পুলিসের লোকজন আসিয়া উভয়কে থানায় লইয়া গেল। গৃহস্বামী ও প্রতিবেশীরা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

* * * * * *

* * * * * *

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার বঙ্কিম বাবুর উপর পতিত হয়। বঙ্কিম বাবু হরনাথ ও কন্‌ষ্টেবল জোয়ান আলির এজাহার লইয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। কে দোষী, কে নির্দ্দোষী, স্থির করা অসাধ্য মনে হইল। কন্‌ষ্টেবল বলিল,—আমি পাহারা দিতেছিলাম, পথিক কোমর বাঁধিয়া. বাক্স লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে গেরেপ্তার করাতে সে "চোর" বলিয়া আমার উপর দোষ ফেলিতেছে। হরনাথ, যাহা যথার্থ ঘটিয়াছিল তাহাই বলিল।

কন্‌ষ্টেবলের পক্ষ হইতে পুলিস ভালরূপ তদ্বির করিতে লাগিল।

তাহার পক্ষ হইতে কয়েকজন সাফাইয়ের সাক্ষী দেওয়া হইল—তাহারা উহার সচ্চরিত্রতার বিষয় ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিল। অতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়োজন বোধ করিয়া, বঙ্কিম বাবু সেই সময়ে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সাক্ষ্যও গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষীকে ক্রস্, রিক্রস্ এবং প্রয়োজন হইলে রি-রি-ক্রস্ পরীক্ষা পর্য্যন্ত করিলেন। একজন প্রবীণ এম-এ. বি এল্ উকীল, কন্‌ষ্টেবলের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তর্জনীর দ্বারা কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু বিদেশী দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ নাই—তিনি কেবল গলদশ্রুলোচনে, যুক্ত করে, উর্দ্ধমুখে মনে মনে অকূলের কাণ্ডারী বিপদভঞ্জন দীনবন্ধু মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছেন। আলবোলার নলটি মুখে দিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া সেই মোকর্দ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে তাঁহার ভুবনবিজয়ী মহালেখনী উপেক্ষিত—তিনি লিখিতে বসেন নাই। আজ-কাল করিয়া দুই সপ্তাহ মোকর্দ্দমার রায় মুলতবী রাখিয়াছেন। আর বিলম্ব করিলে চলে না—কল্য নিশ্চয় রায় প্রকাশ করিতে হইবে। সকল দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার বেশ ধারণা জন্মিয়াছে যে, হরনাথ

নির্দ্দোষ—কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণাভাবে ধারণানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি আজ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর, বদনমণ্ডল চিন্তাপূর্ণ, বাগ্দেবীর লীলাভূমি বিবিধ জ্ঞানের আধার সেই প্রশস্ত ললাট আজ একটা মোকর্দ্দমার জন্য মুহুর্মুহু কুঞ্চিত হইতেছে। যে প্রশস্ত বক্ষস্থলে সার্ব্বজনিক প্রেম, স্বর্গাদপিগরীয়সী জন্মভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে সতত পূর্ণোৎসাহ বিরাজমান, তাহা আজ সংশয় বিষে জর্জ্জরিত। সে প্রতিভাপরিপূর্ণ উজ্বল নয়নযুগল আজ নিস্প্রভ, পলকশূন্য। ক্রমশঃ তাঁহার মুখমণ্ডল অধিকতর গম্ভীর হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! আয়েষা, সূর্য্যমুখী, ভ্রমরাদির জনয়িতা; বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহ, প্রতাপাদির সৃজনকারী; গুরুশিষ্য সংবাদের অদ্বিতীয় গুরু; বঙ্গীয় উপন্যাস ক্ষেত্রের মহারথী; সাহিত্যপোতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী-বিরহিত কর্ণধার—তাঁহার মস্তিষ্ক আজ এ কি চিন্তা-তরঙ্গে আন্দোলিত? শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী শ্বেতাঙ্গিনী কমলাসনা, সুরনরবন্দিতা দেবী ভারতীর লীলাক্ষেত্র সেই মস্তিষ্কের কার্য্যপ্রণালী আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্য কি যে বর্ণনা করে! তাহা অনুভব করা আমার ক্ষমতার অতীত। যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতে পারি মাত্র।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সহসা মেঘোন্মুক্ত শশধরের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহ নাই। আলবোলা টানিয়া দেখিলেন—আগুণ নিভিয়া গিয়াছে। তখন ভৃত্যকে ডাকিলেন—"হরি!"

হরি আসিলে বলিলেন,—"দেখ্, ব্রজকে শীঘ্র একবার ডেকে নিয়ে আয়। যদি বাড়ীতে না থাকে—তাদের থিয়েটারের রিহার্শেল থেকে ডেকে আন্‌বি, বুঝেছিস্?"

ব্রজলাল কাছারীর একজন আমলা, বিশ্বাসী ও সৎসাহসী যুবাপুরুষ। বিশেষতঃ সাহিত্যানুরাগী বলিয়া বঙ্কিম বাবুর বড় প্রিয় ছিল।

ব্রজ আসিলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—"হাঁ হে, তুমি সে দিন তোমাদের অপেরাতে কি সেজেছিলে? সেনাপতি বুঝি? যুদ্ধ করতে করতে মরে গেলে, গেরুয়া কাপড়ের মালকোঁচা মারা, মাথায় নামাবলীর পাগড়ী বাঁধা কয়জন লোক এসে আসর থেকে তোমাকে মৃত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল, তোমার সে অভিনয় ঠিক স্বাভাবিক হয়েছিল। কাল প্রাতঃকালে একবার এসো ত এ সম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌বার আছে।" ব্রজলাল আসিতে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্য পথিকের মোকর্দ্দমার রায় দিবার দিন। বঙ্কিমবাবু কিছু সকাল সকাল আসিয়া এজলাস্ জম্‌কাইয়া বসিলেন। দলে দলে দর্শকমণ্ডলী আসিয়া আদালত গৃহ পরিপূর্ণ করিতেছে। স্কুলের ছেলেরা স্কুল পালাইয়া অনেকে স্কুল না গিয়া ক্রমাগত ভিড় ও গোলমাল করিতেছে। আলিপুর সদর আদালত হইতে কয়েকজন উকীল ও আমলা এই অদ্ভুত মোকর্দ্দমার বিচার দেখিতে আসিয়াছেন। ক্রমশঃ লোকের জনতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। চারি পাঁচজন কন্‌ষ্টেবলে জনতা স্থির রাখিতে পারিতেছে না। তদ্দর্শনে হাকিমের মুখশ্রী মাঝে মাঝে বিরক্তিব্যঞ্জক হইতেছে। দুই পার্শ্বে দুইজন আসামী করযোড়ে দণ্ডায়মান—একদিকে হরনাথ, অন্যদিকে কন্‌ষ্টেবল জোয়ানআলি। কি

হয়, কি হয়, ভাবিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলী সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময়ে সেই গভীর লোকারণ্য ভেদ করিয়া, একজন পেয়াদা আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুজুর, ব্রজবাবুকে কে খুন করিয়াছে।"

বঙ্কিমবাবু। (আশ্চর্য্য হইয়া) বলিস্ কিরে? কোথায়?

পেয়াদা। ধর্ম্মাবতার! গ্রামের বাহিরে বসিরহাট যাইবার রাস্তায় পোলের নীচে, তাঁহার মৃত দেহ পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে আঘাত চিহ্ন—বস্ত্রে রক্তের দাগ। হুজুর অনুমতি করেন ত পুলিসকে বলিয়া লাস চালান দেওয়া যায়।"

বঙ্কিমবাবু। পুলিসে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, কিরূপ অবস্থায় আছে, একবার দেখা আবশ্যক। শীঘ্র এইখানে সে লাস আনিতে হইবে।

পেয়াদা। খোদাবন্দ, এত শীঘ্র আনাইবার লোক কোথায় পাইব? ডোমেদের ডাকিয়া যোগাড় করিতে, বিস্তর বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্কিমবাবু। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এই চোর দুটাকে লইয়া যা—ইহারা বহিয়া লইয়া আসিবে। আর দারোগা সাহেবকে বলিয়া দে, সঙ্গে গিয়া কেহ যেন গোলমাল না করে।

সুতরাং পেয়াদা চোর দুইজনকে সঙ্গে করিয়া, কাছারির চৌকীদারের নিকট হইতে (তাহার বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও) খাটিয়া লইয়া, ব্রজলালের মৃত দেহ আনিতে গেল।

মৃতদেহ খাটিয়ার উপর তুলিয়া, চাদর ঢাকা দিয়া, স্কন্ধের উপর তুলিলে—তাহাদিগকে সাবধানে ধীরে ধীরে আনিতে আজ্ঞা দিয়া, পেয়াদা দ্রুতপদে অনেক অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিল। বিচারক তাহাকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ হরনাথ, মৃতদেহ বহন করিয়া. কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। একে, পুত্রের সাজ্ঘাতিক পীড়া শ্রবণে কলিকাতা যাইতেছিলেন. আজ দুই সপ্তাহের অধিক হইল তাহার অবস্থা কিছুই অবগত নহেন, তাহার উপর চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। হাজতে থাকিয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে অনিদ্রায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আজ অস্পৃশ্য যবনের সহিত মৃতদেহবাহীর কার্য্যও করিতে হইল! দুঃখে, কষ্টে, মনস্তাপে মৃতকল্প হইয়া হরনাথ জোয়ান আলিকে সম্বোধন করিয়া ক্ষোভে, কহিলেন,—

"ভাই, তোমাকে ধরে আমি কি দুষ্কর্ম্মই না করেছি! আমার মান গেল, সম্ভ্রম গেল, জাত গেল, শারীরিক কষ্টে প্রাণ যাবার যো হয়েছে, আরও কপালে কি আছে জানিনে।"

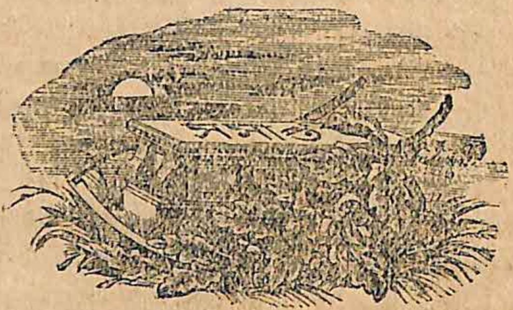
কনেষ্টবল চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, নিকটে কেহ নাই। তখন মুখ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল.—"কেমন বামুন. যেমন আমায় ধরেছিলি তেমনি জব্দ! তুই বড় নেমকহালাল কিনা. এখন দেখ্ মজা! আমরা পুলিসের লোক—আমাদের কিছুই হবে না—তোকেই জেলে পচে মরতে হবে।"

ব্রাহ্মণ। তাইত ভাই, বড়ই দুষ্কর্ম্ম করেছি। তোমাকে না ধর্‌লেও ত সবাই আমাকেই সকাল বেলা চোর ব'লে সন্দেহ ক'রত। এখন ত আর কোন উপায় নেই—কি করি? কি করে অব্যাহতি পাই?

কনষ্টেবল। এখন আর উপায় কি?—উপায় শ্রীঘর—তখন উপায় ছিল—আমি চুরি করে চলে গেলে, তুইও ভোরে ভোরে পালাতে পার্‌তিস্, তোকে লোকে সন্দেহ কর্‌ত কিন্তু ধর্‌তে পার্‌ত না!"

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত শিবদাস বাবুর সম্প্রীতি ছিল। কলিকাতায় আসার কিয়দ্দিন পরেই, শিবদাস বাবুর সাদর আহ্বানে তাঁহার আবাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শুভাগমন হইল। কর্ত্তা গোপনে সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—আজ আসল বিদ্যাসাগর আসিয়াছেন, খবরদার যেন আজ কেহ চন্দ্রকে বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিও না। গৃহিণীঠাকুরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম ভৃত্য বালকটাকে পর্য্যন্ত শিবদাস বাবু স্বয়ং বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সকলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছুক্ষণ চন্দ্রমোহনকে চন্দ্রমোহন বলিয়াই ডাকিল; কিন্তু শেষে আর রাখিতে পারা গেল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাঝে মাঝে, এ ঘর ও ঘর, সে ঘর হইতে "বিদ্যাসাগর,বিদ্যাসাগর" শব্দ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠেন, তাহার অব্যবহিত পরেই শব্দ আসে, "চুপ্ চুপ্ চুপ্।" আবার শুনিতে পান—"ও বিদ্যেসাগর! ডালে নুন হয়নি কেন? ও বিদ্যেসাগর! হাত চালিয়ে নাও না, হাঁ করে কি দেখ্‌ছ! ও বিদ্যেসাগর! পায়সটায় যে ধোঁয়ার গন্ধ বেরিয়েছে"—আবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আসে—"চুপ্ চুপ্ চুপ্।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ত কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। অবশেষে অত্যমাত্র কৌতূহলী হইয়া সেই মহাপুরুষ স্মিতমুখে শিবদাস বাবুকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবদাস বাবু হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বের ইতিহাস সবিস্তারে নিবেদন করিলেন—শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রচুর হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে সেই ত্রস্ত সঙ্কুচিত পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে বসাইলেন। তিনি বলিলেন—"তা বেশ হয়েছে, তুমিও বিদ্যাসাগর, আমিও বিদ্যাসাগর, আজ অবধি তুমি আমার মিতা হইলে।" এইখানে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মহত্ত্ব এবং উদারতা স্মরণ করিয়া আমাদের শরীর আহ্লাদে

ও ভক্তিতে রোমাঞ্চিত হয় এবং সেই ত্রেতাযুগের ঘটনা,—গুহকালয়ের ছবি মনে পড়ে। তখন সেই পুরুষসিংহ সেই পাচক ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিবেশীবন্ধুর মত আলাপ করিতে লাগিলেন – তাহার ঘরের সংবাদ লইলেন, তাহার সুখদুঃখের কাহিনী অবগত হইলেন। তিনি চন্দ্রমোহনকে লইয়া গিয়া ছাপাখানায় একটা চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী চন্দ্রমোহনের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন না—সে সেখানে থাকিতে পারে নাই।



বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থ

ষোড়শী। ষোলটি গল্প—নানা রসে পরিপূর্ণ। প্রবীণ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় "বঙ্গদর্শনে" এই পুস্তকের একটি রহস্য-সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন—"গ্রন্থের নাম ষোড়শী। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। তা. 'ষোড়শী' আমার কাছে কেন? এইরূপ কৈফিয়তের উত্তর দিবার জন্যই যেন ভূমিকার প্রথমেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এই গ্রন্থে আমার ষোলটি গল্প প্রকাশিত হইল, তাই ইহার নাম রাখিলাম "ষোড়শী"। আমরা বোধ করি, অশ্লীলতা নিবারণী সভার হস্ত হইতে নিষ্কৃত লাভের জন্য. গ্রন্থকার এইরূপ চতুরতা করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই ষোড়শী, রূপসী লইয়া ঘটনা-গ্রন্থন। * * * 'ষোড়শী'র গ্রন্থকার প্রভাতবাবু (বড় দুঃখের বিষয় যে. তাঁহাকে চিনি না) বেশ ভাবুক, সামাজিক, অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ, লিখন পটু; তাঁহার লেখায় সুন্দর ভঙ্গি আছে; ফল্গুস্রোতের মত বিদ্রূপের গতি আছে।"

Modern Review লিখিয়াছেন—

"* * The author is well known to Bengalee readers as one of the most successful writers of short stories. His style has an indefinable charm, and his pen a lightness of touch all his own. His diction is chaste and simple The plots are attractive and ingenious, and keep hold of the reader's attention till he reaches the last sentence with a feeling of regret that the stories are not longer. A vein of refined humour is another rare characteristic of his writings. Even when he indulges in rollicking fun, as in the 'Strong Son-in-law', there is not the slightest coarseness or vulgarity in his humour. The

stories can be read again and again with pleasure without any fear of their getting hackneyed."

"ষোড়শী"র মূল্য, কাগজের মলাট ১৷৹, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা ১৸০

রমাসুন্দরী। বৃহৎ সামাজিক উপন্যাস। ইহা দেড় বৎসর ধরিয়া "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটির শেষাংশের ঘটনাস্থান কাশ্মীর। ইহা পাঠ করিলে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুপম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে। রমাসুন্দরীর সমালোচনায় 'প্রবাসী' লিখিয়াছেন—

"প্রভাতবাবু ছোটগল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত। নভেল রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় এই রমাসুন্দরী দিয়াছে। * * লেখকের মানব-চরিত্র, দেশ ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি অতি চমৎকার * * প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গি, সুন্দর স্বাভাবিক হইয়াছে। রমার সরল অকুতোভয় মধুময় মনটি, রাজলক্ষ্মীর সচঞ্চল ব্যবহার, কমলা-দেবীর মাতৃত্ব ও শিবপূজা, নবগোপালের স্বাধীন চিত্ততা, হিন্দুস্থানী দরোয়ানের তুলসীকৃত রামায়ণ পাঠ, কান্তিবাবু, রায়গৃহিণী ও সীতানাথের চরিত্র প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপরি পাণ্ডা মুকুন্দলালের বিচিত্র বাঙ্গলাভাষা জ্ঞান, নিপুণ সূক্ষ্মদর্শনের ফল। * * বইখানির মধ্যে সরস পরিহাস ও রসিকতা সর্ব্বত্র ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এক এক স্থান পড়িতে পড়িতে হৃদয় ভাবের প্রাবল্যে ভরিয়া উঠে। সর্ব্বোপরি লেখকের স্বদেশপ্রীতি এই বই খানির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই বইখানি না পড়িয়াছেন তাঁহারা একবার পড়িয়া দেখিলে সুখী ও উপকৃত হইবেন।

Bengalee সংবাদপত্র লিখিয়াছেন—The writer evidently shows a power of vivid and picturesque presentation with a true insight into some aspects of our social life. As he himself says in the preface, he anticipated one of the most important changes which have come in the wake of the present national awakening—the advent of a spirit of resistance to

oppressions in whatever form it may be sought to be exercised * * Some of the characters are very well developed while there are one or two which would remind one of the author of *Kapal Kundala.* Altogether the book is truly entertaining and we may well recommend it to the notice of our readers.

রমাসুন্দরীর মূল্য কাগজের মলাট ১।০, স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধাই ১॥০

দেশী ও বিলাতী। ইহাতে দশটি দেশী ও চারিটি বিলাতী গল্প আছে। শেষোক্ত গল্পগুলির ঘটনাস্থল বিলাত, নায়ক বাঙ্গালী যুবকগণ, অন্যান্য পাত্র পাত্রী কেহ বা বাঙ্গালী, কেহ বা বিলাতী। আমাদের যুবকগণ কি ভাবে বিলাতে জীবনযাপন করেন, এই মনোরম গল্পগুলি পাঠে জানিতে পারিবেন। বৃহৎ পুস্তক, ৩৬০ পৃষ্ঠা, *সুন্দর কাগজ, চমৎকার ছাপা।*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১৩১৭ আশ্বিনের "প্রবাসী"তে একটি দীর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—

"দেশী ও বিলাতীর সমস্ত গল্পগুলিই মধুর হইয়াছে। আরাম কেদারায় উপবিষ্ট হইয়া সুন্দরী পাঠিকা তাঁহার চঞ্চল বিলোচন অচঞ্চল করিয়া দেশী ও বিলাতী পাঠ করিতেছেন, আর তাঁহার বদনে ও নয়নে মৃদুমধুর হাসির রেখা উদ্ভাসিত হইতেছে। যখন পৃথিবী খুঁজিয়া তুলনা পাই না, তখন কাজে কাজে সেই পাঠিকা দেবীর সহিত পাঠ্য পুস্তিকার তুলনা করিব। পাঠিকার মত পুস্তিকারও বদনে নয়নে সর্ব্বত্র মৃদুমধুর হাসির রেখা উদ্ভাসিত। এই গুণেই প্রভাতকুমার অদ্বিতীয়।

"আমরা আর অধিক বাড়াইতে চাই না। লিখিতে লিখিতেই যাঁহার গ্রন্থ ননাভাষায় ভাবান্তরিত হইতেছে, তাঁহার গ্রন্থের আবার কি বলিয়া প্রশংসা করিব? ধন্যবাদ দিব না পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি, কল্যাণভাজন ক্ষণজন্মা গ্রন্থকার স্বাস্থ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দের সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নূতন নূতন মনোহর চিত্র আঁকিয়া বঙ্গসাহিত্য মন্দির অলঙ্কৃত করুন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী ও বঙ্গবাসিনীর প্রীতি উৎপাদন করুন।"

১৩১৬ অগ্রহায়ণের "প্রবাসী" "দেশী ও বিলাতী"র সম্পাদকীয় সমালোচনায় লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালায় ছোট গল্প লেখেন অনেকে, কিন্তু তাহা ছোট মাত্র, তাহাতে ছোট গল্পের আর্ট কিছুমাত্র থাকে না। এই আর্টে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রবি বাবু শ্রেষ্ঠ; তারপরই প্রভাত বাবু একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার ভাষা প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে মধুর ও সহজভাবে লঘু; রচনার মধ্যে আগাগোড়া আগ্রহ জাগাইয়া রাখিবার মত আয়োজন যথেষ্ট থাকে. ঘটনার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য থাকে এবং উপসংহারে একটী অখণ্ডতা ও জমাটের ভাব দেখা যায়। সব চেয়ে সুন্দর তাঁহার নিপুণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি—তিনি জানা কথাই নূতন করিয়া বলিয়া প্রাণের মধ্যে পৌছিয়া দেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সকল গুণগুলিই আছে; অধিকন্তু রচনা অধিক পরিপক্ক হইয়াছে। এই গ্রন্থের নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমাদর হইবে।"

"দেশী ও বিলাতী"র মূল্য কাগজের মলাট ১॥০ স্বর্ণাঙ্কিত কাপড়ে বাঁধা ২৷০

প্রভাত বাবুর ছোট গল্প সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

অভিমত

"আমি······তোমার ছোট গল্পগুলির ভক্ত। আজকাল বাঙ্গালা দেশে অনেকেই ছোট গল্পে হাত দিয়েছেন, সে গুলি যে ছোট তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু গল্প নয়। তোমার গল্পগুলি যেন ঝরণার মত ছোটে, এবং ঝরণার মত ঝিক্‌মিক্ করে। তোমার গল্প যেন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানে না—একবারে উড়ে চলে; আর এমন একটি হাসবার কায়দা জানে যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই হাসে।"

উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থ কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে; ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

Name, rank and office.	Pay and allowances.	Authority.	Rate.			
	Rs.		Rs.	A.	P.	Rs.

[illegible]